রথীন চক্রবর্তী

সম্পাদিত

ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন
ও
জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম

লোকমত প্রকাশনী : ৪৯ সি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ/১২

পরিবেশনা : পুস্তক বিপণি। বেনিয়াটোলা লেন/৯

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ১৯৮৬

প্রকাশক ঃ সত্য রাহা

লোকমত প্রকাশনী

৪৯ সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলকাতা ১২

মুদ্রণ ঃ শিবশঙ্কর প্রেস

৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ ঃ অমিয় ভট্টাচার্য

ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন
ও
জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম

এই গ্রন্থের একমাত্র পরিবেশক

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

রথীন চক্রবর্তীর অন্যান্য বই

....

লাতিন আমেরিকার কবিতা

Swadeshi And Boycott (Ed.)

কার্ল মার্ক্সের সাহিত্য সমগ্র

গণ-আন্দোলন ও সংবাদপত্র (স)

রমাঁ রলাঁর পিপলস থিয়েটার

বাংলা নাট্য আন্দোলন : গণনাট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটার (স)

সূচীপত্র

ভূমিকা

গোটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসই হলো মূলতঃ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক মানুষের গণতান্ত্রিক ও সশস্ত্র সংগ্রামেরই তিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়-সীমার মধ্যে ফ্যাসিবাদ অপেক্ষাকৃত বেশি প্রকট এবং প্রচণ্ড হয়ে উঠলেও তার সূচনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এবং বিস্তার এই আশির দশক পর্যন্ত। এবং আরও কিছু আগামী দিন। রাজনৈতিক পট ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদও তার কৌশল বদলিয়ে চলেছে। ফলতঃ ফ্যাসিবাদ আজ শুধু রাজতন্ত্রী অশরীরীর ছায়ায় নিছক স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতাই নয়, একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের এক বিশেষ পর্বের বিশেষ সংমিশ্রণের ফলশ্রুতিই হলো ফ্যাসিবাদ। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের মাথা চাড়া দেওয়া এবং তাঁর ভয়ঙ্কর অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্ব জুড়ে যে-প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ঝড় বয়ে গিয়েছিল তা আজ ইতিহাস। এই ইতিহাস অসীম গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে এই কারণেই যে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের চল্লিশ বছর পরেও সেই ভয়ঙ্করতা ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। পশ্চিম জর্মনীতে নাৎজীদের গোপন সংগঠন আবার সক্রিয়, ইতালিতে মুসোলিনি-স্তুতি শুরু হয়েছে বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশে, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদী ধাঁচের দাপাদাপির বিরাম নেই, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার একাধিক দেশেও সামরিক শাসনের উর্দির আড়ালে ফ্যাসিবাদী ষড়যন্ত্র খেলা করছে। মূলতঃ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের চল্লিশতম বার্ষিকী এবং এই নতুন বিশ্বপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই 'ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম' সম্পর্কিত একটি সংকলন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অতীত এবং বর্তমানকে পাশাপাশি রাখার জন্যই প্রথম দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ের বিভিন্ন মনীষী ও বুদ্ধিজীবীর কিছু লেখা রাখার সিদ্ধান্ত হয় এবং তারপরে সমসাময়িক কালের চিন্তাশীল অগ্রণীদের। যেহেতু ফ্যাসিবাদ-সমস্যা এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নটি অত্যন্ত সার্বিক এবং মতবাদের দিক থেকে ভিন্নধর্মিতা থাকলেওপ্রত্যেকেই

কিছু না কিছু ভাবে এর সঙ্গে জড়িত তাই কোনোরকম সঙ্কীর্ণতা না রেখেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও অন্যান্য ফ্রন্টের নেতা. ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। একই সঙ্গে ইতিহাস ও একটি সমস্যাকে নানা দিক থেকে দেখা ও বিশ্লেষণ করাই হলো মূল উদ্দেশ্য। এইসব বিষয়ের ক্ষেত্রে যেহেতু নিত্য-নতুন রচনা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার তাই সঙ্গতভাবেই কিছুটা পুনর্মুদ্রণের পথ আমাদের বেছে নিতে হয়েছে। কিন্তু সুধী পাঠক নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, এই ধরণের সংকলন, একই সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমস্যাকে নানা দিক থেকে দেখা, গর্বিত উচ্চারণের পাশাপাশি আত্মসমালোচনা, বিবরণের পাশাপাশি বিশ্লেষণ, এর আগে আর হয়নি। রাজনীতি নিয়ে আগামী দিন সম্পর্কে যাঁরা কিছুমাত্রও ভেবে থাকেন, মানবতার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে যাঁরা বিশ্বাসী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যাঁরা শরিক তাদের হাতেই আমরা বইটি তুলে দিলাম।

বর্তমান বার্তা বিভাগ

রথীন চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রলয়ের সৃষ্টি

এক সময়ে, এই বিশ্বসৃষ্টির প্রথম যুগে সৃষ্টি ও প্রলয়ের দ্বন্দ্বনৃত্য চলেছিল—সৃষ্টি ও প্রলয়ের শক্তির মধ্যে কে যে বড়ো তা বুঝবার জো ছিল না, চারি দিকে নিয়ত সংঘাত চলেছিল। তখন যদি বাইরে থেকে কেউ এই পৃথিবীকে দেখতে পেত তা হলে বলত, এই বিশ্ব প্রলয়েরই লীলাক্ষেত্র, সৃষ্টির নয়। চারি দিকে তখন ক্রমাগত ভয়ংকরের নাট্যলীলা চলেছিল। সেই মহাতাণ্ডবের যুগে আমরা যাকে প্রকৃত জগৎ বলি তাই ছিল, তখন পৃথিবীতে জীব আসে নি। কিন্তু এই মহাপ্রলয়ের অন্তরে সৃষ্টির সত্যই গোপন হয়ে ছিল। যা বিনাশ করে, যা ভীষণ, বাইরে থেকে তাকেই সত্য বলে মনে হলেও তা সত্য নয়—এই ভীষণ তাণ্ডবলীলাই সৃষ্টির ক্ষেত্রে চরম কথা নয়। ক্রমশ সব আলোড়ন উপদ্রব থেমে গেল, এর অন্তরে যে সৌন্দর্যলীলা গোপন ছিল তাই প্রকাশ পেল—সেই প্রলয়ের তাণ্ডব, সেই ঝড়ঝঞ্ঝা-মহামারী আজও আছে বটে, কিন্তু সে আছে নেপথ্যে—সে একবার দেখা দেয়, আবার চলে যায়—তাকেই আমরা চরম পরিণাম বলি নে। সমস্ত উপদ্রব শান্ত হয়ে আসে, উপনিষদে যাঁকে শান্তম্ বলেছে তাঁরই রূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে যে হোমহুতাশন, অগ্নির উচ্ছ্বাস, আমরা দেখি তার শান্তরূপ। নক্ষত্রলোক জুড়ে কী অসহ্য উপদ্রব, কী অগ্নিবাষ্পের উচ্ছ্বাস চলেছে সে কথা আমরা ভাবি নে। আমাদের শয়নগৃহের বাতায়ন দিয়ে যখন আকাশকে দেখি তখন দেখি তার স্নিগ্ধ রূপ, তখন দেখি আকাশ হাসছে—সে আমাদের নিদ্রাকে ব্যাহত করে না। এই শান্তিই চরম সত্য—এ শান্তি দুর্বলের শান্তি নয়, এ প্রবলের শান্তি।

পৃথিবীতে প্রচণ্ডের মধ্যে, সংঘাতের মধ্যে, শান্তির যে অভ্যুদয় দেখি আদিযুগে, তাই দেখি আজ মানুষের ইতিহাসেও। উদ্দাম নিষ্ঠুরতা আজ ভীষণাকার মৃত্যুকে

জাগিয়ে তুলেছে সমুদ্রের তীরে তীরে ; দৈত্যেরা জেগে উঠছে মানুষের সমাজে, মানুষের প্রাণ যেন তাদের খেলার জিনিস। মানুষের ইতিহাসে এই দানবিকতাই কি শেষ কথা? মানুষের মধ্যে এই-যে অসুর এই কি সত্য? এই সংঘাতের অন্তরে অন্তরে কাজ করছে শান্তির প্রয়াস সে কথা বুঝতে পারি যখন দেখি, এই দুঃখের দিনেও কত মহাপুরুষ দাঁড়িয়েছেন শান্তির বাণী নিয়ে—সেজন্য মৃত্যুকে পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। এঁদের সংখ্যা বেশি নয়, সাম্রাজ্যলুব্ধরা এঁদের হিংসা করে মরে—তবু এঁদের শক্তিকে নিঃশেষ করতে পারে না। এখনো মানুষ বিপদকে স্বীকার করেও দূর ভবিষ্যতের বাণী বহন করে চলেছে অকুতোভয়ে। সত্য এখানেই। আজ চীনে কত শিশু নারী, কত নিরপরাধ গ্রামের লোক দুর্গতিগ্রস্ত—যখন তার বর্ণনা পড়ি হৃৎকম্প হয়। আজ এই সংগীতমুখর শান্ত প্রভাতে আমরা যখন উৎসবে যোগ দিয়েছি এই মুহূর্তেই চীনে কত লোকের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হচ্ছে—পিতার কাছ থেকে পুত্রকে, মাতার কাছ থেকে সন্তানকে, ভাইয়ের কাছ থেকে ভাইকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে, যেন মানুষের প্রাণের কোনো মূল্য নেই—সে কথা চিন্তা করলেও ভয় হয়। অপর দিকে আছে আপন-সাম্রাজ্যলোভী ভীরুর দল, তারা এই দানবদের কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। ক্ষীণ এরা, ইতিহাসে এদের স্বাক্ষর লুপ্ত। চীনকে যখন জাপান অপমান করেছে সিনেমার ভিতর দিয়ে, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে—যেমন অপমান আমাদের দেশেও হয়ে থাকে—তখন এই প্রতাপশালীর দল কোনো বাধা দেয় নি, বরং চীনকে দাবিয়ে দিয়েছে, বলেছে চীনের চঞ্চল হবার কোনো অধিকার নেই। আমাদের দেশেও দেখি, দুর্বলকে অবমাননার কোনো প্রতীকার নেই। তবুও এ কথা বলব, যারা আজ দুঃখ পাচ্ছে, প্রাণ বিসর্জন করছে, সৃষ্টি করছে তারাই। এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন অপমানিত জাতিরাই নূতন যুগকে রচনা করছে। প্রতাপশালী ভীরুরা তাদের ঐশ্বর্যভারে নত ; পাছে কোনো জায়গায় তাদের কোনো ক্ষতি হয় এইজন্য তারা দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ালো না। তবু হতাশ হব না। যারা পীড়িত হচ্ছে, মৃত্যুকে বরণ করেই তারা নূতনকে সৃষ্টি করছে ; যারা দুঃখ পেল তারাই ধন্য। যারা দস্যুবৃত্তি করছে, যারা মানুষের পথ আগলে আছে, মানুষের ইতিহাসে তারা সম্মানের যোগ্য নয়। এ আশা দুরাশা নয়—বিনাশের শক্তিই মানুষের ইতিহাসে শেষ কথা হতে পারে না, তা হলে মানুষ বাঁচত না। অনেক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে এসেছে মানুষ, তবু তার বড়ো বড়ো কামনা মরে নি। কেবল ক্ষুধাতৃষ্ণার দাস নয় সে, এখনো মানুষ চলেছে ; এখনো তার

মহত্ত্বের উৎস শুকোয় নি। মানুষের ইতিহাসের অন্তরে যদি মহত্তের কোনো স্থান না থাকত তবে মানুষের ইতিহাস এত অত্যাচার সহ্য করেও প্রাণশীল থাকত না। আজকের দিনে এই গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে এইই মানুষের আশ্বাসবাণী। সমস্ত সংঘাতের মধ্যেও কল্যাণের রূপ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে—সমস্ত দুঃখের মধ্যে সমস্ত পাপের মধ্যে পুণ্যের আবির্ভাব এই আমাদের আশা।

চীনের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে আজ আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত। কিন্তু, আমাদের কী করবার আছে? আমরা কী করতে পারি? আমরা অত্যাচারীকে নিন্দা করছি—কিন্তু বলা যেতে পারে, নিন্দা করে কী লাভ? এই দুঃখবোধ-দ্বারা, দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে, আমরাও সেই সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি—এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক এও সৃষ্টির কাজ। আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্তু আমাদের মন আছে। আমরা লড়াই না করতে পারি, কিন্তু এ কথা যদি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে অধর্মের দ্বারা আপাতত যতই উন্নতি হোক তার মূলে আছে বিনাশ—যদি এ কথা বিস্মৃত না হই যে মানব-ইতিহাসের মূলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে—এ কথা মেনে নিয়ে সেই কল্যাণের পক্ষে আমাদের কর্মকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি। আমাদের মেশিন-গান নেই, কিন্তু আমাদের চিন্তা আছে—তার মূল্য যতটুকুই হোক, তাকে আমরা মহত্তের দিকে প্রয়োগ করব।

রমঁ্যা রলাঁ

তুমি আমি সকলেই আজ বিপন্ন

মাদ্রিদের ধূমান্বিত প্রস্তরস্তূপ হইতে আর্তের ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠিতেছে। যে গর্বিতা নগরী এককালে অর্ধজগতের অধিশ্বরী ছিল এবং যাহা অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতার এক আলোকজ্জ্বল কেন্দ্র—আজ আফ্রিকার মূর এবং 'বিদেশী বাহিনী' আসিয়া তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিতেছে ও রক্তের প্লাবন বহাইতেছে। তাহাদের বিদ্রোহী নেতারা যে-স্পেনের হিতৈষী বলিয়া দাবি করিতেছে—সেই স্পেনকেই লুণ্ঠনে তাহারা রত হইয়াছে এবং স্পেনের সভ্যতা পদতলে দলিত করিতেছে।

সহস্র সহস্র নারী ও শিশু নিহত, অঙ্গহীন এবং জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে। শহরের সর্বাপেক্ষা জনবহুল অঞ্চলই বোমাবর্ষণের লক্ষ্যস্থল। হাসপাতাল রেহাই পাইতেছে না। গৌরবময় সুরম্য অট্টালিকাগুলিকে অগ্নিশিখা লেহন করিতেছে; আজ ডিউক অব আলবা-র প্রাসাদ, কাল প্রাদো-র বহু শতাব্দীর কারুশিল্প বোমার আঘাতে ভাঙিয়া পড়িতেছে। সমগ্র অধিবাসীসহ ভাল্‌স্‌কুইজ মৃত।

যে বীর্যবতী নগরীর প্রাচীন রাজন্যবৃন্দ আরব অভিযান হইতে ইয়োরোপকে রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহার বেদনার দিনে, হিটলার ও মুসোলিনি আফ্রিকান ফ্রাঙ্কোর 'গর্বনমেন্ট'কে সমর্থন করিতেছেন এবং ঐ ব্যক্তি ইতালি ও জার্মান ফ্যাসিস্টগণ প্রদত্ত অস্ত্রে স্পেনকে হত্যা করিতেছে। বিনিময়ে ফ্রাঙ্কো স্পেনের ঐশ্বর্য ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতেছে। এই উন্মাদেরা দেখিতেছে না যে, রক্তের মূল্যে তাহারা আজ যে পাপাভিসন্ধি চরিতার্থ করিতেছে, একদিন তাহা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের অধিবাসীদের উপরই বর্ষিত হইবে; অদ্যকার উচ্ছৃঙ্খল বর্বরতা মাদ্রিদ ও বার্সিলোনার (কারণ কাল বার্সিলোনা ধ্বংস হইবে) পর রোম, বার্লিন, লণ্ডন এবং প্যারীর দিকে ধাবিত হইবে। ইয়োরোপের মহান জাতিগুলি—যাহারা সভ্যতার মাতৃভূমি, তাহারা

আজ ক্ষুধিত শার্দুলের মতো পরস্পরকে পৈশাচিক আনন্দে ভক্ষণ করিতেছে; জাতির সুসন্তানগণ পরস্পরের গলায় ছুরি দিতেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, উপস্থিত ও অনাগত, দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে।

মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব! আজ তোমার দ্বারে আমি ভিখারী। এসো, স্পেনকে সাহায্য করো! আমাদের সাহায্য করো! তোমাদের সাহায্য করো! কেন না তুমি আমি সকলেই আজ বিপন্ন!...

এই সকল নরনারী বালক-বালিকা এবং জগতের শিল্প ও ঐশ্বর্যসম্ভার নষ্ট হইতে দিও না। আজ যদি তুমি নীরব থাকো, কাল তোমার পুত্রকন্যা, তোমার স্ত্রী, তোমার জীবনের যাহা কিছু প্রিয় ও পবিত্র, তাহাও একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আজ যদি তোমরা হাসপাতাল, যাদুঘর, শিশুদের ক্রীড়া-উদ্যান, ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বোমাবর্ষণ বন্ধ না করো তাহা হইলে হে জগতের অধিবাসীবৃন্দ, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক তোমাদের ভাগ্যও অনুরূপ হইবে। এই সূচনায় তোমরা যদি ইহা নিভাইয়া না ফেলো, তাহা হইলে এই প্রলয়ানলের ধ্বংসের গতি আর কে সংযত করিবে? সমগ্র জগৎ ইহার কবলে পড়িবে।

সময় নাই। অতি দ্রুত প্রস্তুত হও! উঠো, জাগো, কথা বলো, চিৎকার করো, কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও! আমরা যদি যুদ্ধ বন্ধ না-ও করিতে পারি, তথাপি যাহাতে আন্তর্জাতিক বিধি-ব্যবস্থাকে সকলে সম্মান করিতে বাধ্য হয়, সে ব্যবস্থা করিতে তো পারি। এসো, আমরা নির্দোষ ও নিরুপায়কে রক্ষা করি! জাতি দল বা ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল মানব একযোগে পীড়িতের সাহায্যে ও সেবায় হস্ত প্রসারিত করুক। ভয়াবহ রণক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া সকল শ্রেণীর পীড়িত, সকল শ্রেণীর জীবিত মানবের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে।

আঁরি বারব্যুস

....

মুক্ত মানবাত্মার নিকট আবেদন

আট বৎসর হইল যুদ্ধাবসান হইয়াছে, তবুও যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান। প্রায় সমস্ত দেশেই স্বাধীনতার অপরিহার্য অধিকারগুলি হিংসার দ্বারা বিপদাপন্ন। প্রথম দিকে কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এই সমস্ত হইতেছে ঝঞ্ঝার শেষ তরঙ্গাভিঘাত, ইহা ক্রমান্বয়ে অবসিত হইবে, ফলাফল মারাত্মক হইলেও সাময়িক এবং যে সকল জাতি আদর্শগত কারণে উৎপীড়িত হইয়াছিল, তাহারাও ক্রমে ন্যায়-সঙ্গত অধিকারসমূহ পুনরুদ্ধার করিবে। কিন্তু দেখা গেল, কতিপয় দল ও ব্যক্তি হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐ অন্ধশক্তির সহিত মিলিয়া একটি হিংসাশ্রয়ী সরকারী ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিল। আমরা সর্বত্র লক্ষ্য করিতেছি যে ফ্যাসিবাদের নামে, স্বাধীনতার সমস্ত বিজয়কে হয় ধ্বংস নতুবা বিপদাপন্ন করা হইতেছে। সংগঠন গড়ার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের ও বিবেকের স্বাধীনতা—যাহা শত শত বৎসরের আত্মত্যাগ ও আয়াসে অর্জিত হইয়াছে—আজ সেই সব-কিছুকেই নির্দয়ভাবে নির্মূল করা হইতেছে। প্রগতির এই দেউলিয়া অবস্থায় আমরা আর নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকিতে পারি না।

আমাদের ধারণা, ইদানিংকালে পৃথিবীতে মনীষা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে যতটুকু প্রভাব বিস্তারে সক্ষম, তাঁহাদের সকলকে ফ্যাসিবাদের বর্বর অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি সংগঠনে মিলিত হইতে আহ্বান জানাইবার সময় আসিয়াছে।

প্রত্যেকটি দেশে অল্পবিস্তর নগ্নরূপে, কিন্তু ক্রমেই অধিকতর স্পর্ধায় ও পাপের পথে, প্রতিদিন, সর্বত্রই, ক্রমবর্ধমান সংগঠিতরূপে জনসমষ্টির উপর এবং ব্যক্তিমানুষের সর্বাপেক্ষা পবিত্র নীতিসমূহ ও সমষ্টিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বল্গাহীন শ্বেত-সন্ত্রাস চালানো হইতেছে।

এই পরিস্থিতিতে যে সকল হিংসাত্মক ঘটনাবলী, নিতান্ত অমার্জনীয় এবং অনস্বীকার্য সব অপরাধ, অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং আরো বহু বীভৎস ঘটনার বিপদাশঙ্কা দেখা দিতেছে—তাহার বিরুদ্ধে সর্বজনপ্রশংসাধন্য শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের লইয়া গণপ্রতিরোধ সংগঠিত করিলে কার্যকর বাধা সৃষ্টি করা যাইবে। এমন একটি আন্তর্জাতিক সমিতি, শুধুমাত্র গঠিত হইলেই, জনমতের উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। তাহাকে আলোকিত ও আকৃষ্ট করিবে এবং স্বীয় স্বার্থ ও ভাগ্যবিধানে কি তাহাদের অভিপ্রায় তাহা প্রকাশে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবে। ফ্যাসিবাদের সঙ্গে যে সকল সরকার অবাঞ্ছিত সহায়তা ও সহযোগিতা করিতেছে, তাহাদের শুভবুদ্ধির উন্মেষেও এই উদ্যোগ সক্রিয় চাপ সৃষ্টি করিবে।

ইহাই সব নয়। ইতালি, স্পেন, পোলাণ্ড, বলকান রাজ্যগুলি হইতে, প্রতিদিন সকল স্থান হইতেই, অসংখ্য অপরাধ ও বে-আইনী ক্ষমতাদখলের সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছাইতেছে। অগণিত বীর ও অনুগত নাগরিকদের উপর প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জীবন-ধারণোপযোগী খাদ্য হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে। ফ্যাসিস্ত প্রতিক্রিয়ার নির্দেশে, কোনো কোনো অঞ্চলকে মর্মন্তুদ দুর্দশার মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। এই সমিতির অন্যতম প্রথম কাজ হইবে—আদর্শগত কারণে যাহারা মৃত্যুযন্ত্রণা ও নিপীড়ন সহ্য করিতেছে, তাহাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দেওয়া এবং কিভাবে তাহাদের দুর্দশা মোচন করা যায় তাহা বিচার-বিবেচনা করা।

রাজনৈতিক দল-নিরপেক্ষভাবে, ন্যায় বিচার যুক্তি ও গণতান্ত্রিক প্রগতি—যাহা বর্তমানে বিপদাপন্ন শুধুমাত্র তাহার উপর দাঁড়াইয়া একবার এই সমিতি গঠিত হইলে তাহার পর সমিতিই ঠিক করিবে কী উপায়ে ইহার মহৎ ও ন্যায়পরায়ণ সেবাধর্ম বাস্তবে রূপায়িত করা যায়।

অতএব যাঁহাদের নিকট এই আবেদন পাঠাইতেছি তাঁহাদের সকলের নিকট আমাদের অনুরোধ যেন তাঁহারা এই নীতিসমূহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

ম্যাকসিম গোর্কি

....

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে

শ্রমিকশ্রেণীর মানবতাবাদ

···শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী চেতনার বিকাশকে বাধা দিবার জন্য কি করিতেছে সমস্ত দেশের পুঁজিপতিরা? কোটি কোটি মেহনতী মানুষের উপর নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, অর্থহীন শ্রমিকশোষণ চালাইয়া যাইবার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শেষ শক্তিবিন্দু নিয়োগ করিয়া তাহারা আজ ফ্যাসিজম সংগঠিত করিয়া তুলিতেছে। পুঁজিবাদ কর্তৃক জরাজর্জর বুর্জোয়া সমাজের কায়িক ও নৈতিক অস্বাস্থ্যকর স্তরটির সমাবেশ ও সংগঠনই হইতেছে ফ্যাসিজম। যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত সুরাসক্ত তরুণ সম্প্রদায়, ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধস্মৃতির বিভীষিকা-বিকারগ্রস্ত সন্তানের দল, পরাজয়ের প্রতিশোধকামী পেতিবুর্জোয়াদের সন্তানের দল, যে জয়লাভ পরাজয়ের মতোই বিপর্যয় আনিয়াছে বুর্জোয়াদের নিকট, সেই জয়লাভের সন্তানের দল—পুঁজিবাদ কর্তৃক ইহাদেরই সমাবেশ ও সংগঠনের নাম ফ্যাসিজম। নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতেই এই তরুণদের মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। এ বৎসর মে মাসের গোড়ার দিকে জার্মানির এসেন শহরে হাইনৎস ফ্রীস্টেন নামে ১৪ বছরের একটি ছেলে ফ্রিৎস ওয়াকেন হোর্স্ট নামে ১৩ বছরের একটি ছেলেকে হত্যা করে। হত্যাকারী শান্তভাবে বলে যে, সে আগেই তাহার বন্ধুর জন্য একটি কবর খুঁড়িয়া রাখিয়াছিল, তারপর তাহাকে সে জীবন্ত অবস্থায় কবরের মধ্যে ফেলিয়া দেয় ও যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার দম বন্ধ হইয়া যায় ততক্ষণ তাহার মুখ বালিতে চাপিয়া রাখে। সে বলে, ওয়াকেন হোর্স্টের হিটলারি স্টর্মট্রুপার উর্দিটি দখল করিবার জন্যই সে এই হত্যা করিয়াছে।

যাঁহারাই ফ্যাসিস্ত প্যারেড দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, এ প্যারেড ন্যুব্জদেহ বিকৃতচর্ম, ক্ষয়রোগাক্রান্ত তরুণদের প্যারেড; রুগ্ন মানুষের সমস্ত

কামনা লইয়া যাহারা বাঁচিতে চায় তাহাদের প্যারেড। নিজেদের বিষাক্ত রক্তের পূতিগন্ধময় উদ্‌গারের স্বাধীনতা দিবে এমন সবকিছুই তাহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। হাজার হাজার বিবর্ণ, নিরক্ত মুখের মধ্যে স্বাস্থ্যবান, রক্তিম মুখগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াই চোখে পড়ে, কারণ তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সেগুলি অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসচেতন শত্রুর মুখ, পেতিবুর্জোয়া ভাগ্যান্বেষীদের মুখ, গতকল্যকার সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মুখ, বড় কারবারী হইতে ইচ্ছুক ক্ষুদেকারবারীদের মুখ। বিনামূল্যে অর্থাৎ চাষী-মজুরদের পকেট কাটিয়া একটু জ্বালানি অথবা কয়েকটা আলু দিয়া জার্মান ফ্যাসিস্ত নেতারা এইসব কারবারী-দের ভোট কিনিয়া লয়। প্রধান খানসামারা চায় রেস্তোর"ার মালিক হইতে। বড় চোরকে চুরির অধিকার দিয়াছে রাষ্ট্রশক্তিধারকেরা, সেই চুরির অধিকারই চায় ক্ষুদে চোরেরা। ইহাদের মধ্য হইতেই ফ্যাসিবাদ তাহার 'কর্মী' সংগ্রহ করে। ফ্যাসিস্ত প্যারেড একই সঙ্গে পুঁজিবাদের শক্তি ও দুর্বলতার অভিব্যক্তি।

আমাদের চোখ বুজিয়া থাকিলে চলিবে না। ফ্যাসিস্তদের মধ্যে মজুরের সংখ্যা কম নহে। ইহারা সেই স্তরের মজুর যাহাদের এখনও বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর চূড়ান্ত শক্তি সম্পর্কে চেতনা জাগে নাই। এ কথা যেন নিজেদের নিকট হইতে আমরা গোপন না করি যে, বিশ্বপরাশ্রয়ী পুঁজিবাদ এখনও খুবই শক্তিশালী কারণ এখনও কৃষক ও শ্রমিক অস্ত্র ও খাদ্য তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া নিজের রক্তমাংসে তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে। এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ যুগের ইহাই সবচেয়ে শোচনীয় ও লজ্জাকর ঘটনা। আজও শ্রমিকশ্রেণী নিরীহভাবে শত্রুর মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে। অসহ্য এ দৃশ্য। এ নিরীহতা তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতারা। এই নেতাদের নাম আজ ও চিরদিনই কলঙ্কের কালিতে লেখা থাকিবে। ঠিক যখন বেকারি বাড়িতেছে, মজুরি কমিতেছে এবং এমন কি পেতিবুর্জোয়াদের ক্রয়ক্ষমতাও কমিতেছে—ঠিক তখনই বাজারের দ্রব্যমূল্য একটি বিশেষ স্তরে রাখিবার জন্য খাদ্যশস্য ধ্বংস করিয়া ফেলা হইতেছে। আর ইহা সহ্য করিয়া যাইতেছে বেকার ও ক্ষুধিতের দল। কী বিস্ময়কর ধৈর্য!...

...ইয়োরোপের তরুণদের উপর ফ্যাসিজমের ধ্বংস ও দুর্নীতির প্রভাবের মাত্র কয়েকটি নহে, শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এই ঘটনাগুলি বিবৃত করিতে গেলেও বমির উদ্রেক হয়। এই কদর্য আবর্জনায় স্মৃতির ভাণ্ডার ভরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় না। অথচ ক্রমবর্ধমান উৎসাহ ও প্রাচুর্যের সহিত এই আবর্জনাই সৃষ্টি করিয়া চলে বুর্জোয়ারা।...যে-ইহুদীরা প্রয়োজনে নিজেদের জাতিবিশুদ্ধতার গর্ব

করিতে পারে এবং যাহারা মানবসমাজকে এতগুলি সত্যকার সংস্কৃতিস্রষ্টা দান করিয়াছে, দান করিয়াছে সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত প্রবক্তা কার্ল মার্কসকে, সেই ইহুদীদের আজ জার্মানির ফ্যাসিস্ত বুর্জোয়ারা তাড়াইয়া দিতেছে। ব্রিটেনে যেখানে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মধ্যে ইহুদীদের সংখ্যা কম নহে এবং যেখানে দেশের অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে ইহুদীরা গৃহীত হইয়াছে—সেখানেও ইহুদী-বিদ্বেষের কদর্য তত্ত্বের প্রচার শুরু হইয়াছে।

অপরপক্ষে যে-দেশের শাসনক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণীর হাতে, সেখানে একটি স্বাধীন ইহুদী প্রজাতন্ত্র—ইহুদী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল—গঠিত হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতির পুঁজিপতিরা রুদ্ধশ্বাসে আর-একটি বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চালাইতেছে। শ্রমিক ও কৃষকের শ্রমশক্তিকে আরও বেশি করিয়া ও আরও সুবিধাজনকভাবে শোষণের জন্য তাহারা পৃথিবীকে নূতনভাবে ভাগ করিতে চায়। ছোট ছোট দেশগুলি আবার বড় বড় দেশের লৌহকবলে পড়িতে চলিয়াছে; আবার তাহারা তাহাদের স্বাধীন সংস্কৃতি-বিকাশের অধিকারটিকে হারাইতে চলিয়াছে।

বিভিন্ন ভাষা ও জাতির শ্রমিকদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজম জাতিগত কলহ, দম্ভ ও বিদ্বেষের বীজ বপন করিতেছে। এই জাতিবিদ্বেষ বিশ্বের শ্রমিক-শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের একাত্মতার চেতনার বিকাশ ব্যাহত করিবে। বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যবসায়ীদের অরক্ষিত ও পদদলিত ক্রীতদাসের অবস্থা হইতে দুনিয়ার শ্রমিক-কৃষককে শুধুমাত্র এই চেতনাই মুক্তি দিতে সক্ষম। তাহাদের জাতিগত, বাণিজ্য-গত, শিল্পগত শত্রুতা অতি সহজেই জাতি-শত্রুতা ও জাতিযুদ্ধের প্রচারে পর্যবসিত হইতে পারে, এবং হইতেছেও। আজ তাহারা ইহুদীবিদ্বেষ প্রচার করিতেছে এবং ইতিমধ্যেই অত্যন্ত ঘৃণিতভাবেই উহার প্রয়োগ শুরু করিয়া দিয়াছে। কাল তাহারা মমসেন, ট্রাইটস্কে প্রমুখের মতবাদ স্মরণ করিয়া স্লাভবিদ্বেষ প্রচার করিতে শুরু করিবে, ভুলিয়া যাইবে জার্মান সংস্কৃতিতে কতজন প্রতিভা দান করিয়াছে পোলেরা, পোমোরেরা, চেকেরা। ইয়োরোপের সমস্ত কারখানা-মালিকেরা ও দোকানীরা যখন একই ধরনের মাল তৈয়ারি করে ও একই ধরনের মাল লইয়া কারবার করে, রোমানসীয় অথবা এ্যাংলো-স্যাকসন জাতির বিরুদ্ধে জার্মান জাতির শত্রুতা ও যুদ্ধ তখন খুবই স্বাভাবিক। মৈত্রী আছে অবশ্য; কিন্তু যখন বিক্রয় করিতেই হইবে, তখন বেইমানী করিতে ক্ষতি কি? যথা: ব্রিটেনের মৈত্রী রহিয়াছে জাপানের সহিত, কিন্তু জাপানীরা জোড়া তিন পেনিতে

সিল্কের মোজা বেচিতেছে লণ্ডনে ; ব্যাপারটি সামান্য, কিন্তু জাপানের 'ডাম্পিং' (উৎপাদনব্যয়ের কমে জিনিস বিক্রয়) পীতজাতির বিরুদ্ধে শত্রুতা জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের মাঞ্চুরিয়ায় যাহা বিনা বাধায় চালাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া ইয়োরোপের সাম্রাজ্য-বাদীদের রসনা সজল হইয়া উঠিয়াছে।

জাতিতত্ব মুমূর্ষু পুঁজিবাদের ভাবাদর্শ ভাণ্ডারের শেষ মজুতশক্তি। কিন্তু ইহার পূতিগন্ধ সুস্থমনা মানুষকেও বিষাক্ত করিয়া তোলে। কারণ এতকাল মারাত্মকভাবে অস্ত্রসজ্জিত ইয়োরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের হাতে নিরস্ত্র ভারতীয়, চীনা ও নিগ্রোদের বিনা বাধায় ক্রীতদাসে পরিণত হইতে দেখিয়া সাধারণ মানুষের মন বিকৃত ও বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রেণীভ্রাতাদের এই নৃশংস অবাধ লুণ্ঠন দাঁড়াইয়া দেখিবার বিষাক্ত মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়িতে পারে সংযুক্ত মোর্চায় সম্মিলিত একমাত্র বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীই। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শে শিক্ষিত এই শ্রমিকশ্রেণী। এই মতাদর্শকেই তাহাদের নেতা স্তালিন পরম প্রজ্ঞার সহিত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন। এই শ্রমিকশ্রেণীই দুনিয়াকে দেখাইয়াছে যে, তাহার বহুজাতিক দেশে সমস্ত জাতি ও উপজাতি, জীবন, শ্রম ও সংস্কৃতি বিকাশের অধিকারে সম্পূর্ণ সমান। যে সকল নিরক্ষর, অর্ধ-সভ্য জাতির পূর্বে নিজেদের বর্ণমালা পর্যন্ত ছিল না, রুশ শ্রমিক আজ তাহাদের সম্মুখে জ্ঞানের বিস্তৃত রাজপথ খুলিয়া দিয়াছে।···

সংস্কৃতি

ফ্যাসিবাদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ হইতে সংস্কৃতিকে রক্ষা করাই প্যারিসের লেখক-মহাসম্মেলনের মূল লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, আধুনিক বুর্জোয়া সংস্কৃতির সত্যকার অন্তর্নিহিত বস্তুটি কি, তাহা সমস্ত প্রতিনিধি একইভাবে বুঝিবেন এবং ইহা লইয়া কোনো মতভেদ হইবে না। কিন্তু সত্যই কি তাই ?

বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবস্থা আজ ক্ষয় ও ভাঙনের অবস্থা। ফ্যাসিবাদ এই বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই সৃষ্টি, বুর্জোয়া সংস্কৃতির উপর সে এক ক্যানসারের স্ফীতি। ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিকেরা ও প্রয়োগকর্তা সেই সব ভাগ্যান্বেষীরা, বুর্জোয়াশ্রেণী

নিজের মধ্য হইতে যাহাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ইতালি ও জার্মানিতে বুর্জোয়ারা ফ্যাসিস্তদের হাতে রাজনৈতিক ও কায়িক ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছে। ইতালীয় শহরগুলির মধ্যযুগীয় বুর্জোয়ারা ভাড়াটিয়া সৈন্যদলের পরিচালকদের ম্যাকিয়াভেলীসুলভ ধূর্ততার সহিত নিয়ন্ত্রণ করিতেন, প্রায় সেই ধূর্ততার সহিতই জার্মানি ও ইতালির বুর্জোয়ারা ফ্যাসিস্তদের নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ফ্যাসিস্তদের হাতে শ্রমিকদের উচ্ছেদসাধনকে তাহারা শুধু খুশি মনেই উৎসাহ দেয় নাই, লেখক ও বিজ্ঞানীদের শাস্তি দিতে ও দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতেও ফ্যাসিস্তদের তাহারা বাধা দেয় না। অথচ ইহারাই তাহাদের মানসশক্তির প্রতিনিধি, এই সেদিন পর্যন্তও যাহারা ছিল তাহাদের গর্ব ও দম্ভের বস্তু।

আর—একটি বিশ্বযুদ্ধের সাহায্যে নূতনভাবে 'দুনিয়া বাঁটোয়ারা'র জন্য সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের মনে যে ইচ্ছা জাগিয়াছে, সেই ইচ্ছাপূরণের জন্য ফ্যাসিবাদ এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছে যে, সমস্ত জগৎকে ও অন্য সমস্ত জাতিকে শাসন করিবার অধিকার আছে জার্মান জাতির। ইহা ফ্রিড্‌রিখ নিট্‌শের বিকৃত মনের সৃষ্টি 'শ্বেত জানোয়ার'-এর শ্রেষ্ঠত্বের সেই বহুবিস্মৃত তত্ত্ব। ভারতীয়, ইন্দোচীনা, মেলানেশিয়ান, পলিনেশিয়ান, নিগ্রো প্রভৃতি জাতিগুলি লাল চুল ও সাদা মাথাওয়ালা জাতিদের দ্বারা শাসিত হইতেছে—এই ঘটনা হইতেই এই তত্ত্বের সৃষ্টি। অষ্ট্রীয় ও ফরাসী বুর্জোয়াদের পরাজিত করিয়া জার্মান বুর্জোয়ারা যখন ব্রিটিশ, ডাচ ও ফরাসী বুর্জোয়াদের ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনে ভাগ বসাইবার ইচ্ছা পোষণ করিতে শুরু করিল, তখনই এই তত্ত্বের বিকাশ হয়। সমগ্র দুনিয়ার উপর শ্বেত জাতির প্রতিযোগীহীন কর্তৃত্বের অধিকারের তত্ত্ব হইতেই প্রত্যেক জাতীয় বুর্জোয়া দল শুধু সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ জাতিকে নহে, নিজেদের শ্বেতাঙ্গ ইয়োরোপীয় প্রতিবেশীদের পর্যন্ত বর্বর বলিয়া মনে করিতেছে এবং বর্বর বলিয়াই তাহাদের পদদলিত রাখা অথবা ধ্বংস করার কথা চিন্তা করিতেছে। ইতালি ও জাপানের বুর্জোয়াশ্রেণী ইতোমধ্যেই এই তত্ত্বকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে শুরু করিয়াছে; 'সংস্কৃতি'র আধুনিক 'ধারণা'র মধ্যে এই তত্ত্বটির একটি বিশেষ বাস্তব স্থান রহিয়াছে।

বুদ্ধিজীবীদের অতি-উৎপাদন ঘটিয়া গিয়াছে, শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে, 'অন্তরায়' সৃষ্টি করিতে হইবে সংস্কৃতির বিকাশের পথে, যন্ত্রপাতির সংখ্যা পর্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং হস্তশিল্পে ফিরিয়া যাইবার দিন আসিয়াছে—ইয়োরোপীও বুর্জোয়াশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা তারস্বরে এই কথাগুলি ঘোষণা করিতেছেন।

তাঁহাদের কণ্ঠস্বরের তীব্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। ইয়র্কের আর্কবিশপ বোন্‌'মাউ-থের একটি স্কুলের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমি দেখিতে চাই, সমস্ত আবিষ্কার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যদি আমি 'ইন্টার্ন্যাল কমাবাস্‌শন ইঞ্জিন' তুলিয়া দিতে পারিতাম, তবে নিশ্চয়ই তাহা দিতাম।" তাঁহার মর্যাদাচ্যুত পেশার সহযোগী ক্যান্টারবেরীর আর্কবিশপ যন্ত্রের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন, কারণ তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' প্রচার করিতেছেন এবং বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন আগামী যুদ্ধ হইবে 'যন্ত্রের যুদ্ধ'। খ্রীস্টের লণ্ডন ও রোমের পার্থিব প্রতিনিধিদের এই বক্তৃতাগুলি এবং অনিবার্য সামাজিক বিপর্যয়ের আতঙ্কে অথবা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ঘৃণায় উন্মাদ যে-বুর্জোয়ারা সাংস্কৃতিক বিকাশ রোধের জন্য প্রচার চালাইতেছেন তাঁহাদের বক্তৃতাগুলি, যদি, ধরুন ১৮৮০ সালে প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে বুর্জোয়ারাই এই বক্তৃতাগুলিকে মূঢ়তার নিদর্শন ও বর্বরতার যুগে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান বলিয়া আখ্যা দান করিত।

আজ যখন বুর্জোয়াশ্রেণীর চোখে সাহস ও লজ্জাহীনতার মধ্যে কোনো পার্থক্যই নাই, তখন মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তনের আহ্বানকেই বলা হইতেছে 'দুঃসাহসী কল্পনা'।

অতএব আমরা দেখিতেছি, ইয়োরোপীয় বুর্জোয়া সংস্কৃতি 'কোনও একীভূত পদার্থ' নহে, অথচ বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা ইহাকে এই আখ্যাই দিয়া থাকেন। ইহার 'জনশক্তি' ভাঙিয়া গিয়া পরিণত হইয়াছে দোকানী ও ব্যাঙ্কারে যাহারা অন্য সমস্ত মানুষকেই সস্তা ও পর্যাপ্ত পণ্য বলিয়া গণ্য করে এবং যাহারা যে কোনো প্রকারে সমাজে নিজেদের উচ্চ ও আরামের অবস্থা রক্ষা করিয়া চলিতে চায়; পরিণত হইয়াছে ফ্যাসিস্তে যাহাদের হয়ত এখনও মানুষ বলা চলে, কিন্তু যাহারা কয়েক যুগব্যাপী সুদীর্ঘ নেশার ফলে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে এবং রক্তাক্ত ঘৃণিত পাপকার্য বন্ধ করিবার জন্য যাহাদের কঠোরভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার অথবা যাহাদের বিরুদ্ধে আরও কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রয়োজন হইবে।

* * *

মরিস বুর্দে নামক কোনো ব্যক্তি মনে করেন, "সংস্কৃতির সীমা নির্ধারণ ও সঙ্কোচন করা প্রয়োজন ও সম্ভব।" শ্রম অথবা কায়িক যান্ত্রিক বা মানসিক সংস্কৃতিই মূল সৃজনশক্তি। এই প্রবন্ধের লেখক মনে করেন, মূলত এবং ব্যাপক অর্থে প্রত্যেক মতাদর্শই একটি যন্ত্রবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, অর্থাৎ শ্রম ও যুক্তি-সম্মত এমন একটি ব্যবস্থা যাহার সাহায্যে মানুষ ধীরে ধীরে দুনিয়ার পরিবর্তন ঘটাইবার

জন্য তাহার বিশ্বদৃষ্টিকে বিস্তৃত করে। আমরা দেখিতেছি আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণী যাহা আছে তাহা লইয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট এবং বিরাট এক বেকারবাহিনী সৃষ্টি করিয়া, যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসার রোধের জন্য আন্দোলন চালাইয়া, উচ্চ শিক্ষালয় মিউজিয়াম প্রভৃতি রক্ষণব্যয় কমাইয়া, সত্যসত্যই অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে "সংস্কৃতির সাধারণ বিকাশের পথ···রোধ করিতেছে"। আমরা জানি, একমাত্র শিল্প যাহা বিনা বাধায় কাজ করিতেছে এবং যাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা হইতেছে যুদ্ধ-শিল্প। এ শিল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে কোটি কোটি শ্রমিক ও কৃষকের হত্যাসাধন। কোন জাতীয় বুর্জোয়া উপদল অন্যদের উপর কর্তৃত্ব করিবে ? এই আন্তর্জাতিক বিরোধের ফয়সালা করিতে চায় পশ্চিমী ইয়োরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এই যুদ্ধক্ষেত্রেই। পদদলিত প্রতিবেশীর রক্তে স্ফীত হইয়া উঠিবার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে, সেই যুদ্ধের সামরিক অধিকর্তারা প্রকাশ্যেই ধীর শান্তভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, এই যুদ্ধ ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ অপেক্ষা আরও বেশি রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক হইবে।···

সংস্কৃতি-রক্ষা কংগ্রেসের প্রতি

স্বাস্থ্যের জন্য আন্তর্জাতিক লেখক কংগ্রেসে সশরীরে উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ফ্যাসিবাদের আবির্ভাবে যাঁহারা নিজেদের তীব্রভাবে অপমানিত মনে করেন, যাঁহারা চোখের উপর দেখিতেছেন ফ্যাসিবাদের বিষাক্ত ভয়ঙ্কর ভাবধারা কিভাবে প্রসারলাভ করিতেছে, কিভাবে ফ্যাসিবাদ বিনা বাধায় নির্ভয়ে পাপের পর পাপ করিয়া চলিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না বলিয়া আমি সত্যই দুঃখিত।

ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়া-প্রজ্ঞার নূতন চিৎকার নহে। ইহা নৈরাশ্যের বিজ্ঞতার শেষ চিৎকার। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি বলিতে যাহা কিছু বুঝায়—সবকিছুর বিরুদ্ধেই তাহার হিংস্র বিতৃষ্ণাকে সে ক্রমেই বেশি নির্লজ্জতার সহিত প্রকাশ করিতেছে।

যে মানবপ্রেমিক সংস্কৃতির কীর্তিগুলি এতদিন বুর্জোয়াশ্রেণীর গর্ব ও দম্ভের বস্তু ছিল, কেন সেই 'মানবপ্রেমিক' সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে ? আমরা জানি, যদি সে যুগের কুসীদজীবী ও কারবারীদের প্রয়োজন না হইত, তবে সামন্তবাদের ধর্ম ক্যাথলিক ধর্মকে লুথার অস্বীকার করিতেন না। আমাদের

যুগে ব্যাঙ্কমালিক, কামান প্রস্তুতকারী ও অন্যান্য পরাশ্রয়ীদের জাতীয় উপদলগুলি ইয়োরোপে আধিপত্যের অধিকার স্থাপনের জন্য, সাধারণভাবে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে বঞ্চিত করিবার জন্য এক নূতন যুদ্ধের চক্রান্ত করিতেছে। এ যুদ্ধ হইবে বিভিন্ন জাতির উচ্ছেদের যুদ্ধ। বুর্জোয়া মানবতা চিরদিনই বুর্জোয়ার হাতে 'আড়াল করিয়া রাখিবার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই উপকরণ দিয়াই বুর্জোয়াশ্রেণী পেতি-বুর্জোয়াদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিজেদের দিকে টানিয়া আনিয়াছে, কিন্তু আজ বুর্জোয়া 'সংস্কৃতির ভিত্তি' এই বুর্জোয়া মানবতাকেও বুর্জোয়াশ্রেণী ধ্বংস করিতে চায়। কারণ, নূতন নরমেধের আয়োজনে মানবতার ধারণাকে ফ্যাসিবাদ তাহার মূল লক্ষ্যের বিরোধী মনে করে।

ফ্রান্সের লেখকদের উদ্যোগে দুনিয়ার সমস্ত সৎ লেখকেরা আজ ফ্যাসিবাদ ও তাহার সমস্ত পাপিষ্ঠতার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছেন।

সংস্কৃতির অধিকর্তা'দের পক্ষে এই মহান লক্ষ্য খুবই স্বাভাবিক এবং বিজ্ঞানীরাও যে শিল্পীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন নিশ্চয়ই এ আশাও করা যায়।

কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে মানবতার যুক্তি দ্বিপদ নেকড়ে ও বরাহের বুদ্ধির নাগালের বাহিরে এবং মানবতার সর্বজনীন তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার ও তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইবার ক্ষমতা দুনিয়ায় মাত্র একটি শ্রেণীরই আছে। এই শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণী।

অতএব, যাহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন অসম্ভব তাহাদেরই সমন্বয়সাধনের দিকে এবং যে বুর্জোয়াসমাজ শত্রুতা ছাড়া, মানবজাতির বৃহত্তম অংশকে নিপীড়ন করা ছাড়া বাঁচিতে পারে না, সেই বুর্জোয়াসমাজের সংস্কারের দিকে যেন আমাদের প্রচেষ্টা আমরা চালিত না করি। কোটি কোটি মেহনতী মানুষের অন্তর্নিহিত মানসশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিবার কাজেই যেন আমরা আমাদের সর্বপ্রয়াস, সর্বশক্তি নিয়োগ করি।

শ্রমিকশ্রেণীর মানবতাই একমাত্র সত্যকার মানবতা। বর্তমান জগতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিমূলটির পরিবর্তন সাধনের মহান কর্তব্য পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে শ্রমিকশ্রেণী। যে-দেশে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে সে-দেশে আমরা দেখিতেছি জনসাধারণের মধ্যে কি বিপুল শক্তি সুপ্ত ছিল, দেখিতেছি, কত প্রতিভা জাগিয়া উঠিতেছে এই

জনতার মধ্য হইতে, দেখিতেছি নূতন আধেয় দিয়া কত দ্রুত সেখানকার জীবনের আধারে পরিবর্তন ঘটাইতেছে শ্রমিকশ্রেণী।

প্রিয় কমরেডগণ, চিন্তাশীল মানুষের আন্তরিক বাণীকে উপলব্ধি করিতে পারে শুধু শ্রমিকেরা, সংস্কৃতির হস্তশিল্পীরা, মেহনতী বুদ্ধিজীবীরা ও মেহনতী কৃষকেরা। ইহারাই সংস্কৃতির অধিকর্তা হইতে চায়, ইহারাই সংস্কৃতির অধিকর্তা হইবার যোগ্যতা রাখে।

জর্জ বার্নার্ড শ

ফ্যাসিস্ত নায়কের উত্থান-পতন

হিটলার

জার্মান প্রশাসনের কেন্দ্র থেকে দূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত সর্বত্র তখন পচন ধরেছে। ১৮৭১ সালে বোনাপার্তিস্ট ফরাসী বাহিনীকে প্রচণ্ডভাবে পরাজিত করে সামরিক মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত জার্মানির হোহেনজোলার্ন রাজতন্ত্র ১৯১৮ সালে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের আঘাতে পর্যুদস্ত হল। রাজার শাসনের জায়গায় এল সকলের দ্বারা নির্বাচিত যার-তার শাসন। লোকের ধারণা, এতেই জনসাধারণের সবচেয়ে বেশি কল্যাণ, অর্থাৎ গণতন্ত্রের যা লক্ষ্য, কিন্তু কার্যত এতে যে-কোনো উচ্চাভিলাষীর রাজনৈতিক উন্নতির পথ খুলে যায়। ১৯৩০-এ মিউনিখে ছিল হিটলার নামে এক তরুণ, চার বছরের যুদ্ধে সে সৈনিক ছিল। কোনো বিশেষ সামরিক গুণপনা না থাকায় আয়রন ক্রস ও করপোরালের পদের চেয়ে বড় কিছু তার ভাগ্যে জোটে নি। হিটলার ছিল গরিব। কোনো শ্রেণীতেই তাকে ফেলা যেত না। সে ছিল বোহেমিয়ান; শিল্পে কিছুটা রুচি ছিল, কিন্তু শিল্পী হিসেবে সফল হবার শিক্ষা বা প্রতিভা ছিল না। ফলে সে আটকে ছিল বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যখানে, বুর্জোয়াশ্রেণীতে যাবার মতো আয় ছিল না, আবার শ্রমিকশ্রেণীতে যাবার মতো কারিগরি দক্ষতা ছিল না। কিন্তু তার ছিল কণ্ঠস্বর, বক্তৃতা করতে পারত। সে হয়ে উঠল বীয়ারের আড্ডার বক্তা, সেখানকার শ্রোতাদের সে জমিয়ে রাখতে পারত। সে যোগ দিল এক মদের আড্ডা বিতর্ক পরিষদে (আমাদের পুরাতন কোজার্স হলের মতো), তাকে নিয়ে যার সভ্যসংখ্যা দাঁড়াল সাত। তার বক্তৃতার টানে আরো লোক জড়ো হল, সে হয়ে দাঁড়াল আড্ডার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। সে যেসব বাণীবর্ষণ করত, তার অনেকটাই

সত্য। সৈনিক হিসেবে সে শিখেছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষেরা জনতাকে সহজেই শায়েস্তা করতে পারে; ব্রিটিশ কায়দার পার্টি পার্লামেন্ট কখনোই দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে পারে না, ঘটাবে না, যে-দারিদ্র্য তার কাছে এমন তিক্ত; যে ভারসাই চুক্তির তাড়নায় পরাভূত জার্মানি তার শেষ কানাকড়ি বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছে, লুঠেরাদের সংযত করার মতো বড় একটা সৈন্যবাহিনী থাকলেই সেই চুক্তির প্রত্যেকটা শর্ত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা যায়; য়ুরোপের অর্থনীতিকে শাসন করছে অর্থব্যবসায়ীদের যে প্রবল গোষ্ঠী তারাই চালাচ্ছে মালিকদেরও। এই পর্যন্ত হিটলার যা বুঝেছিল, তাতে কোনো ফাঁক ছিল না। কিন্তু তথ্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে সে সব তালগোল পাকিয়ে ফেলল। সে ধরে নিল, সব অর্থব্যবসায়ীই ইহুদি; ইহুদিরা অভিশপ্ত, তাই তাদের নির্মূল করতে হবে, জার্মানরা ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি, পৃথিবী শাসন করার ভার ঈশ্বরই তাদের উপর ন্যস্ত করেছেন; আর এই শাসন কায়েম করার জন্য তার দরকার কেবল এক দুর্দমনীয় সেনাবাহিনী। এইসব ভ্রান্ত মোহ হানৎস, ফ্রিট্‌স, গ্রেচেন এবং মদের আড্ডার রসিকদের মুগ্ধ করেছিল। ভাড়াটে গুণ্ডাদের দিয়ে নব্য-হিটলারপন্থীদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা হলে হিটলার এমন এক শক্তপোক্ত দেহরক্ষী-বাহিনী গড়ে তুলল যার দাপটে বিরোধীরা শেষ পর্যন্ত রাস্তায় দেহ রাখল।

এই সম্বল পুঁজি করেই হিটলার আবিষ্কার করল, সে নেতা হবার জন্যই জন্মেছে। জ্যাক কেড, ওয়াট টাইলার, রানী এলিজাবেথের অধীনস্থ এসেকস, ডাবলিন প্রাসাদের অধীনস্থ এবেট এবং দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের অধীনস্থ লুই নেপোলিওনের মতোই সেও ভেবে বসল, রাস্তায় একটা পতাকা হাতে নিয়ে নামলেই সমগ্র জনমণ্ডলী তাকে স্বাগত জানাবে, অনুসরণ করবে। চার বছরের যুদ্ধের এক সৈন্যাধ্যক্ষ আর বীয়ারের আড্ডায় তার চাল ও বাকচাতুরীতে যারা মজেছে, তাদের সঙ্গী করে হিটলার পরীক্ষা করে দেখল। এই ছোট্ট গোষ্ঠী নিয়ে সে রাস্তায় কুচকাওয়াজে বেরোল। যে-কোনো শহরে যা ঘটে থাকে, তাই ঘটল। মজা দেখতে রাস্তার লোকের ভিড় জমল। আমি লণ্ডনে দেখেছি হাজার হাজার নাগরিক ছুটছে, অন্যরা কেন ছুটছে, তাই জানবার জন্য। ব্যাপারটা দেখায় বিপ্লবী গণজাগরণের মতোই। একবার উপলক্ষ্য ছিল একটা পলাতক গোরু। অন্যবার মেরি পিকফোর্ড; পুরনো নির্বাক ছবির 'বিশ্বের প্রিয়তমা' ট্যাক্সিতে চড়ে হোটেলে যাচ্ছিলেন।

হিটলার হয়ত একবার ভেবেছিল, মুসোলিনি রোম অভিযানের (মুসোলিনি

গেছল ট্রেনে) মতো জমজমাট কিছু সেও ঘটাতে পারবে। কুর্ট আইসনারের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সাম্প্রতিক সাফল্য তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু আইসনারকে কেউ বাধা দেয় নি। হিটলার ও তার জনতা যখন সরকারি বাহিনীর সম্মুখীন হল, তারা হিটলারকে স্বাগত জানাল না; বুরবঁ বাহিনীর প্রবীণ সৈনিকেরা একদা প্রত্যাগত নেপোলিওনকে যেভাবে অভিবাদন জানিয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি ঘটল না। তারা গুলি চালাল। হিটলারের জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। বুলেটের বর্ষণ থেকে বাঁচবার জন্য হিটলার ও জেনেরাল লুডেনফ'কে শেষ পর্যন্ত রাস্তায় শুয়ে পড়তে হল। এই পাগলামির জন্য হিটলারের আট মাস কারাদণ্ড হল। হিটলার সরকারকে তেমন ভয়ও দেখাতে পারে নি যাতে কেড, টাইলার বা এসেকসের মতো তাকেও হত্যা করতে সরকার বাধ্য হয়। কারাগারে বসে হিটলার ও তার সঙ্গ-সচিব হেস 'মাইন কাম্প্‌ফ' (আমার সংগ্রাম, আমার কর্মসূচী, আমার মতামত অথবা যা ইচ্ছা হয় তাই) বলে এক বই লিখে ফেলল।

লুই নেপোলিওনের মতো হিটলারও একবার শিখেছে, বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শেষ চূড়ান্ত পদক্ষেপ হতে পারে, প্রথম পদক্ষেপ কখনোই নয়। হিটলার শিখেছে, জনতার শিরোপা পাবার আগে উচ্চাভিলাষ'দের আঁতাত করতে হয় অর্থব্যবসায়ীদের সঙ্গে, শিল্পপতিদের সঙ্গে, ব্যাঙ্কমালিকদের সঙ্গে, রক্ষণশীলদের সঙ্গে, কারণ যে সব দেশে জনসাধারণ নিজেদের ইচ্ছামতো শাসক নির্বাচন করে, সেইসব দেশ আসলে চালায় এরাই। অভিনেতৃসুলভ চটকের জোরে হিটলার সহজেই একটা ব্যবস্থা করে ফেলে যাতে রাজকীয় সম্মানের চেয়েও বেশি সম্মানসহ জার্মান রাজত্বে আজীবন চানসেলারের পদে সে অভিষিক্ত হয়। অথচ তার পুঁজি বলতে জোরালো কণ্ঠ, সমাজবাদের ছিটেফোঁটা নিয়ে তৈরি এক মতাদর্শ, ইহুদিদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, আর গণতন্ত্রের ভেকধারী পার্লামেনটারি জনতাতন্ত্রের প্রতি প্রবল অবজ্ঞা।

নকল অবতার ও বদ্ধ উন্মাদ

এ পর্যন্ত হিটলার ছিল অর্থব্যবসায়ীদেরই সৃষ্টি, তাদেরই হাতের উপকরণ। কিন্তু অর্থব্যবসায়ীদের হিসেবে ভুল হয়েছিল। যে মুহূর্তে তারা হিটলারকে শিখণ্ডী খাড়া করল, জনতার ভক্তিবাদের উচ্ছ্বাসে হিটলার অবতার হয়ে উঠল,

জননায়ক হয়ে উঠল। যে কোনো বড় ব্যবসায়ীর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা তার হাতে এসে পড়ল। বিনা দ্বিধায় পুরোদস্তুর পার্লামেনটারি অনুমোদন নিয়ে সে তার রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যা করল। অতীতের বিখ্যাত কোনো ক্ষণে সন্ত পীটার যেমন বলেছিলেন, "তুমিই খ্রীস্ট", জার্মান জাতিও সেই একই বাণী উচ্চারণ করল। ফলও একই হল। ক্ষমতা ও ভক্তির প্রাবল্য হিটলারের মাথা ঘুরিয়ে দিল। জাতির কল্যাণকামী যে নেতা বেকারির উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল, ভারসাইয়ের চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে ছ-কোটি দেশবাসীর আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে এনেছিল, সেই হয়ে দাঁড়াল পাগল অবতার। ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য জাতির প্রভু হিসেবে তার ঈশ্বরাদিষ্ট দায়িত্ব, বাকি মানবসমাজকে যুদ্ধে পরাভূত করে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, জার্মান ঈশ্বরের জার্মান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। তাকে প্রীত করে শান্ত করার কাপুরুষোচিত চেষ্টা দেখে উৎসাহিত হয়ে সে রাশিয়া আক্রমণ করল। সে হিসেব করে রেখেছিল, সোভিয়েত সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে সমগ্র পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য শেষ পর্যন্ত তার সহযোগী হবে।

কিন্তু পুঁজিবাদী পাশ্চাত্যের অতটা দূরদৃষ্টি ছিল না। তার উপর ঈর্ষা। তারা খুব একটা বুদ্ধিমন্তের মতো আচরণ করল না। তারা স্তালিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিটলারকে পিঠে ছুরি মারল। হিটলার প্রাণপণে লড়ল, ইতালি ও স্পেনে তার উচ্চাভিলাষী সহযোদ্ধারাও মদত দিল। কিন্তু হিটলার জুলিয়াস সীজারও নয়, মহম্মদও নয়। অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটিয়ে তার বিজয়াভিযানকে গ্রহণীয় ও স্থায়ী করে তোলার চেষ্টাই সে করে নি। বরং যেখানেই সে জয়লাভ করেছে, সেখানেই তার নাম ঘৃণিত হয়ে উঠেছে। নিকট পাশ্চাত্য তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, আমেরিকার প্রবল শক্তি দূর পাশ্চাত্যও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। বারো বছর ধরে অসংখ্য লোককে হত্যা করে শেষে তাকে আত্মঘাতী হতে হল, তার সহযোগীদের ফাঁসিতে ঝুলতে হল।

যারা সাম্রাজ্য জয় করে, তাদের জন্য নীতিবাক্য, তারা যদি সভ্যতার জায়গায় বর্বরতা কায়েম করে, তাদের পতন অনিবার্য। তারা যদি বর্বরতার জায়গায় সভ্যতা আনতে পারে, তারা টিকে যাবে। মুসোলিনি আবিসিনিয়া জয় করে যখন স্থানীয় দানাকিলদের আক্রমণ থেকে অপরিচিত যাত্রীদের নিরাপদ করলেন, তখন তিনি পৃথিবীর যে কল্যাণ সাধন করলেন, আমরাও সেই লক্ষ্যই সাধন করে চলেছি, বিষবাষ্পসহ সেই একই কায়দায়, ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে ; লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজীল্যাণ্ডে, স্কটিশ

হাইল্যাণ্ডসে। মুসোকে তিরস্কার করা আমাদের শোভা পায় না, তার ক্রীড়নক রাজাকে সম্রাট বলতে ছেলেমানুষের মতো অস্বীকার করাও শোভা পায় না। তবুও আমরা তাই করেছি।…

যেটুকু সাফল্য এরা অর্জন করেছে, তা ছিল পার্লামেনটারি কথার বাজারের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায়, যেমন ঐ পার্লামেনটের উৎসব আবার অপদার্থ রাজাদের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায়, কারণ জনতাও যেমন, রাজারাও তেমনই রাজনৈতিক পুতুলপুজো ও অজ্ঞতার মধ্যেই জীবনধারণ করে। ভোটাধিকার যতই ব্যাপক হয়, বিভ্রান্তিও ততই বাড়ে।…আমরা এখনও নিজেদের ঠকিয়ে চলেছি, বামের দিকে হেললেই বুঝি সেটা গণতান্ত্রিক, আর দক্ষিণের দিকে হেললেই সাম্রাজ্য-বাদী। কিন্তু আসলে আমরা হেলে পড়ছি এক ব্যর্থতা থেকে আরেক ব্যর্থতায়, বাস্তব গণতন্ত্রকে আর নিশ্চিত করতে পারছি না আমরা, যে গণতন্ত্রের লক্ষ্য যোগ্য শাসকদের নেতৃত্বে শাসিতদের কল্যাণের জন্য অপক্ষপাতী প্রশাসন। জনতার নৈরাজ্যবাদে তারই পরাভব।

জর্জি ডিমিট্রভ

ফ্যাসিবাদের শ্রেণীচরিত্র

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটির ত্রয়োদশ প্লেনাম সঠিক-ভাবেই শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ফ্যাসিবাদকে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচেয়ে জাতিদাম্ভিক এবং লগ্নী পুঁজির সবচেয়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিভূর প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব বলে বর্ণনা করেছিল।

সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ধরনের ফ্যাসিবাদ হল জার্মান ফ্যাসিবাদ। এর নিজেকে জাতীয় সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করায় ধৃষ্টতা রয়েছে, যদিও সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এর কোনই মিল নেই। হিটলারের ফ্যাসিবাদ শুধুমাত্র বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ নয়, এ হল পাশবিক জাতিদম্ভ। এ হল রাজনৈতিক দস্যুতার এক শাসনব্যবস্থা, শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে প্ররোচনা ও নির্যাতনের ব্যবস্থা। এ হল মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও পাশবিকতা, অন্যান্য জাতিদের সম্পর্কে বল্গাহীন আক্রমণ।

জার্মান ফ্যাসিবাদ আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবের উদ্যত খড়্গ হিসাবে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রধান প্ররোচক হিসাবে এবং সমগ্র বিশ্বের মেহনতী মানুষের মহান পিতৃভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রবর্তক হিসাবে কাজ করে চলেছে।

ফ্যাসিবাদ অটো বাওয়ারের মত অনুযায়ী "প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া—এই দুই শ্রেণীর উর্ধ্বে অবস্থিত রাষ্ট্রক্ষমতার কোনো একটা রূপ নয়।" অথবা ব্রিটিশ সোশ্যালিস্ট ব্রেলস ফোর্ডের ঘোষণামতো "রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র দখলকারী পেটি-বুর্জোয়াদের বিদ্রোহ"ও নয়। না, ফ্যাসিবাদ শ্রেণীর উর্ধ্বে কোনো সরকার নয় অথবা লগ্নী পুঁজির উপর পেটি-বুর্জোয়া বা ভবঘুরে সর্বহারার কোনো সরকার নয়। ফ্যাসিবাদ হল লগ্নী পুঁজিরই শক্তি। এ হল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক

ও বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী প্রতিহিংসার সংগঠন। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ হল জাতিদম্ভের নগ্নতম রূপ যা অপরাপর জাতির বিরুদ্ধে পাশবিক ঘৃণার প্ররোচনা যোগায়।

ফ্যাসিবাদের এই সঠিক চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ অবশ্যই করতে হবে ; কারণ অনেকগুলি দেশে ফ্যাসিবাদ সমাজবাদী বুলির আড়ালে সেই অগণিত পেটি-বুর্জোয়া জনগণের, যারা সংকটের আবর্তে নিজ নিজ গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের এবং এমনকি সর্বহারাশ্রেণীর সবচেয়ে পশ্চাৎপদ স্তরের কোনো কোনো অংশেরও, সমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফ্যাসিবাদের প্রকৃত শ্রেণীচরিত্র ও এর সঠিক প্রকৃতি অনুধাবন করলে, তারা কখনই একে সমর্থন জানাত না।

এক-একটি নির্দিষ্ট দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও আন্তর্জাতিক অবস্থান অনুযায়ী ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের বিকাশ বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। কোনো কোনো দেশে, বিশেষ করে যেখানে ফ্যাসিবাদের কোনো ব্যাপক গণভিত্তি নেই এবং যেখানে ফ্যাসিবাদী বুর্জোয়াদের নিজেদের শিবিরে নানা উপদলের সংঘর্ষ খুব তীব্র, সেখানে ফ্যাসিবাদ সরাসরিভাবে সংসদকে অবলোপ করার সাহস রাখে না। আর তাই অন্যান্য বুর্জোয়া দল এবং এমনকি সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিকেও কিছু পরিমাণ বৈধতা রাখবার অনুমতি দেয়। অন্য সকল দেশে, যেখানে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী এক আসন্ন বিপ্লবের আবির্ভাব সম্পর্কে শঙ্কিত, সেখানে তারা হয় তৎক্ষণাৎ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও উপদলের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও সন্ত্রাসের শাসনকে তীব্রতর করে তার সীমাহীন একচেটিয়া রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এর দ্বারা ফ্যাসিবাদের অবস্থা যখন বিশেষভাবে সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে, তখন এর দরুন কিন্তু ফ্যাসিবাদের পক্ষে নিজের শ্রেণীচরিত্রকে পরিবর্তিত না করেও প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্বের সঙ্গে স্থূল ভূয়ো সংসদীয় পন্থার সংযুক্তি সাধন ও নিজের ভিত্তিপ্রসারের প্রচেষ্টায় বাধা হয় না।

ফ্যাসিবাদের ক্ষমতালাভ এক বুর্জোয়া সরকার থেকে অপর এক সরকারে মামুলি উত্তরণ নয়, এ হল বুর্জোয়াদের শ্রেণীকর্তৃত্বের একটি রাষ্ট্রীয় রূপ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জায়গায় অন্য এক রাষ্ট্রীয় রূপের প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা। এই পার্থক্যটি উপেক্ষা করা গুরুতর ভুল হবে। এই ভুল বিপ্লবী

সর্বহারাদের দ্বারা ফ্যাসিবাদের ক্ষমতা দখলের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য শহর ও গ্রামের মেহনতী মানুষের ব্যাপক সমাবেশ ব্যাহত করবে এবং তাদের বুর্জোয়া শিবিরের মধ্যেকার স্ব-বিরোধিতার সুযোগ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করবে। কিন্তু আবার ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা অনুসৃত ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ, যা মেহনতী জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে দমন করে, সংসদের অধিকারকে খর্ব করে ও তা নিয়ে জোচ্চুরি করে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমননীতি তীব্র করে, সে-গুলির গুরুত্বকে ছোট করে দেখা কিছু কম বিপজ্জনক ও কম গুরুতর ভ্রান্তি নয়।

কমরেডগণ, ফ্যাসিবাদের ক্ষমতালাভকে এই রকম সরলীকৃত ও স্বচ্ছন্দরূপে কল্পনা করা ভুল হবে যে এ যেন লগ্নী পুঁজির কোনো একটি কমিটি কোনো এক নির্দিষ্ট তারিখে ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। বাস্তব-ক্ষেত্রে, ফ্যাসিবাদ সাধারণত ক্ষমতায় আসে পুরনো বুর্জোয়া পার্টিগুলির অথবা ঐ পার্টিগুলির কোনো নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে পারস্পরিক লড়াইয়ের গতিপথে, অথবা কখনও কখনও তাদের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াইয়ের গতিপথে, এমনকি ফ্যাসিস্ত শিবিরের মধ্যেই লড়াইয়ের গতিপথে—কখনও কখনও এ লড়াই সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হয়। যেমন হয়েছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও অপরাপর দেশে। এই সবকিছু কিন্তু এই সত্যটিকে চাপা দেয় না যে, ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার আগে বুর্জোয়া সরকারগুলি সাধারণত কতকগুলি প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে এবং কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা অবলম্বন করে যা ফ্যাসিবাদের ক্ষমতা দখলের পথকে প্রত্যক্ষভাবে সুগম করে। বুর্জোয়াদের এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং প্রস্তুতিপর্বে ফ্যাসিবাদের শক্তিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম না করে, সে ফ্যাসিবাদের বিজয়কে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে না, বরঞ্চ সেই বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে।

সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতারা ফ্যাসিবাদের প্রকৃত শ্রেণীচরিত্রকে চাপা দিয়ে জনতার কাছ থেকে তাকে গোপন রেখেছিল, এবং বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাবলীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাদের আহ্বান জানায় নি। তারা এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব বহন করছে এই কারণে যে, ফ্যাসিবাদী দেশে মেহনতী জনগণের এক বিশাল অংশ ফ্যাসিবাদের মধ্যে তাদের সবচেয়ে ঘৃণ্য শত্রু, রক্তলোলুপ, লুণ্ঠনকারী লগ্নী পুঁজিকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং ঐ জনগণ তাকে প্রতিহত করতে প্রস্তুত ছিল না।

জনগণের উপর ফ্যাসিবাদের প্রভাবের উৎস কি? ফ্যাসিবাদ জনগণকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এই কারণে যে, জনগণের সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন ও দাবিগুলির কাছে সে মহাবাগাড়ম্বরে আবেদন করে। ফ্যাসিবাদ শুধু জনগণের মধ্যে গভীরভাবে বদ্ধমূল সংস্কারগুলিকেই উসকিয়ে দেয় না, উপরন্তু তাদের অপেক্ষাকৃত উন্নততর অনুভূতিগুলি, যথা—তাদের ন্যায় বিচারের চেতনাকে, এমনকি কখনও কখনও তাদের বিপ্লবী ঐতিহ্যকেও কাজে লাগায়। কেন জার্মান ফ্যাসিবাদীরা, যারা বড় বড় বুর্জোয়াদের সেবাদাস ও সমাজতন্ত্রের মারাত্মক শত্রু, তারা জনগণের কাছে নিজেদের "সমাজতন্ত্রী" বলে পরিচয় দেয় এবং তাদের ক্ষমতাদখলকে বিপ্লব বলে বর্ণনা করে? তার কারণ জার্মানির অগণিত মেহনতী জনগণের সমাজতন্ত্রের যে আকাঙ্ক্ষা এবং বিপ্লবের প্রতি যে বিশ্বাস রয়েছে তাকেই কাজে লাগাবার চেষ্টা করে।

ফ্যাসিবাদ চরম সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থেই কাজ করে, কিন্তু জনগণের কাছে নিজেকে নির্যাতিত জাতিগুলির রক্ষকের ছদ্মবেশে উপস্থিত করে এবং অপমানিত জাতীয় অনুভূতিগুলিকে নাড়া দেয়। যেমন জার্মান ফ্যাসিবাদীরা করেছিল যখন তারা "ভার্সাই চুক্তির বিরোধিতা"র স্লোগান তুলে পেটি-বুর্জোয়া জনগণের সমর্থন অর্জন করেছিল।

ফ্যাসিবাদের উদ্দেশ্য হল জনগণের উপর বল্গাহীন শোষণ কায়েম করা। কিন্তু লুণ্ঠনকারী বুর্জোয়া, ব্যাঙ্ক, ট্রাস্ট ও ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে মেহনতী জনগণের তীব্র ঘৃণা নিয়ে ফ্যাসিবাদ অতি সুকৌশলে, পুঁজিবাদবিরোধী বুলি কপচিয়ে ও রাজনৈতিকভাবে অপরিণত জনগণের কাছে এক-একটি নির্দিষ্ট সময়ে সবচেয়ে লোভনীয় স্লোগান নিয়ে হাজির হয়ে তাদের চিত্ত জয় করে। তাদের এই রকমের স্লোগান হল: জার্মানিতে "ব্যক্তিগত মঙ্গলের চেয়ে সাধারণ মঙ্গল অনেক উর্ধ্বে"; ইতালিতে "আমাদের রাষ্ট্র ধণতান্ত্রিক নয়, বরং এক যৌথ রাষ্ট্র"; জাপানে "শোষণহীন জাপানের জন্য", মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "সম্পদের ভাগ নাও" ইত্যাদি।

ফ্যাসিবাদ জনগণকে সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ ও ঘুষখোর লোকদের হাতে শিকার হবার জন্য তুলে দেয়, কিন্তু জনগণের সামনে হাজির হয় এক "সৎ ও নিষ্কলুষ সরকার"-এর দাবি নিয়ে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকার সম্পর্কে জনসাধারণের মোহভঙ্গের উপর বেসাতি করে ফ্যাসিবাদ দুর্নীতির কপট নিন্দা করে [উদাহরণস্বরূপ জার্মানিতে বারমাত এবং স্কলারেকের কাণ্ড, ফ্রান্সে স্তাভিস্কির কাণ্ড এবং অনুরূপ অন্যান্য অসংখ্য ঘটনা]।

পুরনো বুর্জোয়া পার্টিগুলিতে আস্থা হারিয়ে যে জনসাধারণ তাদের পরিত্যাগ করেছে সেই জনসাধারণকে ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়াদের সবচেয়ে প্রতি-ক্রিয়াশীল চক্রের স্বার্থেই পাকড়ায়। কিন্তু বুর্জোয়া সরকারগুলির বিরুদ্ধে তার আক্রমণের কঠোরতার দ্বারা ও পুরনো বুর্জোয়া দলগুলির প্রতি তার আপসহীন ভাবভঙ্গির দ্বারাই ফ্যাসিবাদ এই জনগণকে প্রভাবিত করে। মানববিদ্বেষ ও ছলনায় বুর্জোয়া-প্রতিক্রিয়াধারাকে ছাপিয়ে ফ্যাসিবাদ তার প্রতিটি দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের, এমনকি একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক স্তরের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। অভাব, বেকারত্ব এবং জীবনের অনিশ্চয়তার দরুন হতাশ পেটি-বুর্জোয়া জনগণ, এমনকি শ্রমিকদেরও একটি অংশ ফ্যাসিবাদের এই সামাজিক ও জাতিদাম্ভিক বাগাড়ম্বরের শিকার হয়।

সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং বিক্ষুব্ধ জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণের পার্টি হিসাবেই ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় আসে, কিন্তু তবুও সে তার ক্ষমতালাভকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে "সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে" এক "বিপ্লবী" আন্দোলন হিসাবে এবং সমগ্র জাতির "পরিত্রাণ"-এর প্রতীক হিসাবে প্রতিপন্ন করে [এখানে আমরা মুসোলিনির রোম "অভিযান", পিলসুদস্কির ওয়ারশ "অভিযান", জার্মানিতে হিটলারের ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট "বিপ্লব" এবং অনুরূপ ঘটনা স্মরণ করতে পারি।]

কিন্তু ফ্যাসিবাদ যে কোনো মুখোশই ধারণ করুক, যে কোনো রূপেই নিজেকে উপস্থাপিত করুক এবং যে কোনো পথেই ক্ষমতায় আসুক, তবুও—ফ্যাসিবাদ হল মেহনতী জনগণের উপর পুঁজির সবচেয়ে হিংস্র আক্রমণ,—ফ্যাসিবাদ হল বল্গাহীন জাতিদম্ভ ও আগ্রাসী যুদ্ধ,—ফ্যাসিবাদ হল প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লব, —ফ্যাসিবাদ হল শ্রমিকশ্রেণীর এবং সমস্ত মেহনতী মানুষের সবচেয়ে ঘৃণ্য শত্রু!

চার্লস চ্যাপলিন

ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট

রাশিয়ার রণাঙ্গনে নির্ধারিত হবে গণতন্ত্রের জীবনমরণ। মিত্রশক্তির ভাগ্য এখন কমিউনিস্টদের হাতে। রাশিয়া যদি পরাভূত হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ মহাদেশ এশিয়া চলে যাবে নাৎজিদের অধীনে। প্রায় পুরো প্রাচ্যদেশ জাপানীদের করতলগত হওয়ায় নাৎজিরা পৃথিবীর প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ রণসামগ্রী একেবারে নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে। এরপর হিটলারকে হারাবার আর কি সুযোগ থাকবে আমাদের?

এদিকে যানবাহনের অসুবিধা, হাজার হাজার মাইল দূরে আমাদের যোগাযোগ রক্ষার সমস্যা, ইস্পাত তেল ও রাবারের সমস্যা এবং বিভেদ সৃষ্টি করে জয় করার হিটলারি রণকৌশল—এ অবস্থায় রাশিয়া যদি পরাজিত হয়, আমাদের অবস্থা হবে সঙ্গিন।

কেউ কেউ বলেন, তাতে আর কি? যুদ্ধ না হয় আরও দশ কি কুড়ি বছর চলবে। আমার হিসেবে এটা হল একটু বেশি আশাবাদিতা। এই পরিস্থিতিতে এবং এমন দুর্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ হবে খুবই অনিশ্চিত।

কিসের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি?

রাশিয়ানদের এখন খুবই সাহায্যের প্রয়োজন। তারা দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার জন্য দাবি জানাচ্ছে। মিত্র দেশগুলোর মধ্যে এ-বিষয়ে মতভেদ আছে যে এক্ষুণি দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা সম্ভব কিনা। আমরা শুনে থাকি দ্বিতীয় ফ্রন্ট চালাবার মতো যথেষ্ট যুদ্ধসামগ্রী মিত্রশক্তির নেই। আবার শুনি যে তাদের তা আছে। আমরা এও শুনি যে পরাজয়ের আশঙ্কায় তারা এই সময়ে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার

ঝুঁকি নিতে চাইছে না। পুরোপুরি নিশ্চিত ও প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত ও প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত কি আমরা অপেক্ষা করতে পারি? ঝুঁকি না নিয়ে কি আমরা থাকতে পারি? যুদ্ধে ঝুঁকি ছাড়া কোনো রণকৌশল নেই। এই মুহূর্তে জার্মানরা ককেসাস থেকে ৩৫ মাইল দূরে। ককেসাস যদি যায়, রাশিয়ার ৯৫ শতাংশ তেল হাতছাড়া হবে। যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছে, আরও লক্ষ লক্ষ মৃত্যুমুখে—তখন আমরা কি ভাবছি তা সৎভাবে স্পষ্ট করে বলতে হবে। মানুষের মনে নানা প্রশ্ন উঠছে। আমরা শুনছি আয়ারল্যাণ্ডে বিরাট অভিযাত্রী ফৌজ নামছে, আমাদের জাহাজের কনভয়ের ৯৫ শতাংশ অক্ষতভাবে ইয়োরোপে পৌঁছচ্ছে, কুড়ি লক্ষ ব্রিটিশ সৈন্য সম্পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য তৈরি। তাহলে কিসের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, রাশিয়ার যখন এমন মরিয়া অবস্থা?

আমরা মুখোমুখি হতে পারি

সরকারি ওয়াশিংটন ও সরকারি লণ্ডনকে বলছি, এ প্রশ্নগুলো বিভেদ সৃষ্টির জন্য নয়। বিভ্রান্তি দূর করে, আত্মবিশ্বাস ও ঐক্য গড়ে তুলে চূড়ান্ত জয়ের জন্যই এই প্রশ্ন আমরা রাখছি। এবং এর উত্তর যাই হোক না কেন আমরা তার মুখোমুখি হতে পারি। রাশিয়া দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ছে। সে দেয়ালটাই হল মিত্রশক্তির সবচেয়ে মজবুত প্রতিরক্ষা। লিবিয়াকে রক্ষা করতে গিয়ে আমরা তা হারিয়েছি। ক্রীট রক্ষা করতে গিয়েও অমেরা হেরেছি। ফিলিপিনস ও প্রশান্ত মহাসাগরে অন্যান্য দ্বীপ বাঁচাতে গিয়েও আমরা সেগুলো হারিয়েছি। কিন্তু রাশিয়াকে আমরা হারাতে পারি না, কারণ তার অবস্থান গণতন্ত্রের সংগ্রামীদের প্রথম সারিতে। যখন আমাদের জগৎ, আমাদের জীবন, আমাদের সভ্যতা আমাদের পায়ের কাছে ধসে পড়ছে—তখন আমাদের একটা ঝুঁকি নিতেই হবে।

রাশিয়া যদি ককেসাস হারায় তাহলে মিত্রশক্তির পক্ষে তা হবে চরম সর্বনাশ। তখন তোষণকারীদের দিকে নজর রাখতে হবে, কারণ তারা গর্ত থেকে তখন বেরিয়ে আসবে। তারা চাইবে বিজয়ী হিটলারের সঙ্গে একটা রফা করতে। তারা বলবে "আর আমেরিকান জীবন নষ্ট করা অর্থহীন—আমরা হিটলারের সঙ্গে 'একটা ভালো রফা' করতে পারি।"

নাৎজি ফাঁদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার

এই নাৎজি ফাঁদের ওপর নজর রাখুন। এই নাৎজি নেকড়েগুলো ভেড়ার পোশাক পরবে। তারা শান্তির ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব লোভনীয় করে তুলবে এবং ভালো করে বোঝাবার আগেই আমরা নাৎজি মতবাদের কাছে ধরা দেব। আমরা দাস হয়ে পড়ব। তারা আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেবে এবং আমাদের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করবে। পৃথিবী শাসিত হবে গেস্টাপো দ্বারা। তারা আকাশ থেকে আমাদের শাসন করবে। হ্যাঁ, সেটাই হবে ভবিষ্যতের শক্তি।

আকাশে নাৎজি একাধিপত্য সমস্ত বিরোধিতার অস্তিত্ব উড়িয়ে দেবে। মানব প্রগতি যাবে নষ্ট হয়ে। সংখ্যালঘুদের কোনো অধিকার থাকবে না। শ্রমিকদের কোনো অধিকার থাকবে না, থাকবে না কোনো নাগরিকাধিকার। সমস্ত কিছু একেবারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। একবার যদি আমরা তোষণকারীদের কথা শুনি এবং বিজয়ী হিটলারের সঙ্গে সন্ধি করি তাহলে তার বর্বর আদেশই নিয়ন্ত্রণ করবে পৃথিবী।

আমরা একটা ঝুঁকি নিতে পারি

তোষণকারীদের দিকে নজর রাখুন। তারা সব সময়েই কোনো একটা সর্বনাশের পর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

যদি আমরা সতর্ক থাকি এবং আমাদের মনোবল ঠিক রাখি তাহলে আমাদের ভয়ের কিছু নেই। মনে রাখবেন, মনোবলই ইংল্যাণ্ডকে বাঁচিয়েছে। আমরা যদি মনোবল ঠিক রাখি তাহলে জয় সুনিশ্চিত।

হিটলার অনেক ঝুঁকি নিয়েছে। তার সব চেয়ে বড় ঝুঁকি হল রাশিয়া আক্রমণ। এই গ্রীষ্মে যদি সে ককেসাসে ঢুকতে না পারে, তাহলে তার ভাগ্যে কি আছে ভগবানই জানেন। যদি তাকে আরেকটা শীত মস্কোর আশেপাশে কাটাতে হয় তাহলেও তার ভাগ্য একান্তই ভগবানের হাতে। তার ঝুঁকি অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু সে তা নিয়েছে। যদি হিটলার ঝুঁকি নিতে পারে, আমরা পারব না কেন? আমাদের দায়িত্ব দিন। বার্লিনের ওপর ফেলবার জন্য আরও বোমা দিন। আমাদের পরিবহন সমস্যাকে সাহায্য করার জন্য গ্লেন মার্টি'ন সামুদ্রিক বিমান দিন। সর্বোপরি, আমাদের এক্ষুণি একটা দ্বিতীয় রণাঙ্গন দিন।

বসন্তেই জয়

বসন্তে জয়লাভ যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। কারখানায় যাঁরা আছেন, যাঁরা সৈনিকের পোশাকে আছেন, যাঁরা বিশ্বের নাগরিক, আসুন আমরা সকলে সেই লক্ষ্যসাধনের জন্য কাজ করি ও যুদ্ধ করি। সরকারি ওয়াশিংটন এবং সরকারি লণ্ডন, আসুন এটাই আমাদের লক্ষ্য হোক—আগামী বসন্তেই জয়।

যদি এই লক্ষ্যে আমরা স্থির থাকি, এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করি, এই লক্ষ্যের জন্য বাঁচি তাহলে তা এমন একটা মনোভাব গড়ে তুলবে যা আমাদের শক্তি বাড়াবে এবং আমাদের কর্মক্ষমতা ত্বরান্বিত করবে।

আসুন, আমরা অসম্ভবের জন্যই চেষ্টা করি। মনে রাখবেন ইতিহাসে মহৎ কৃতিত্বগুলো সবই হল যা অসম্ভব মনে হয়েছিল তাকে সম্ভব করা।

জঁ-পল সাত্র

ফ্যাসিবাদে লেখকের মুক্তি নে

লেখক লিখতে বসলেন ; তার মানেই তিনি পাঠকদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন। পাঠক বই খুলে ধরলেন ; তার মানেই তিনি লেখকের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন। যেদিক থেকেই দেখুন না কেন, শিল্পকর্ম মাত্রেই মানব-সমাজের স্বাধীনতায় আস্থা ঘোষণা। লেখকের মতোই পাঠকেরাও এই স্বাধীনতা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই তার আত্মপ্রকাশ প্রত্যাশা করেন। তাই শিল্পকর্মের সংজ্ঞা দেওয়া যায়, মানবমুক্তি দাবি করে বলেই তা বিশ্বলোকের কাল্পনিক উপস্থাপনা। ফলত 'বিষাদাচ্ছন্ন সাহিত্য' বলে কিছু নেই, কেননা, যত কালো রঙেই কোনো লেখক পৃথিবীকে আঁকুন না কেন, তাঁর রঙ লাগাবার একটাই উদ্দেশ্য, যাতে স্বাধীন মানুষ সেই ছবির দিকে তাকিয়ে তাদের স্বাধীনতা অনুভব করতে পারে। উপন্যাস ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে। খারাপ উপন্যাস চাটুবাক্যে খুশি করতে চায়। ভালো উপন্যাস জন্মায় প্রচণ্ড তাগিদে, বিশ্বাসের তাড়নায়। কিন্তু সর্বোপরি যে অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো লেখক পৃথিবীকে সেইসব স্বাধীনতার দিকে তুলে ধরেন যা তিনি বাস্তবে সত্য করে তুলতে চান, তার ভিত্তি এমন এক বিশ্বাসের পৃথিবীতে যা ক্রমাগতই আরো স্বাধীনতাকে জারিত করে। উদারতার এই যে যুক্তি লেখক ছড়িয়ে দেন, তা কখনোই কোনো অন্যায়কে স্বীকার করে নেওয়ার যুক্তিতে প্রযুক্ত হতে পারে না। যে রচনা মানুষের হাতে মানুষের পরাধীনতাকে সমর্থন করে, স্বীকার করে নেয়, কিংবা নিন্দা করা থেকে বিরত থাকে, সেই রচনা পড়তে পড়তে পাঠক তাঁর স্বাধীনতা বোধ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকবেন, এও হতে পারে না। শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে পরিব্যাপ্ত ঘৃণায় পরিপূর্ণ হলেও কোনো মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গের লেখা উপন্যাস ভালো হতে পারে, কারণ সেই ঘৃণার মধ্য দিয়েও তিনি তাঁর জাতির স্বাধীনতা দাবি করছেন।

যেহেতু তিনি আমার মধ্যে উদারতার দৃষ্টিভঙ্গিই সঞ্চারিত করেছেন, যে মুহূর্তে আমি নিজে সেই শুদ্ধ স্বাধীনতার উপলব্ধি বোধ করি, আমি আর কোনো অত্যাচারী শ্রেণীর সগোত্র থাকতে পারি না। তাই সর্বপ্রকারের স্বাধীনতার কাছে আমার দাবি, শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ জাতির মুক্তির দাবি উচ্চারিত হোক। আমিও যেহেতু সেই শ্বেতাঙ্গকুলের অংশ, আমার বিরুদ্ধেও তা ধ্বনিত হোক। এক মুহূর্তের জন্যও কেউ ভাববেন না যে, ইহুদিবিদ্বেষের সমর্থনে কোনো ভালো উপন্যাস লেখা সম্ভব। যে-মুহূর্তে আমি অনুভব করি যে আমার স্বাধীনতা অন্য সমস্ত মানুষের স্বাধীনতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত, সেই মুহূর্তেই আমি জানি যে এই জনসমষ্টির একাংশের দাসত্বের সমর্থনে আমার স্বাধীনতাকে আমি কাজে লাগাতে পারি না। প্রাবন্ধিক, পুস্তিকাকার, ব্যঙ্গসাহিত্যিক, বা ঔপন্যাসিক, ব্যক্তিগত আবেগের ধারক বা সমাজব্যবস্থার প্রতিবাদী, প্রত্যেক লেখকই স্বাধীন মানুষের মুখোমুখি স্বাধীন মানুষ। তাঁর বিষয় কেবল একটাই হতে পারে—স্বাধীনতা। তাই পাঠকদের দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধবার যে-কোনো চেষ্টাই লেখকের শিল্পে চিড ধরাবে। কোনো লোহার কারিগর তাঁর ব্যক্তি-জীবনে ফ্যাসিবাদের আক্রমণের শিকার হতে পারেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর কারিগরিতেও তার প্রভাব পড়বে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু লেখক বিপর্যস্ত হবেন উভয় ক্ষেত্রেই, জীবনের চেয়েও বেশি আঘাত পাবেন তাঁর লেখার ক্ষেত্রে। আমি এমন লেখকদের দেখেছি, যাঁরা যুদ্ধের আগে মনেপ্রাণে ফ্যাসিবাদকেই চেয়েছেন, অথচ নাৎজিরা যখন তাঁদের উপর সম্মান ঢেলে দিয়েছেন, তখন তাঁরা বন্ধ্যাতায় নিমজ্জিত হয়েছেন। আমি বিশেষ করে দ্রিউলা রোশেলের কথা ভাবছি। তিনি ভুল করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিষ্ঠায় ফাঁকি ছিল না। তিনি তা প্রমাণ করেছিলেন। নাৎজিদের উদ্যোগে প্রকাশিত এক পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম কয়েক মাস তিনি তাঁর দেশবাসীকে তিরস্কার করেছেন, নিন্দা করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। কেউ তাঁর লেখার জবাব দেয় নি, কারণ জবাব দেবার স্বাধীনতা তখন কারো ছিল না। তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন; তিনি আর তাঁর পাঠকদের অনুভব করতে পারেন না। তিনি আরো জোর দিয়ে লিখতে লাগলেন। কিন্তু কেউ যে তাঁকে এতটুকু বুঝেছে তার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। ঘৃণা বা রাগেরও ও চিহ্ন নেই; কিচ্ছু নেই। তাঁর মনে হল, তিনি আর কোনো কিছু ধরতে া। তাঁর ক্ষোভ বেড়ে উঠছে। তিনি জার্মানদের কাছে তিক্ত

অনুযোগ জানালেন। তাঁর আগের প্রবন্ধগুলি চমৎকার হয়েছিল ; এবারে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। একটা সময় এল তখন বুক চাপড়ে চিৎকার করতে লাগলেন ; কোথাও কোন প্রতিধ্বনি উঠল না। সাড়া এল কেবল সেই কেনা সাংবাদিকদের দঙ্গল থেকে, যাদের তিনি ঘৃণা করেন। তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন, সেই পত্র প্রত্যাহার করলেন, আবার লিখলেন, আবার সেই মরুভূমিতে। শেষে তিনি নীরব হয়ে গেলেন, অন্যদের নীরবতা তাঁর গলা চেপে ধরল। তিনি অন্যদের দাসত্বে টেনে নামাতে চেয়েছিলেন, পাগলের মতো ভেবেছিলেন এটা তাঁর স্বাধীন চিন্তা, ভেবেছিলেন তাঁর নিজের মন বুঝি তখনও স্বাধীন। দাসত্ব এল। তাঁর ভিতরের মানুষটা তাঁকে পিঠ চাপড়াল। কিন্তু তাঁর ভিতরে যে লেখক সে সইতে পারল না। এই টানাপোড়েন যখন চলছে, তখন অন্যরা, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা বুঝেছে, নাগরিকের স্বাধীনতা না থাকলে লেখার স্বাধীনতা থাকবে কি করে? কেউ তো আর ক্রীতদাসের জন্য লেখে না। গদ্যের শিল্প সেই এক শাসনব্যবস্থার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে, ঐ এক শাসনব্যবস্থাতেই গদ্যের যা কিছু তাৎপর্য, যার নাম গণতন্ত্র। একের উপর আঘাত এলে অন্যও আহত হয়। শুধু কলমের জোরেই এদের রক্ষা করার চেষ্টা করলে চলবে না। এক-একটা সময় আসে যখন কলমকে জোর করে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়, তখন লেখককে অস্ত্র তুলে নিতে হয়। তখন যে পথেই আপনি এসে পৌঁছান না কেন, যে মতামতই আপনি ধারণ করে থাকুন না কেন, সাহিত্য আপনাকে লড়াইয়ের মাঝখানে এনে ফেলবে। লেখা বলতে একভাবে স্বাধীনতা চাওয়া। একবার শুরু করলেই, চান বা না চান, আপনি জড়িয়ে পড়েছেন।

কিসে জড়িয়ে পড়েছেন? স্বাধীনতার প্রতিরক্ষায়? কথাটা বলা সহজ। বেন্দার বুদ্ধিজীবীর মতো বিশ্বাসঘাতকতার আগে আদর্শ মূল্যবোধের রক্ষাকর্তার ভূমিকায়, না কি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামে পক্ষ বেছে নিয়ে প্রতিদিনের বাস্তব স্বাধীনতাকে রক্ষা করা? এই প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে আরেকটি প্রশ্নের সঙ্গে, সেই আপাত সহজ প্রশ্ন, যে-প্রশ্ন কেউ কখনও নিজেকে করে না : 'কার জন্য লিখি?'

বুদ্ধদেব বসু

সভ্যতা ও ফ্যাশিজম
(সাহিত্যিকের জবানবন্দি)

রাজনীতি আমার জীবনে কখনো আলোচ্য বিষয় ছিলো না। বাল্যকাল থেকে জেনেছি আমি কবি, আমি সাহিত্যিক, আমার মধ্যে যা-কিছু ভালো যা-কিছু খাঁটি তা রচনাচর্চাতেই একান্তে প্রয়োগ করেছি। এ-ব্যাপারে যেমন প্রবল আন্তরিক উৎসাহ অনুভব করেছি এবং আজ পর্যন্ত করি, তেমন আর কিছুতেই করি না এ-কথা স্বীকার করতে আমার বাধা নেই। ভালো লিখবো, আরো ভালো লিখবো—আমরা সমস্ত জীবনের মূল প্রেরণাশক্তি এই ইচ্ছার মধ্যে নিহিত। এই রসের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হ'য়ে রাজনীতির কোলাহল কখনো ভালো ক'রে আমার কানে পৌঁছয়নি। তার 'পরে আমার অন্তরের অবজ্ঞাই অনুভব করেছি। তার কারণ রাজনীতি বলতে বুঝেছি কপটাচরণ, ক্রুরতা, ধূর্ততা, ক্ষণিকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধ্রুব আদর্শের অবমাননা। শিল্পী মনের পক্ষে ও বস্তু বিশেষ লোভনীয় হতে পারে না।

রাজনীতির যে একটা বড়োরকমের সংজ্ঞা আছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পরাধীন দেশে পাওয়া সহজ নয়। আমাদের অ্যাসেমব্লি সভার বিতর্ক, আমাদের মন্ত্রীদের বক্তৃতা সবই যেন একটি অনুষ্ঠান মাত্র, তার পিছনে যথার্থ শক্তি নেই আর তাই এর অবাস্তবিকতা এক-এক সময় দুঃসহ হ'য়ে ওঠে। যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগ এত ক্ষীণ তার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের উদাসীন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তবু এই পরাধীন দেশেই কখনো কখনো এমন একটি বিরাট আন্দোলন আবর্তিত হ'য়ে ওঠে যা সমগ্র দেশবাসীকে বিদ্যুৎস্পর্শে সচকিত ক'রে তোলে, এবং জাতির জীবনে স্থায়ীভাবে তার চিহ্নও রেখে যায়। এমন একটি আন্দোলনের দিন এসেছিলো বঙ্গভঙ্গের সময়, তখন আমাদের জন্ম-কাল।

সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার কিছু নেই ; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গানে ও প্রবন্ধে যে ফসল তা ফলিয়েছিলো তা থেকে তার তীব্র উদ্দীপনাটি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতে পারি। তার পরের বড়ো আন্দোলন গান্ধিজির অসহযোগ, তখন আমি নিতান্ত বালক। সে-হুজুগে মেতেছিলাম, চটের মতো মোটা খদ্দর পরেছিলাম, যে সব যুবকেরা সাত দিন, এক মাস কি তিন মাসের জন্য জেলে গিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ও ঈর্ষায় মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে ছিলো, এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে না এমন অসম্ভব কথা যে বলে তাকে মনে মনে মূঢ় বলতে প্রস্তুত ছিলাম—কিন্তু আজ পিছনে তাকিয়ে দেখছি বালকবয়সে অন্যান্য অনেক উত্তেজনার মতোই সে হুজুগ আমার মন থেকে নিঃশেষে মরে গেছে, কোনো চিহ্ন রাখেনি। আমার গঠনে অসহযোগ আন্দোলনের কোনো হাত নেই।

তারপর মহাত্মার দ্বিতীয় আন্দোলন, তখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বছর আর সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গে সন্ত্রাসীদের রক্তাক্ত অভ্যুদয়। ছিলাম ঢাকায় ; একদিকে ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহের তুমুল বিপর্যয়, অন্যদিকে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ হত্যার উন্মত্ততা—চাটগাঁর অস্ত্রাগার লুঠ, খবরের কাগজ ও সিগারেট বন্ধ, গাঁজাখুরি গুজবে সমস্ত দেশের মাথা খারাপ হবার দশা—সব মিলিয়ে ১৯৩১-এর সেই গ্রীষ্মকাল আমার মনে নিদারুণ একটি স্মৃতি হয়ে আছে। লজ্জার বিষয় হ'লেও স্বীকার করবো দেশব্যাপী এই দু'মুখো আন্দোলনে আমি অবিচলিত ছিলেম, আমার প্রাণে কোনো সাড়া জাগেনি। আমি তখনো ব'সে ব'সে একান্তচিত্তে সাহিত্যচর্চা করেছি, হয়তো সেটা খুবই লজ্জার কথা, কিন্তু সত্য গোপন করবো না। মহাত্মাজি আমাদের সকলেরই প্রণম্য, কিন্তু তাঁর আন্দোলনে কোনো উদ্দীপনা অনুভব করেনি এমন লোক আমি ছাড়াও দেশে হয়তো আছে। এদিকে সন্ত্রাসবাদের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে যেটাকে বলা যেতে পারে রোম্যান্টিক, শিল্পী মন তা থেকে যে সহজে অব্যাহতি পায় না তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথও 'চার অধ্যায়' না লিখে পারেননি। সন্ত্রাসবাদ জিনিসটাই রোম্যান্টিক। রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি হিসাবে তা যতই ভ্রান্ত হোক, নৈতিক বিচারে যতই তুচ্ছ হোক, এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড নাটকীয়তা আছে যা সাহিত্যিকের পক্ষে লোভনীয়। সাহিত্যের উপাদান হিসেবে এর অভিনবত্ব আছে এবং এ নিয়ে যে অসংখ্য গল্প উপন্যাস বাংলা ভাষায় লেখা হয়নি তার কারণ অবশ্য বাইরের বাধা।

এখানে একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করা অবান্তর হয় না। স্বদেশি আন্দোলন কেন বাংলা সাহিত্যে সোনার ফসল ফলালো, আর গান্ধিজির আন্দোলন কেন আমাদের সাহিত্যে আঁচড়ও কাটতে পারলে না এ-প্রশ্ন অনেকের মনকেই অনেক সময় নাড়া দিয়েছে। এ-যুগের লেখকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান খুব সহজেই হ'য়ে যায়, কিন্তু প্রশ্নটি এত সহজ নয়। স্বদেশি যুগে রবীন্দ্রনাথের যে-বীণা রুদ্রস্বরে বেজেছিলো, অসহযোগের ঝোড়ো হাওয়ায় তার তারগুলি একবার কেঁপেও উঠলো না এর কি কোনো কারণ নেই? যে-হাওয়া হৃদয়ে এসে ঘা দেয় সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হবেই, লেখক সেখানে যন্ত্রী নন, যন্ত্র। প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে এই দুই আন্দোলনের জাতের তফাৎ বুঝতে হবে। স্বদেশি আন্দোলনের মূলে ছিলো বাংলাদেশের হৃদয়-শতদলের উন্মীলন। তার মধ্যে শুধু স্বায়ত্তশাসনের, শুধু অখণ্ড বঙ্গভূমির কথা ছিলো না, শিল্পে কর্মে জ্ঞানে বাণিজ্যে সমস্ত দেশে তা নবজীবন এনেছিলো। তখনকার দিনের দিশি কাপড়, দিশি জিনিস ব্যবহারে স্বদেশের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগের কথাটাই বড়ো ছিলো, অসহযোগে তা হয়েছিলো ল্যাঙ্কাশায়ারের ভাত মারবার পলিসি। রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে শেষেরটাই হয়তো কার্যকরী, এবং কার্যকরী হবার জন্যেই অসহযোগ আন্দোলনকে বড়ো বেশি না-ধর্মী হ'তে হ'য়ে ছিলো। বিলেতি কাপড় পোরো না, ইংরেজের স্কুলে যেয়ো না, তাড়ি খেয়ো না, ট্যাক্সো দিয়ো না—চারদিকে 'না' দিয়ে ঘেরা ব'লেই এই আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে তার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। এত বেশি 'না' সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল নয়। স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের একটা ইতিহাস জড়িত, কিন্তু সংস্কৃতির প্রতিও অসহযোগের সহযোগিতা ছিলো না, স্বরাজ লাভের জন্য শিক্ষা স্থগিত রাখতে হবে এও তার পলিসির অন্তর্গত ছিলো। বিলেতি পণ্য বয়কটের হিড়িকে যখন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও দেশে প্রতিকূল মনোভাব গ'ড়ে উঠতে লাগলো তখনই রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ জানাতে হ'লো 'শিক্ষার মিলন' লিখে। সংস্কৃতি জিনিসটাই আন্তর্জাতিক, তা দেশ-কালের বেড়া মানে না, সুতরাং যে-আন্দোলন কার্যোদ্ধারের খাতিরেও সংকীর্ণ অর্থে ন্যাশনাল তা সাহিত্যের উপাদান সহজে হয় না। একটা জিনিস আছে মানুষের স্বাভাবিক স্বদেশপ্রেম, সে যেমন তার নিজের গৃহটিকে নিজের মাকে ভালোবাসে, তেমনি তার দেশকেও ভালোবাসে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সেই স্বদেশপ্রেমেরই উচ্ছ্বাস। তাই তার ব্রত উদ্‌যাপনে এত গান এত ছন্দ এত কাব্য। কিন্তু

অসহযোগের বাণী স্বদেশপ্রেমের নয় সর্বাঙ্গীন বিদেশিবর্জনের, তার মধ্যে এমন একটি শক্তি ছিলো যা দেশের জনসাধারণকে স্পর্শ করেছে কিন্তু হৃদয়ের এমন একটি শুষ্কতা ছিলো যা সাহিত্যের প্রেরণা জোগাতে পারে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্বদেশি আন্দোলন আবেগপ্রবণ আর অসহযোগ কর্মপ্রধান। যা নিছক কাজ তা সাহিত্যের এলাকার বাইরে, কাজের পিছনে যে আদর্শ যে-ভাবাবেগ সঞ্চিত থাকে সেটাই সাহিত্যের উপজীব্য। অসহযোগে ভাবাবেগের প্রাবল্য ছিলো না, তার পিছনে যে-আদর্শ ছিলো তা বড়ো জোর শুষ্ক বৈরাগ্যের আদর্শ, সাহিত্যিকের পক্ষে তার কোনো আকর্ষণ নেই। এই কারণেই সাহিত্যের অনুপ্রেরণা হিসেবে তার ব্যর্থতা—বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের কথাই বলছি।

গান্ধিজির লবণ আন্দোলন যে-সময়ে সে-সময়েই শুরু হ'লো বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যমন্দা। কী অসম্ভব সস্তা সমস্ত পণ্য, অথচ দেশব্যাপী দারুণ অনটনের হাহাকার। কাগজে পড়তে লাগলুম, মার্কিন দেশে রাশি-রাশি কফি পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, স্তূপীকৃত শস্য দেয়া হচ্ছে জলে ভাসিয়ে, এদিকে ঘরে ঘরে অন্নাভাব। বাংলাদেশের বেকারবাহিনী জোয়ারের জলের মতো ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো। নিজের জীবনে উপলব্ধি করলুম কী তুচ্ছ, কী অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যিকের মূল্য, সুজলা সুফলা বাংলাদেশে তার অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হয় কি না হয়। কোনো কোনো দিকে হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেলো, মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে সেই প্রথম সচেতন হলুম। ইকনমিক্সের জটিল পথ আমার অধিগম্য নয়, কিন্তু একটা সন্দেহ মনে উঁকি দিলে যে ঐ শাস্ত্রটাই হয়ত ভুয়ো, আমাদের দেশের রাজনীতির মতোই তা বাস্তবের সম্পর্করহিত। কেননা যে শাস্ত্র শুধু বলে যে কোনো-কোনো অবস্থায় লক্ষ-লক্ষ নর-নারীকে ক্ষুধিত রেখে শস্য জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, আর কিছু না বলে একেই নিয়ম ব'লে স্বীকার ক'রে নেয়, তার প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখা সহজ নয়। যাকে বলি অর্থনীতি তা তো পদার্থবিজ্ঞানের মতো প্রাকৃতিক শাস্ত্র নয়, আলো এবং উত্তাপ যখন যে-ভাবে ব্যবহার করবার তা করবেই, তার উপর মানুষের হাত নেই, কিন্তু মানুষের কেনা-বেচা খাওয়া-পরা তো মানুষেরই হাতে, অতএব যে-শাস্ত্র পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের দুঃসহ দারিদ্র্য দুঃখকেই 'নিয়ম' ব'লে মেনে নেয়, তার সমস্ত যুক্তিতর্কের আড়ালে কোথাও না-কোথাও প্রচণ্ড ফাঁকি আছেই এ-সন্দেহ বেশি-দিন চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

বাণিজ্য-মন্দার জোয়ারে যখনি ভাটা প'ড়ে এলো তখনই দেখলুম ইতালি

আবিসিনিয়ার গলা কাটবার জন্য ছুরি শানাচ্ছে—বর্তমান মহাযুদ্ধের সেই তো আরম্ভ। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ হ'লো জার্মানিতে হিটলারের অভ্যুদয়, অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখলুম একটা সুসভ্য উন্নত মহৎ জাতি নিজেদের যুগ-যুগ-সঞ্চিত অমূল্য উত্তরাধিকার পায়ে ঠেলে ফেলে বর্বরতার কাঁটাওলা বর্ম পরে বীভৎস মূর্তিতে দাঁতে দাঁত ঘসছে। জর্মানির যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানব, যাঁদের নামে জগতের কাছে জর্মানির পরিচয়, নাৎজিশাসন সদ্য-ঘুম-ভাঙা কুম্ভকর্ণের মতো তাঁদেরই চিবিয়ে খেতে উদ্যত—এ দৃশ্য যখন দেখলুম; যখন দেখলুম আধুনিক জর্মানির দুই মহা-মানব আইনস্টাইন আর ফ্রয়েত—তাঁদের মধ্যে একজন হ'লেন চোর্যের অপবাদ নিয়ে বিতাড়িত, আর একজন বার্ধক্যের শেষ অবস্থায় পাহারাওয়ালা ঘেরাও হ'য়ে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন, যখন দেখলুম জর্মানির সব বড়ো-বড়ো লেখক শিল্পী সাঙ্গীতিক নির্বাসনে দুর্দশাগ্রস্ত কিংবা মাতৃভূমিতে বন্দী; যখন কানে এলো ইহুদিদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী, মেয়েদের স্বাধিকারহরণের ইতিহাস, সমস্ত জাতির চলা-ফেরায় আচারে-ব্যবহারে চিন্তায়-রচনায় সর্বপ্রকার স্বাধীনতা যখন ইস্পাতের হাতে লুণ্ঠিত হ'লো তখন বুঝলুম পৃথিবীতে খুব বড়োরকমের একটা গোলমাল লেগেছে। আর তার প্রমাণের জন্যও বেশিদিন অপেক্ষা করতে হ'লো না, আফ্রিকার শেষ কালো ছায়াটুকু শোষিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই লাগলো স্পেনের গৃহ-যুদ্ধ। এই স্পেনের যুদ্ধে যেটুকু আমার চোখ খোলবার বাকি ছিলো সেটুকুও খুলে গেলো, বোঝা গেলো, পৃথিবীতে লোভ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে; বিশেষ একটি শ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখবার জন্য শুধু যে দুর্বল বিদেশি জাতির উপরেই অত্যাচার চলে নয়, স্বজাতিকেও রক্তস্রোতে ভাসানো হয়; শুধু বিদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিজেদের 'উন্নতি সাধন করা হয় তা নয়, নিজের দেশের মধ্যে যাঁরা মুক্তির আদর্শ মানেন, যাঁরা সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁদের বধ করতে লুব্ধতার ছুরি সর্বদাই উদ্যত।

অন্যদিকে আমাদের চোখের সামনে ছিলো সাম্যবাদী রাশিয়া—রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি পড়েছিলুম। জারের আমলে যে-দেশ ছিলো দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভয়াবহ অন্ধকারে মগ্ন, মাত্র কুড়ি বছরের সাধনার ফলে সে-দেশের কী আশ্চর্য নবজন্ম। ফরাসি বিপ্লবের পরে মানুষের মুক্তির ইতিহাসে এত বড়ো ঘটনা আর ঘটেনি। ইংরিজি অনুবাদে রুশ সাহিত্য পড়ে ছেলেবেলা থেকেই ঐ দেশের উপর আকর্ষণ জন্মেছিলো, রুশ গল্পে উপন্যাসে বঞ্চিত উৎপীড়িত বুভুক্ষু বিশ্বমানবের হৃৎস্পন্দন যেমন শুনতে পেয়েছিলুম তেমন আর কোথাও শুনতে

পাইনি। সেই দেশ সকল মানুষকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে; অন্নে বস্ত্রে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সকলের মনুষ্যোচিত অধিকার স্বীকার করেছে, এই খবর একটি গভীর অনুপ্রেরণা হয়ে আমার হৃদয়ে বাজলো। মুক্তির বাণী, সাম্যের বাণী —এ তো কবিরই বাণী, যুগে-যুগে কত কবির মুখে এই বাণী জ্বলন্ত সুরে বেজেছে, এর কোনো বিশেষ স্থান কি কাল নেই, এ সমগ্র বিশ্বমানবের চিরকালের সংগীত।

এই বাণী শেলির, এই বাণী রবীন্দ্রনাথের, এই বাণী দেশবিদেশের সকল মহৎ কবির; মানুষকে মুক্তি দাও, মানুষকে ভালোবাসো, কঠোরের বদলে সুন্দরের পূজা করো, পাষাণহৃদয় উৎপাটিত ক'রে রক্তমাংসের হৃদয়কে স্বীকার করো। তাই যখন নবীন রাশিয়ার মূল মন্ত্র আমার কানে এলো—'যে কাজ করবে না, সে খাবেও না'—তখন এই বাণীতে যেন বিরাট মহাকাব্যের কল্লোল শুনতে পেলুম। এত বড়ো কথা কে আর কবে বলেছে! পৃথিবীতে অনেক সুন্দর সভ্যতা জেগেছে এবং ডুবেছে, কিন্তু চাঁদের একটি দিকই যেমন পৃথিবী থেকে দেখা যায় তেমনি সকল সভ্যতার একটি দিকই আমরা দেখেছি এবং সে-দিকটি চাঁদের মতোই মনোহর। চাঁদের উল্টো পিঠ আমরা কখনো দেখবো না, হয়তো তা ঘোর কালো, হয়তো দুঃস্বপ্নের মতো ভয়ানক। কিন্তু সভ্যতার উল্টো পিঠটি একটু নাড়া দিলেই বেরিয়ে পড়ে—সেই একতলার ঘরে বোবা অন্ধকারে নরকঙ্কালের সারি, সেখানে দাসপ্রথা, দারিদ্র্য, অত্যাচার, রক্তপাত—তা অতি ভয়ানক। কোটি-কোটি লোকের জীবনের মূল্যে কয়েকটি মানুষ সুরভিত অবসরে ব'সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ক'রে সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবে এটাই ছিল নিয়ম। ভিতরে-ভিতরে প্রতিবাদ জমেছে, এ-নিয়ম বিশ শতকে এসে টলেছে কিন্তু একেবারে ভাঙেনি। সভ্যতার এই অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব যখন সব দেশেই মনীষীর ও শ্রমিকের মনে-মনে দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে, তখন রাশিয়া বজ্র-স্বরে ঘোষণা করলে 'যে কাজ করবে না সে খাবেও না।' শুধু যে মুখে বললে তা নয়, কাজেও খাটালে। সভ্যতার একতলার ঘরে আলো জ্বললো – শুধু তা-ই নয়, নিচের তলা ব'লে কিছু আর রইলোই না। সভ্যতার ছন্দোহারা বেঢপ বেসামাল চেহারা দূর হ'লো, তা সর্বাঙ্গীন শ্রীতে উঠলো মুঞ্জরিত হ'য়ে। আমি বলি না রাশিয়াতে সেই নিখুঁত ছন্দের সুষমা আজই গ'ড়ে উঠেছে, হয়তো তা হয়নি, না হ'য়ে থাকলে দোষও দেবো না কারণ বাধা বিস্তর, কিন্তু এ-পর্যন্ত রাশিয়া যেটুকু করেছে সেটুকুই আশ্চর্য এবং সব চেয়ে বড় কথা এই যে মানবজীবনে ছন্দের সেই

সুষমাই রাশিয়ার লক্ষ্য, তারই জন্যে সেই বিরাট বিচিত্র দেশের অক্লান্ত সাধনা। রাশিয়া নবীন একটি সভ্যতার জন্মভূমি।

একদিকে জর্মানি-ইতালিতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও সভ্যতার বিনাশ; অন্যদিকে রাশিয়াতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দান ও সভ্যতার পূর্ণবিকাশের সাধন। এই জুড়ি দৃশ্য যখন দেখলুম তখন রাজনীতির বড়োরকমের একটা অর্থ মনে ধরা দিলো। তখন বুঝলুম রাজনীতি শুধু অ্যাসেমব্লি হলের বক্তৃতা নয়, মাছ ও পাঁউরুটির বিতরণ নিয়ে নোংরা কলহ নয়, আমাদের প্রত্যেকের জীবন যাপন, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ রাজনীতি উপর নির্ভরশীল, এবং সেইজন্য তার আলোচনায় আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। শান্তির সময়, সুখের সময় নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব, হয়তো সে-অবস্থাই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু চারিদিকে যখন অশান্তির আগুন লেলিহান হয়ে জ্বলে ওঠে তখন কবি বলো শিল্পী বলো ভাবুক বলো কারো পক্ষেই মনের মধুর প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা আর সম্ভব হয় না, যার প্রাণ আছে তার প্রাণেই ঘা লাগে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও আমরা দেখেছি তাঁর ধ্যানী আত্মস্থতাকে বহির্জগতের পীড়ন বার-বার ভেঙে ভেঙে দিয়েছে, তীব্রস্বরে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন হত্যাকারী অত্যাচারীকে, জাপান যখন চীনকে গ্রাস করতে উদ্যত হ'লো, জাপানের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র বিক্ষোভের প্রমাণ রয়েছে অনেক কবিতায় আর নোগুচিকে লেখা চিরস্মরণীয় পত্রাবলীতে। লোভ জিনিসটা অতি কুৎসিৎ এবং কবি কুৎসিতকে সইতে পারেন না। তাই আজ পৃথিবী ভ'রে লোভ যখন তার বীভৎসতম মূর্তিতে প্রকট তখন আমরা কবিরা, শিল্পীরা স্বভাবতই, নিজের প্রকৃতির অদম্য টানেই, ঐ বীভৎসতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো—এর মধ্যে রাজনীতির কোনো গূঢ়তত্ত্ব নেই, আমাদের মনুষ্যত্বের, কবিচরিত্রের এটা ন্যূনতম দাবি।

বর্বরতার বিরুদ্ধাচরণ মনুষ্যধর্ম মাত্র, কিন্তু লেখকদের পক্ষে এর বিশেষ একটু তাৎপর্য আছে। পশুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতেই হবে, নয়তো আমাদের অস্তিত্বই যে থাকে না। জর্মানি থেকে মনীষীরা যখন একে-একে বিতাড়িত হতে লাগলেন, জাপানের বোমাবর্ষণে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন বিধ্বস্ত হ'তে লাগলো, তখন ঘৃণায় শিহরিত হ'য়ে এ-কথাই ভাবলুম যে দু'দিন পরে এইরকম পৈশাচিক শক্তি যদি ভারতবর্ষের দিকে বিষাক্ত ফণা উদ্যত করে তা'হলে আমরা যারা কবি শিল্পী বিদ্যানুরাগী আমরা আমাদের স্বাধিকার থেকে সকলের আগে বঞ্চিত হবো, এই দুর্গত পরাধীন দেশেও চিন্তার ও আত্ম-প্রকাশের যেটুকু

স্বাধীনতা আমাদের আছে সেটুকুও আর থাকবে না, শুধু যে আমাদের জীবিকা কিংবা জীবন যাবে তা নয়, যা কিছু আমাদের কাছে মূল্যবান, যে-সব জিনিস আছে ব'লে আমরা বাঁচতে চাই এবং যা না-থাকলে আমাদের জীবনের কোনো মানে থাকে না সব একেবারে ছারখার হ'য়ে যাবে। স্পানিশ যুদ্ধে, চীন-জাপানের যুদ্ধে এটুকু আমাদের শিক্ষা, বৃহত্তর রাজনীতিতে সেই প্রথম দীক্ষা।

তারপর সেদিন যুদ্ধ বাধলো। বর্বরতার শেষ সূক্ষ্ম মুখোস খ'সে পড়লো, ভণ্ডামির ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত কোনোখানে আর রইলো না। জলে স্থলে আকাশে হত্যা আজ স্বেচ্ছাচারী, শুধু যোদ্ধহত্যা নয়, নারীহত্যা, শিশুহত্যা, জনতার সামগ্রিক বিনাশ, তাছাড়া সত্যের, সুন্দরের, সমস্ত আদর্শের হত্যা। এই হত্যার ঢেউ আজ ভারতের উপকূলে এসে পৌঁচেছে। আজ এ-কথা অতি নিষ্ঠুরভাবেই উপলব্ধি করতে হচ্ছে যে জগতের রাজনীতির ফেনিল আবর্তের সঙ্গে অতি তুচ্ছ এই যে আমি, আমার অত্যন্ত তুচ্ছ সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জড়িত। আমি তো অতি ভালোমানুষ, সাতেও নেই পাঁচেও নেই, নিরিবিলি ঘরের কোণে ব'সে পড়াশুনো করতে চাই আর মাঝে-মাঝে এক আধটা কবিতা লিখতে চাই, কিন্তু আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে কে? যে-কোনো অতর্কিত মুহূর্তে আমার বাসস্থান, প্রিয়জন, আমার সমস্ত আশা ভালোবাসা সুদ্ধু আমি একেবারে লোপাট হ'য়ে যেতে পারি। কিংবা কোনো আসুরিক শক্তি হয়তো কেড়ে নেবে আমার কলম, থামিয়ে দেবে আমার সমস্ত কর্মোদ্যম, পাথর চাপা দেবে আত্ম-প্রকাশের আবেগে—তাহ'লেই বা আমার অস্তিত্ব থাকে কোথায়? অতএব দেখা যাচ্ছে এই যে আমার ঘরে ব'সে আপন কাজ করবার অধিকার, যার উপর আলো-হাওয়ার মতোই মানুষের জন্মগত দাবি, এও বিশ্বের রাজনীতির জটিল গ্রন্থিতে বাঁধা। আমার পক্ষে—এবং অনেকের পক্ষেই—এ উপলব্ধি অতি মর্মান্তিক। কখনো ভাবিনি মানুষের বাঁচবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি এ-অধিকার থেকে যুগে-যুগে তারাই বঞ্চিত হয়েছে যারা বীজ বোনে যারা তাঁত চালায় যারা ধান কাটে, যারা তাদের পেশীবহুল দৃঢ় স্কন্ধে সমস্ত জীবনের ভার বহন ক'রে আসছে। আজকের দিনে এমন এক রাষ্ট্রশক্তি প্রবল হ'য়ে উঠেছে যারা এই ব্যবস্থাকেই স্থায়ী করবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় লিপ্ত, এবং সকল মানুষকেই লৌহশাসনের যন্ত্রে পিষ্ট না করলে যাদের চলে না। তাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি এমনই যে সকলের আগে কবির মুখ বন্ধ করা তাদের দরকার, কেননা কবি সত্য ও সুন্দরের উপাসক।

এরই নাম ফ্যাশিজম। অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে ফ্যাশিজম্-এর ব্যাখ্যার মধ্যে আমি যাবো না, আমি দেখতে পাচ্ছি এটা সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত শত্রু, সভ্যতার ইতিহাসে এ একটা তীব্র বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। সেইজন্যে আমরা যারা সংস্কৃতিতে, বিশ্বমানবের ঐতিহাসিক প্রগতিতে আস্থাবান, আমাদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে। এটা কোনো চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণের কথা নয়, কোনো পরাক্রান্ত মূঢ় যদি রবীন্দ্রনাথকে দুয়ো দেয় তাকে সহ্য করা যেমন আমাদের পক্ষে অসম্ভব এও তেমনি। রবীন্দ্রনাথ পূজ্য নন, এ কথা যেমন ম'রে গেলেও বলতে পারবো না, তেমনি অপমানিত, লাঞ্ছিত কিংবা নির্বাসিত হ'লেও এ-কথা মানতে পারবো না যে দেশের তথাকথিত 'উন্নতির' জন্য সভ্যতার সর্বনাশ যদি দরকার হয় সর্বনাশই করতে হবে। আমাদের কাছে আগে সভ্যতা, আগে মনুষ্যত্ব, তারপর অন্য সব কিছু।

তাছাড়া ভেবে দেখতে হবে যে ফ্যাশিজ্‌ম্ শুধু একটা সামরিক নীতি কিংবা রাজনৈতিক পদ্ধতি নয়, ফ্যাশিজ্‌ম্ একটা মনোভাব। মনোভাব মাত্রই অত্যন্ত ব্যাপক, জীবনের সমস্ত ছোটো খাটো ব্যাপারে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এটা আজকের দিনে অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে উপলব্ধি করেছি যে কোনো ব্যক্তির যদি রবীন্দ্রনাথের গান কি যামিনী রায়ের ছবি ভালো না লাগে, সেই রুচির কিংবা রুচির অভাবের সঙ্গে জড়িত আছে তার রাজনৈতিক মতামত। হয়তো সে-মতামত সম্বন্ধে সে নিজে খুব বেশি সচেতন নয়, কিন্তু খোঁচা দিলেই মনের কথা বেরিয়ে পড়ে, এবং যে সব কথা সে অবলীলাক্রমে ব'লে যায় তার ভয়াবহ তাৎপর্য সে নিজেও বোঝে না। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, একদিকে ভৃত্য ও অন্যদিকে বড়ো সাহেবের প্রতি ব্যবহারে, বিদেশি ও বিধর্মী সম্বন্ধে ভঙ্গিতে তার প্রতিদিনের তুচ্ছতম আচরণে ও আলোচনায় তার মূল মনোভাব নানাভাবে প্রকট হ'য়ে ওঠে। আমাদের দেশেও আজকের দিনে এমন লোকের অভাব নেই যারা যা-কিছু প্রগতিশীল তারই বিরোধী, যা-কিছু নতুন সে সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, যারা স্ত্রীজাতিকে সন্তানবাহী ক্রীতদাসী বানিয়ে রাখবার পক্ষপাতী, নিজের স্ত্রীকে প্রহার করতে ও পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে যারা নিয়ত উৎসুক, এদিকে সামাজিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীন মেলামেশার কথা শুনলে যারা মূর্ছা যায়, যারা যে-কোনোরকম বিদেশি কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বী সম্বন্ধে বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে, অথচ পরস্পরের কুৎসারটনায় যাদের জিহ্বা চির চঞ্চল, যারা নিছক গুণ্ডামির একান্ত ভক্ত—অবশ্য সে-গুণ্ডামির যতক্ষণ জিৎ হ'তে থাকে।

গুণ্ডামিকে তারা পৌরুষ মনে করে, হৃদয়হীন কঠোরতাকে শক্তি ব'লে বাহবা দেয়। তাই যখনই যে-জাত পশুশক্তিতে দুর্দান্ত হ'য়ে ওঠে তারা অন্য কিছু বিচার না করে তারই ভজনা করে। এ-সব লোক বাইরে থেকে দেখতে দিব্যি লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক, কিন্তু যে কোনো বিষয়ে দু'একটা কথা বললেই বোঝা যায় তাদের মনোভাবটা কী। চোখ বুজে ব'লে দেয়া যায় যে এটাই ফ্যাশিস্ত মনোবৃত্তি—হয়তো সচেতন নয়, অচেতন—কিন্তু শেষ হিসেব মেলাবার দিনে এদের সমস্ত অচেতন ইচ্ছা বাঁধন-ছেড়া ক্ষিপ্ত কুকুরের মত ছুটে বেরিয়ে এসে তাদেরই কামড়াতে যাবে মুক্তির সাধনায় জীবন যাদের উৎসর্গিত। দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে এই লড়াইতে আপাতত ফ্যাশিস্তদের জিৎতে দেখে আমাদের দেশের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি প্রবল উৎসাহে ফেঁপে উঠছে; এতদিনে সমাজজীবনে আমরা যেটুকু অগ্রসর হয়েছি এক দলের মনের ইচ্ছা তার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত ক'রে দিয়ে সেই যুগে ফিরে যায় যখন মনের সুখে বৌ ঠ্যাঙানো যেতো এবং ছোটোলোক'দের পায়ের তলায় পিষে রাখলে তারা সেই শ্রীচরণযুগলকে জড়িয়ে ধ'রে ভক্তিভরে সেখানে মাথা ঠেকাতো। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকের মনেই এই প্রতিক্রিয়া আজ বন্দী সর্পের মতো ফোঁসফোঁস করছে, একবার ছাড়া পেলে তার বিষ সমস্ত জাতির দেহে সঞ্চারিত হবে এমন আশঙ্কা আছে ব'লেই আজ আমরা যারা প্রগতিতে বিশ্বাসী তাদের একত্র হ'য়ে দাঁড়াতে হবে, জোর ক'রে বলতে হবে যে এই কুৎসিত মনোবৃত্তির আমরা বিরোধী, এর বিরুদ্ধে যা-কিছু করবার সব করবো, তার জন্য যত নির্যাতন সইবার সব সইবো। এটা বীরত্বের কথা নয়, পেশাদার যোদ্ধার ফাঁকা বুলি নয়, এটা আমাদের প্রাণের কথা—কারণ সভ্যতার সুষমা যদি ধ্বংস হ'য়ে যায় তাহ'লে পেটে খেতে পেলেও জীবনের কোনো মানে থাকে না এই আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস।

আমি জানি আমার এ-সব কথা অনেকের কাছে সেন্টিমেন্টাল লাগবে। অনেকে বলবেন, প্রগতি বলে কিছু নেই, পরিবর্তনের নিত্যচক্রে পৃথিবীর ইতিহাস ঘুরছে। সভ্যতার গতিপথ চক্রাকার এটা ফ্যাশিস্ত দর্শনেরই কথা, কিন্তু সে-কথা ছেড়েই দিলুম। বাস্তবিক পক্ষে সভ্যতার বিবর্তনের ছবিটা ঋজু না গোল না সর্পিল আকারের, সে আলোচনার এখানে সময় নেই। আমি বলতে চাই যে আমি প্রগতিতে বিশ্বাস করি শুদ্ধু এই কারণে যে তা না-করলে জীবন একেবারে নিরর্থক হ'য়ে যায়। সভ্যতাকে মাঝে মাঝে বর্বরতা এসে গ্রাস করবেই এ-কথা যদি নিয়ম ব'লে মেনে নিতে হয় তাহ'লে কোনো কর্মে আমার

আর উৎসাহ থাকতে পারে না, বেঁচে থাকবার মূল তাগিদটাই যায় মরে। তাছাড়া ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে সভ্যতার আলো কখনোই জগৎ থেকে একেবারে নিবে যায়নি—কখনো চীনে কখনো রোমে, কখনো ভারতে কখনো আরবে কখনো বা ইওরোপে সে আলো উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে, তার রশ্মি বিকীর্ণ হয়েছে সমস্ত জগতে। ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, সেদিন থেকে পৃথিবীর এক প্রান্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'লেও আর একদিকে আলো জ্বলেছে, এবং পর পর এতগুলি সভ্যতার ওঠা-পড়ার মধ্যে কোনো মিলনগ্রন্থি কি নেই? আছে বইকি, সমস্ত ইতিহাস এক সূত্রে বাঁধা। প্রাচীন গ্রীস রোম মিশর ভারত চীনের উত্তরাধিকার জগৎ থেকে তো হারিয়ে যায়নি, তারা যা ক'রে গেছে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কাজ আরম্ভ হয়েছে তারপর থেকে। এমনি ক'রে-করেই মানবজাতির ইতিহাস গাঁথা হ'য়ে চলেছে, বংশের পর বংশ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। একেই তো বলি প্রগতি। অতীত এসে বর্তমানে মিলিত হয়, বর্তমান ধাবিত হয় ভবিষ্যতের দিকে। এর মধ্যে কত পরিবর্তন,কত বিপ্লব,কত ভাঙা-গড়া। কিন্তু সব মিলিয়ে এর অন্তরালে একটি ঐক্যের সুর বাজছে, তারই নাম প্রগতি। আরো মুক্তি, আরো সৌন্দর্য, আরো সভ্যতা, পৃথিবীর সমস্ত জাতিতে বর্ণে শ্রেণীতে সভ্যতার উৎসাহ সঞ্চালিত করে দেয়া—সমস্ত ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন বাণী তো এই। আজকের দিনে নতুন আলো জ্বলেছে রাশিয়াতে,পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় ভাঙন ধরেছে তাতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তাই বলেই কি তাকে আজ নিন্দে করতে বসবো? তাই ব'লেই কি বলতে শুরু করবো ঢের ভালো ছিলো আমাদের জাতিভেদ, সতীদাহ, ঢের ভালো জাপানের শিন্তোবাদ, যেহেতু এ সভ্যতায় আর কাজ চলছে না সেইজন্যেই ব'লে বসবো যে বর্বরতাই ভালো? কক্ষনো না। এই পাশ্চত্ত্য সভ্যতা জগৎকে যা দিয়েছে তার মূল্য অসীম, কিন্তু তার দিন ফুরিয়ে এসেছে, সব সভ্যতারই একদিন মরণদশা ঘটে। তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, তার মধ্যে যেটা মূল শক্তি, অর্থাৎ বিজ্ঞানের মৌলিক ব্যবহার সেটা থাকবেই, কিন্তু এ-সভ্যতার যেটা দুর্মানুষিক দিক সেটা কালের কবলে ঝরে পড়বে। এ-সভ্যতা রূপান্তরিত হ'য়ে যে নতুন মূর্তি নেবে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে রাশিয়াতে। আমরা তাকিয়ে আছি সে-যুগের দিকে যখন সমস্ত পৃথিবী এক হবে, শান্তি হবে স্থায়ী, জগতে শোষিত জাতি কিংবা শোষিত শ্রেণী আর থাকবে না, বিজ্ঞানের অলৌকিক কীর্তির ফলভোগ করবে সকল মানুষ, অন্নবস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য স্বাধীনতা থেকে কেউ বঞ্চিত

হবে না, শিল্পকলা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ হবে সর্বতোভাবে অপ্রতিহত। অনেকেই বলবেন এটা কবিকল্পনা মাত্র। এ-কখনো সম্ভব নয়, হিউম্যান নেচারই এ-রকম নয় যে···কিন্তু এই কাল্পনিক হিউম্যান নেচারের দোহাই দিয়ে অনেক অসত্যই এতদিন আমাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে। আর আমরা ঠকবো না। মানুষ স্বভাবতই হীন, লোভী, ঈর্ষাকাতর কি দাম্ভিক নয়; অবস্থার বিপাকেই সে ওরকম হয়, এবং অবস্থা বদ্‌লালে তার স্বভাবও যে বদ্‌লায় তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তাছাড়া, যাঁরা বলেন যে পৃথিবী কখনো স্বর্গ হবে না তাঁদের জিজ্ঞেস করি যে এইভাবে কি চলবে চিরকাল? পৃথিবী এত ঐশ্বর্য, বিজ্ঞানের এত শক্তি নিয়ে এই অভাব এই হাহাকার কুড়ি বছর পর পর খণ্ডপ্রলয়, একেই কি চুপ ক'রে মেনে নিতে হবে? একবার চেষ্টা ক'রে দেখাই যাক্ না, হয় কিনা। যে-কারণে পৃথিবীতে আজ ঐশ্বর্যের অন্ত নেই, সেই কারণেই যুদ্ধ আজকাল এমন ঘোর দানবিক যে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের স্পৃহা কিংবা প্রয়োজন যদি দূর করা না যায়, পৃথিবীর সব দেশ সব জাতি এক প্রীতির বন্ধনে যদি যুক্ত না হয় তা'হলে দুশো বছরের মধ্যে মনুষ্যজাতিই হয়তো আর থাকবে না। কেউ-কেউ এমনও আছেন যাঁরা বলবেন না-যদি থাকে না-ই থাকবে, মনুষ্যজাতিকে থাকতেই হবে তারই বা কী মানে আছে? আমি স্বীকার করবো ও কথা বলবার মতো প্রকাণ্ড দার্শনিক এখনো আমি হ'তে পারিনি, জীবনের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা, মানুষের প্রতি আমার স্বাভাবিক মমত্ববোধ, আমি কোনোরকমে সন্ধ্যা-আহ্নিক ক'রে ব্যাঙ্কের টাকা গুছিয়ে যে কোনো অবস্থায় নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা ক'রে দিন গুজরান করতে চাই না, আমি নিবিড়ভাবে বাঁচতে চাই, আমি সেই মহৎ স্বার্থ রক্ষা করতে ইচ্ছুক যা আমার একলার নয়, সকলেরই স্বার্থ। আমি আমার সেই ভালো চাই যাতে অন্য সকলেরই ভালো। আমি মনুষ্যজাতিকে শ্রদ্ধা করি, তার সাধনার মহিমায় আমি মুগ্ধ; তাই আমি শান্তি চাই, প্রীতি চাই, মুক্তি চাই, যাতে এই মানুষ তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি অর্জন করতে পারে। যা চাচ্ছি তা শিগগির হয়তো হবে না, সহজেও হবে না, কিন্তু সেইজন্যই তো আরো উদ্যোগ আরো নিষ্ঠা আরো সাহস দরকার, আগে থেকেই হার মানলে চলবে না, ভীরু হ'লে চলবে না, নৈরাশ্যের আবছায়ায় নিজের কাপুরুষতা লুকিয়ে রাখলে সব চেয়ে বড়ো ক্ষতি আমার নিজেরই এ-কথা আমরা প্রত্যেকেই যেন প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করি।

একটা ছোটো ঘটনার উল্লেখ করে এ-প্রবন্ধের শেষ করি। একবার একটি

কলেজের ছাত্র আমাকে বলছিলো, 'হিটলারের আমলে জর্মানির কী আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে তা তো দেখছেন। আমাদের দেশে এইরকমই দরকার।' আমি তাকে বললুম, 'ওরা আইনস্টাইনকে তাড়িয়েছে—' সে বাধা দিয়ে বললে, 'জ্যুরা ভয়ানক খারাপ লোক, তাদের তাড়ানোই উচিত।' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা ধরো আমাদের স্বদেশি হিটলার যদি রবীন্দ্রনাথকে তাড়াতে চান তুমি তাতে রাজী আছো?' সে একটু চুপ করে থেকে বললে, 'দেশের উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথকে যদি তাড়াতে হয়ই তবে তাড়াতেই হবে।' আমি বললুম, 'যে উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথকে তাড়াতে হয় সে উন্নতি আমি চাই না কারণ মনে-মনে আমি নিশ্চয়ই জানি যে সেটা উন্নতি নয়, ঘোর অবনতি।' এই কথাই আমার শেষ কথা।

রজনী পাম দত্ত

ফ্যাসিবাদ এবং সমাজবিপ্লব

বর্তমান সমাজের সামনে মাত্র দুটো রাস্তা খোলা আছে। একটা হল—উৎপাদনশক্তির শ্বাসরোধ করতে চেষ্টা করা, উন্নতিকে আটকানো, বৈষয়িক ও মানবিক শক্তিকে ধ্বংস করা, আন্তর্জাতিক পণ্য বিনিময়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, বিজ্ঞান ও আবিষ্ক্রিয়াকে ব্যাহত করা, মতাদর্শের বিকাশকে চূর্ণ করা এবং সীমিত সংগঠনে কেন্দ্রীভূত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রগতিবিরোধী আপসে-কাজিয়া-রত, পুরোহিত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্তরে—অর্থাৎ সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায় বর্তমান শ্রেণী-আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য—সমাজকে যেন আরো জোর করে আদিম স্তরে ঠেলে দেওয়া। এই হচ্ছে ফ্যাসিবাদের পথ। যেখানে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতাসীন--তারা সেই পথের দিকেই অধিকতর পরিমাণে বাঁক নিচ্ছে। এ হল মানবজাতির ধ্বংসের পথ।

অন্য বিকল্পটি হচ্ছে—নূতন উৎপাদন-শক্তিকে সামাজিক শক্তি হিসাবে সংগঠিত করা; বর্তমানের সমগ্র সমাজের সাধারণ সম্পদ হিসাবে, সমাজের বৈষয়িক ভিত্তিকে দ্রুততার সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে উন্নত করা। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ব্যাধি এবং শ্রেণীগত ও জাতিগত বৈষম্য নির্মূল; বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অপরিমেয় অগ্রগতি ঘটানো এবং বিশ্ব-কমিউনিস্ট সমাজকে সংগঠিত করা—যেখানে সমস্ত মানুষ এই প্রথম পরিপূর্ণতায় পৌছাতে সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যতে মানবজাতির যৌথবিকাশ সাধনে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করবে। এই পথ হচ্ছে কমিউনিজমের—উৎপাদন-শক্তির জীবন্ত প্রতিনিধি যে-শ্রমিকশ্রেণী, পুঁজিবাদী শ্রেণী-আধিপত্যের উপর তাদের বিজয়ের দ্বারাই একমাত্র বাস্তবে এই পথ তারা অর্জন করতে পারবে এবং সেদিকেই তারা অধিকতর পরিমাণে মোড় নিচ্ছে। এই পথই আধুনিক বিজ্ঞান ও উৎপাদনশীল বিকাশকে সম্ভব ও অপরিহার্য করে

তুলবে এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতির অকল্পনীয় সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে।

এর মধ্যে কোন বিষয়টি জয়যুক্ত হবে? আজকের সমাজ এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

বিপ্লবী মার্কসবাদ দৃঢ়নিশ্চিত যে উৎপাদনশক্তি কমিউনিজমের পক্ষে, অতএব কমিউনিজমই বিজয়ী হবে। কমিউনিজমের বিজয় শ্রমিকশ্রেণীর জয়ের মধ্যে প্রকাশিত হবে—বর্তমান দ্বন্দ্বসংঘাতের একমাত্র সম্ভাব্য চরম পরিণামই হচ্ছে এই। অপর বিকল্পের রাত্রির দুঃস্বপ্ন আর "অন্ধকার যুগ"-এর গা শিরশির করা যে-ছায়া সাময়িক কালের চিন্তানায়কদের কল্পনায় ইতিমধ্যেই উঁকি দিতে শুরু করেছে, তা পরাভূত হবেই, আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের সংগঠিত শক্তি তাকে পরাভূত করবেই।

কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবিতা মনুষ্যনিরপেক্ষ ব্যাপার নয়। বরং বলা যায় প্রধানত মানুষের দ্বারাই তা অর্জন করা সম্ভব। এই মুহূর্ত থেকেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। কারণ এর উপরই মানবসমাজের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সময় সংক্ষিপ্ততর হয়ে আসছে—কথায় বলে, কাচ ভেদ করে বালুকণা ছুটছে, সময় শেষ হতে আর দেরি নেই।

অনেকের কাছে, ফ্যাসিবাদের বিকল্প বা কমিউনিজম কোনো অভিনন্দনযোগ্য বিকল্প নয় এবং তারা এটাকে অস্বীকার করতেই বেশি পছন্দ করে। উভয়কে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। এমন কি, তাদের মতে এরা হচ্ছে সমান্তরাল চরম মতবাদ। তারা তৃতীয় বিকল্পের স্বপ্ন দেখে যা ও দুটোর কোনোটার মতোই হবে না, যা শ্রেণীসংগ্রাম ব্যতিরেকেই ধনতান্ত্রিক 'গণতন্ত্র', পরিকল্পিত ধনতন্ত্র ইত্যাদি কাঠামোর পথ বেয়েই শান্তিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করবে।

তৃতীয় বিকল্পের এই স্বপ্ন বস্তুতপক্ষে ভ্রান্ত। একদিকে, এ হচ্ছে অতীত যুগের অর্থাৎ উদারনৈতিক পুঁজিবাদী স্তরের ধ্যানধারণার প্রতিধ্বনি যা ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। তাকে আর পুনর্জীবিত করা যাবে না। কারণ যে পরিস্থিতিতে এর উদ্ভব হয়েছিল তা এখন শেষ হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে পুঁজিবাদের চরম অবক্ষয় এবং শ্রেণীসংগ্রামের চরম তীব্রতার সময়। এমন কি, গণতান্ত্রিক কাঠামোর যে ক্যারিকেচার পশ্চিম ইয়োরোপে

ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোতে এখনো পর্যন্ত বিপজ্জনকভাবে টিকে আছে, অধিকতর খোলাখুলিভাবে একনায়কতান্ত্রিক এবং নিপীড়নমূলক পদ্ধতির আশ্রয়ে ক্রমাগত তারই সংযোজন ও পরিবর্তন চলেছে (যথা, প্রশাসনের হাতে ক্ষমতাবৃদ্ধি, পার্লামেন্টের ক্ষমতার সংকোচন, জরুরী ক্ষমতার বৃদ্ধি, পুলিশী দমন ও সন্ত্রাসের প্রসার, বাক্‌স্বাধীনতা ও সভাসমিতি করার স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ, ধর্মঘটের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করা, গণবিক্ষোভ ও ধর্মঘটকে সন্ত্রাসের পথে দমন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রোড়পতি কাগজের সামাজিকভাবে চটকদার জনপ্রিয়তার ধোঁকাবাজি, সন্ত্রাসের পথে নির্বাচন ইত্যাদি)। সমস্ত দেশের পুঁজিবাদের গতি নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। একজন সোলিনি বা একজন হিটলারের থেকে এখন এর ক্ষেত্র আরো ব্যাপক।

অন্যদিকে, পরিকল্পিত পুঁজিবাদ এর যুক্তিসম্মত অর্থের মুখোমুখি না হয়েই ফ্যাসিবাদের পিছনে অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পরিকল্পিত পুঁজিবাদের স্ববিরোধী লক্ষ্যে পৌঁছানোর বাস্তব চেষ্টাও একমাত্র ফ্যাসিবাদের পথে—অর্থাৎ উৎপাদনশক্তি আর শ্রমিকশ্রেণীকে দমন-পীড়নের পথ অনুসরণ করেই—করা যেতে পারে।

অতএব তৃতীয় বিকল্পের যে অতিকথন, প্রকৃতপক্ষে তা কোনো বিকল্পই নয়; আসলে তা হচ্ছে ফ্যাসিবাদের পথে অগ্রগমনের একটা ধাপ মাত্র। ফ্যাসিবাদ অবশ্যম্ভাবী নয়। ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদী বিকাশের কোনো আবশ্যিক স্তরও নয় যার ভিতর দিয়ে সব দেশকে যেতেই হবে। ফ্যাসিবাদের সম্ভাবনা ব্যর্থ করে দিয়েই সমাজবিপ্লব সম্ভব—যেমনটি হয়েছে রুশদেশে। কিন্তু সমাজবিপ্লব বিলম্বিত হলে ফ্যাসিবাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

ফ্যাসিবাদকে প্রতিরোধ করা যায়। প্রতিরোধ করে তাকে পরাভূত করা যায়। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে যদি কোনো মোহ না থাকে এবং এ-বিষয়ে যদি পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকে, তাহলেই তাকে প্রতিরোধ ও পরাভূত করা যায়। ফ্যাসিবাদের উৎপত্তির মূল বর্তমান সমাজের গভীরে প্রোথিত। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদই ফ্যাসিবাদকে জন্ম দেয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের মধ্যে ফ্যাসিবাদের জন্ম। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়ী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গ্যারান্টি সৃষ্টি করা যায় এবং ফ্যাসিবাদের কারণগুলি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায়।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ

যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া ও মিত্রশক্তিবর্গের জয়লাভের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কি ? —তা'হলে আমি একটা মাত্র বাক্যে উত্তর দেব—এটা মানুষের মুক্তি সংগ্রামের জয়। কারণ, একথা মনে রাখা দরকার, সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ এই মহাযুদ্ধের সঙ্গে কোনও না কোনভাবে জড়িত ছিল এবং প্রায় সমস্ত মহাদেশে এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রত্যক্ষ রণক্ষেত্রে হতাহত হওয়া ছাড়াও কোটি কোটি মানুষ নানাভাবে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছিল-- সেটা বন্দীশালার বর্বরতার জন্যই হোক কিম্বা অনশনজনিত কারণেই। কাহে সে সময় ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন এবং সাম্রাজ্যবাদী উইনস্টোন চার্চিলের গোঁড়ামির জন্য ভারতের স্বাধীনতা কিম্বা স্বরাজ স্বীকৃত না হওয়ায় ভারত প্রত্যক্ষ-ভাবে রণক্ষেত্রে যোগ দিতে পারেনি। তথাপি একমাত্র দুর্ভিক্ষের জন্যই সেদিনের ভারতবর্ষে বঙ্গদেশসহ অন্ততঃ ৪০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের দুঃখ, দুর্দশা ও দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। অবশ্য উপরতলার একমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু ছাড়া। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভারত সরাসরি রণক্ষেত্রে যোগ না দিলেও ভারতের জনগণের বৃহত্তম অংশ ফ্যাসিবাদের বিরোধী এবং সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি অনুরক্ত ছিল। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলারের জার্মানী বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক, অর্থাৎ রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি অকস্মাৎ একতরফা-ভাবে ভঙ্গ করে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সহ সোভিয়েত রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ভারতের মনীষীবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবী সমাজ নানা সভা-সমিতি, সংগঠনের মারফৎ নাৎজী ফ্যাসিস্ট আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। কেবল বুদ্ধিজীবীরাই নন, সাধারণ মানুষও আক্রান্ত রাশিয়ার

প্রতি ছিলেন সহানুভূতিসম্পন্ন, আর যাঁদের ১৯১৪-১৯১৮ সালের প্রথম সাম্রাজ্য-বাদী মহাযুদ্ধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল, সেই সমস্ত বয়স্ক ব্যক্তি তো তীব্র ধিক্কার দিয়েছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগ্রাসী বা ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গকে। অর্থাৎ সাধারণভাবে মানুষের সহানুভূতি ছিল আক্রান্ত পক্ষের প্রতি এবং বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতি।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল বিভিন্ন সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিগুলির মধ্যে যাদের পৃথিবীব্যাপী বিরাট ঔপনিবেশিক জমিদারি ছিল। আর, যাদের তেমন ঔপনিবেশিক রাজ্য ছিল না, তারা কিন্তু নতুন জমিদারি দখল করতে চেয়েছিলেন। তখন পৃথিবীতে কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল না। সুতরাং ধনতন্ত্রের ও সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ববৈপরীতের বহিঃপ্রকাশ রূপে রক্তাক্ত সংঘাত ও সংঘর্ষগুলি ছিল নিজেদের মধ্যে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে সেই শোণিতস্রাবের মধ্য থেকেই জন্ম নিল এক সর্বহারা বিপ্লবী সন্তান—১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে লেনিনের নেতৃত্বে পৃথিবীতে প্রথম সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটলো এবং তখন থেকেই বিংশ শতকের ইতিহাসে একটির পর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে লাগলো।

সুতরাং প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চরিত্র ও রূপের মধ্যে পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেল। সাম্রাজ্যবাদের ক্রুরতম পরিণতি ফ্যাসিজম বা নাৎজীবাদের মধ্যে এবং সেই ফ্যাসিবাদ কেবল নতুন উপনিবেশ দখল করতে চায়নি—চেয়েছিল গোটা পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতে। ফ্যাসিস্ট ইতালি, নাৎসী জার্মানী ও মিলিটারিস্ট (সমরবাদী) জাপান যে নরমেধ যজ্ঞ শুরু করলো এবং যার সশস্ত্র প্রস্তুতি চালাচ্ছিল বহু বছর ধরে, তার আসল লক্ষ্য কিন্তু ছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে চূর্ণ করা। আর পশ্চিমী গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিকে কাবু করে তাদের ধনৈশ্বর্য্য আহরণ করা। পরে, জাপানের নিকট অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় শত্রুরূপে প্রতিভাত হল—প্রশান্ত মহাসাগরে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের জন্য। কিন্তু তারাও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড বৈরীরূপে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে তার গায়ে (মাঞ্চুরিয়া-মঙ্গোলিয়া অঞ্চলে) হাত দিতে গিয়ে এমন মার খেয়েছিল যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আর সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের সাহস বা সুযোগ পায়নি। জার্মানী, ইতালী ও জাপান এই তিন ফ্যাসিস্ট শক্তি যেন ভৈরবচক্রে একত্র হয়ে নরবলীর শোণিত-মদিরায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল এবং যদি

এই শক্তিগুলি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত জয়লাভ করতো তবে হিটলারের হাজার বছরের রাইখের মত সারা বিশ্বই হাজার বছরের জন্য নরকাগ্নিতে দগ্ধ হতো। সুতরাং সোভিয়েত রাশিয়া ও লাল ফৌজের কাছে আমরা এজন্য কৃতজ্ঞ যে, সেই ভয়াবহ দাসত্ব ও অত্যাচার থেকে তাঁরা সভ্য মনুষ্য জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। অতএব ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মহাবিজয়ের ৪০তম বার্ষিকী আসলে পৃথিবীব্যাপী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের বিজয়রূপে কার্যত উদযাপিত হওয়া উচিত। কারণ এই মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয় এবং সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রবাদী মিত্রশক্তির চূড়ান্ত জয়লাভের ফলে সারা দুনিয়ার সর্বত্র উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে নতুন করে মুক্তির জোয়ার এলো। আর এশিয়া মহাদেশের নয়াচীনে, কোরিয়ায়, ভিয়েতনামে (ইন্দোচীনে), এবং অন্যান্য স্থানে বৈপ্লবিক তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ভারতবর্ষ এবং সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে ও লাতিন আমেরিকায় স্বাধীনতার জোয়ার এলো। সেই আগেকার পৃথিবীর উপনিবেশ বা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য আর নেই—যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে কখনও অস্ত যেত না। সেই সূর্য ১৯৪৭ সালের মধ্যে অস্তাচলের অন্ধকারে ডুবে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের ৪০ বছর পূর্তি হওয়ার অনেক আগেই সারা পৃথিবীতে ১০০টি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং ২০০ কোটি মানুষ নতুন মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। সোজা কথায় উপনিবেশবাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে এবং এক নতুন পৃথিবী জন্মলাভ করেছে। এর আগে ২০০ বছরের মধ্যে যা ঘটেনি, সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলির চূড়ান্ত পরাজয়ের মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে। ইতিহাসের এই গভীর তাৎপর্য এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জয়লাভের এই দূরপ্রসারী ফলাফল নিশ্চয়ই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

কিন্তু হিটলারের মত প্রায় একজন অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ কিভাবে জার্মানীর মত একটা শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী ডিক্টেটররূপে এমন সর্বনাশকরে মহাযুদ্ধ সংগঠন করতে পারলেন? প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত ও ক্ষতবিক্ষত জার্মানী প্রায় দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য চরমরূপে দেখা দিল। আর প্রুশিয়ান সমরবাদীরা, যারা জার্মানীর সামরিক অভিজাত, তারা ১৯১৪-১৮ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুযোগ খুঁজিছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের বিখ্যাত জার্মান রণনায়করা হিণ্ডেনবুর্গ, লুডেনডর্ফ প্রভৃতি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন কোন এক রাষ্ট্রনেতার জন্য, যার সহায়তায়

যুদ্ধযাত্রা করে জার্মানীর হৃত গৌরব পুনরায় ফিরিয়ে আনা যায়। ঘটনাচক্রে এ্যাডলফ হিটলার নামীয় এক অস্ট্রিয়ান যুবক, কার্যত যে যুবকটি ভবঘুরে ছিল, তার মধ্যে সাংগঠনিক শক্তি এবং বক্তৃতার জোরে জনসাধারণকে ক্ষেপাবার দারুণ ক্ষমতা আবিষ্কৃত হলো। এবং যুবকটি (প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে আহত হয়েছিল) নাৎজী পার্টি'র প্রথম সংগঠক ছিল। এর পিছনে দাঁড়ালো সেদিনের জার্মানীর বড় বড় ব্যাঙ্কার, ইণ্ডাস্ট্রিয়েলিস্টরা, শিল্পপতিরা এবং সমাজের আর্থিক সংস্থানের অধিপতিরা। কারণ, হিটলার প্রচার শুরু করলেন বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে এবং ঘোষণা করলেন বলশেভিকদের কিম্বা পূর্বদিকে রাশিয়াকে ধ্বংস না করা হলে ইউরোপ গোল্লায় যাবে। ফলে, মুসোলিনী, যিনি ইউরোপে প্রথম ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি হাত মেলালেন হিটলারের সঙ্গে। আর পশ্চিম ইউরোপের বিশেষভাবে ফ্রান্স ও বৃটেনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পাণ্ডারা সেদিনের সোভিয়েত বিপ্লবের আতঙ্ক থেকে আত্মরক্ষার জন্য নাৎজী-নেতা হিটলারকে সর্বতোভাবে সহায়তা দিলেন—আর্থিক ও সামরিক। মার্কিন ধনকুবেররাও এগিয়ে এলেন নাৎজী জার্মানীর সহায়তায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইঙ্গ-ফরাসীর শোষণ-নীতির সঙ্গে ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত যে মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত এবং চেকোশ্লভাকিয়াকে বলি দেওয়া হলো, সেই জঘন্য কাজই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে সুনিশ্চিত করে তুললো এবং হিটলারকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার সমস্ত প্রকার চেষ্টা বানচাল করে দেওয়া হলো।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই এই সমস্ত যুদ্ধের জন্য দায়ী এবং হিটলার ছিল নিমিত্তমাত্র। কারণ, এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে কোনমতেই বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং হিটলারকে পাওয়া গেল রাশিয়াকে ধ্বংস করার একটা প্রকাণ্ড অস্ত্ররূপে। কিন্তু গোটা ইউরোপের সমাজ জীবন তখন প্রায় ক্ষয়-রোগগ্রস্ত। সুতরাং দুর্ধর্ষ হিটলারি ফ্যাসিস্টবাহিনী (যাদের অগ্রনায়ক ছিল প্রুশিয়ান সামরিক অভিজাতেরা) বিদ্যুৎগতিতে উত্তর, পশ্চিম (একমাত্র বৃটেন ছাড়া) ও দক্ষিণ ইউরোপ জয় করে নিল। ইংরাজী সামরিক পরিভাষায় একে বলা হয়েছে 'ব্লীৎক্রীগ,' এবং রণক্রিয়াকে বলা হয়েছে 'টাইম টেবিল ওয়ার'—যেমন পূর্বাহ্নে ঘণ্টা মিনিট স্থির করে ট্রেনগুলি যাতায়াত করে। সুতরাং ধনবাদী দেশগুলির সংবাদপত্রে হিটলারীক বাহিনীকে 'অপরাজেয়' বলে প্রচার করা হতে লাগলো।

১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলারী জার্মানী গোটা ইউরোপের শক্তি ও সম্পদ আহরণ করে হাজার মাইল দীর্ঘ রুশ সীমান্তে—বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়লো। তখন জার্মানীর হাতে মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ২১৪ ডিভিসন কিম্বা মোট ৮৫ লক্ষ লোক। এই বিশাল সৈন্য সংখ্যার মধ্যে ১৫৩ ডিভিসন জার্মান সৈন্য এবং তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ৩৭ ডিভিসন সৈন্য কিম্বা মোট ৫৫ লক্ষ লোককে নির্দেশ করা হলো সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে রণক্রিয়ার জন্য। এই বিরাট সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব রণাঙ্গণে মোট সৈন্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৬৬ ডিভিসন কিম্বা ৬২ লক্ষ। অবশ্য সৈন্য ও অস্ত্র সংখ্যায় সোভিয়েত রাশিয়াও কম ছিল না। বরং কোন কোন সময় জার্মান নাৎজীদের চেয়ে বেশী ছিল। এভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কারণ, এই মহাযুদ্ধ ঘটেছিল ইউরোপে, এশিয়ায় ও আফ্রিকা মহাদেশের ৪০টি রাষ্ট্রে। এবং মহাযুদ্ধের শেষ লগ্নে দেখা গেল ৬১টি দেশ এই নরমেধ যজ্ঞে জড়িয়ে পড়েছে। যাদের মোট লোকসংখ্যা ১৭০ কোটি কিম্বা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগের বেশী। যাদের মধ্যে ১১ কোটি লোককে সামরিক কার্যে সমাবেশ করা হয়েছিল। সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধ ক্রমাগত ১,৪১৮ দিন ও রাত্রি ধরে চলেছিল। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম কিংবা নিদারুণ শীত—যখন তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নীচে ৪০ সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল, তখনও এই মৃত্যুপণ যুদ্ধ চলেছিল। ইতিহাসে এর তুলনা নেই। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কুর্স্ক এবং বার্লিন—এই পাঁচটি শহরের যুদ্ধই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (ইউরোপীয় মহাদেশের) চূড়ান্ত নিয়ামক ছিল। পূর্বদিকে—জাপানের বিরুদ্ধে উত্তর-পূর্ব চীনের সেরা জাপানী বাহিনীর কোয়ান্টাং আর্মি ও ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল। সুতরাং জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটোম বা পারমাণবিক বোমা বর্ষণের মার্কিন বর্বরতা অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন ছিল না। এটা ছিল সোভিয়েত বিদ্বেষী চার্চিল ও প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের এক ধরণের কূটনৈতিক বজ্জাতি (প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আগেই মারা গিয়েছিলেন)। যদিও বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া এক মহাজোট বা ফ্যাসিস্টবিরোধী গ্রেট কোয়ালিশনে মিলিত হয়েছিল নাৎজী জার্মানীকে পরাজিত করার জন্য।

হিটলার ধূমকেতুর মত উদিত হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত ধূমকেতুর মতই জ্বলে

পুড়ে ছাই হয়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু জার্মান জনগণ এখনও টিকে আছেন এবং ইউরোপের মধ্যস্থলে জার্মান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যেমন হয়েছে পূর্ব ইউরোপে। জার্মানীকে খণ্ডন করার কোন ইচ্ছা স্তালিন বা সোভিয়েত রাশিয়ায় ছিল না। কিন্তু এটাও ঘটলো ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগুলির সোভিয়েত বিরোধী ও কূটনৈতিক দুর্বুদ্ধির জন্য।

নির্মল বসু

....

দেশে দেশে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম

৯ই মে, ১৯৪৫, প্রাগ্ জয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে। ফ্যাসিবাদের ওপর বিজয় ঘোষিত হয়।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, জার্মান সৈন্যদের পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়। হিটলার কেবল পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেই ক্ষান্ত থাকবেন, এমন মনোভাব তাঁর কখনও ছিল না। একের পর এক দেশ জয় করে ইউরোপের সর্বত্র, এবং, তারপর এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল তিনি দখল করবেন, এই ছিল তাঁর মনোবাসনা। নবোত্থিত জার্মান পুঁজিবাদের উপনিবেশ, বাজার সংগ্রহের জন্য এই দখলদারি প্রয়োজন।

ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদেরই এক নগ্ন ও বর্বর রূপ। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের সংকট থেকে এর সৃষ্টি। পাশবিক শক্তি তথা গায়ের জোর এর ভিত্তি। নিছক শক্তির জোরে ফ্যাসিবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায়। দেশের অভ্যন্তরে এরা শক্তি-নির্ভর রাজনীতির ওপর নির্ভরশীল। সকল প্রকার বিরোধিতা এরা বলপ্রয়োগের দ্বারা নির্মূল করে। যুদ্ধ তথা পর-রাষ্ট্র আক্রমণকে এরা সমর্থন করে। কেবল সমর্থন করে না, যুদ্ধকেই এরা জাতি-শ্রেষ্ঠত্ব তথা শক্তির পরাকাষ্ঠা বলে মনে করে। মানুষকে এরা ঘৃণা করে। নিজ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা এবং অপর জাতিকে হেয় মনে করা ও অপরকে ঘৃণা করা এদের অন্যতম দার্শনিক ভিত্তি। এই হল ফ্যাসিবাদ।

হিটলারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নাৎজীবাদ মূলত ফ্যাসিবাদ। মুসোলিনীর অনুসৃত ফ্যাসিবাদের মতই।

১৯৩০ সালে বিশ্বব্যাপী যে চরম অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তার থেকেই

জার্মানীর নাৎজীবাদ ও ইতালীর ফ্যাসিবাদের উদ্ভব। ইউরোপেও এই অর্থ-নৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২, এই সময়ের মধ্যে জার্মানীতে শিল্প উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ কমে যায়। বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। জীবনযাত্রার মান ভয়ঙ্করভাবে কমে যায়। অপরদিকে, এই সময়ের মধ্যে, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের অধীন এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে মুক্তি সংগ্রাম জোরদার হয়। এবং ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাবে বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের পক্ষেও বহু মানুষ আকৃষ্ট হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলি পরস্পরবিরোধী দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম শিবিরে রইল ব্রিটেন ও ফ্রান্স, যাদের হাতে প্রচুর উপনিবেশ, আর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ফিলিপাইনস্। এরা এদের উপনিবেশগুলি ধরে রাখতে চায়। আর বিরোধী শিবিরে জার্মানী এবং ইতালী ও চীন। যারা অন্য ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে উপনিবেশগুলি কেড়ে নিতে চায়। কারণ, পুঁজিবাদের পক্ষে উপনিবেশগুলির বাজার একান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে নিজ দেশের জাতীয় অর্থনীতির মুক্তি নেই। এই নিয়েই দু'পক্ষের লড়াই।

জার্মানী ইতিমধ্যে হিটলারের নেতৃত্বে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। এখানে পুঁজিবাদও একটু নড়ে চড়ে বসেছে। তাই বিষদাঁত এদেরই বেশি। বিশ্বজয়ের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এই সময় জার্মানীর সামরিক শক্তি কিভাবে বেড়েছে একটু হিসাব নিলেই তা বোঝা যাবে। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে জার্মানীর যুদ্ধ উৎপাদন ২২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামরিক শক্তি বেড়েছে, ১৯৩৬-এ ৩১ ডিভিশন, ১৯৩৮-এ ৫২ ডিভিশন, আর ১৯৩৯-এ ১০৩ ডিভিশন। মোট সৈন্যসংখ্যা ১৯৩২-এ যেখানে ছিল ১০৪, ২১৮ তা ১৯৩৯-এ বেড়ে হয়েছে ৩, ৭৫৪, ১০৪। অর্থাৎ, ৭/৮ বছরে ৩৫ গুণ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বোমারু বিমানের সংখ্যা ১৯৩৪-এ ছিল ৮৪০, তা ১৯৩৯-এ বেড়ে হয়েছে ৪, ৭৩৩। এইভাবে জার্মানী তার যুদ্ধপ্রস্তুতি বাড়িয়ে চলেছে। ভার্সাই চুক্তি অমান্য করে জার্মানী ১৯৩৫ সালে প্রাপ্তবয়স্ক সকল জার্মান যুবকের সৈন্যদলে বাধ্যতামূলক যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৩৬ সালে ফরাসী সীমান্তের কাছে 'সৈন্যবিহীন' এলাকা বলে ঘোষিত রাইনল্যাণ্ডে জার্মান সৈন্য সমাবেশ করে।

অবশ্য, ১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ড আক্রমণেই যে ফ্যাসিবাদী অভিযান সুরু

হয়েছে তা নয়। ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ তারিখে জাপান চীনের উত্তর-পূর্বে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। তাত্ত্বিক বিচারে জাপান ফ্যাসিবাদের অনুসারী না হলেও এই বর্বর ও নির্লজ্জ পররাজ্য আক্রমণ সভ্যতার পক্ষে এক গুরুতর সংকট। ১৯৩৪-৩৫-এ ইতালী ইথিওপিয়া আক্রমণ করে, এবং ইথিওপীয় জনগণের প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্ত্বেও ৫ই মে, ১৯৩৬ তারিখে আদ্দিস আবাবার পতন ঘটে। ১৯৩৬-এ স্পেনে গণতান্ত্রিক শাসন উচ্ছেদের জন্য জেনারেল ফ্রাঙ্কোর চক্রান্তকে কেন্দ্র করে যে গৃহযুদ্ধ সুরু হয় জার্মানী ও ইতালী তাতে ফ্রাঙ্কোর পক্ষাবলম্বন করে।

চীন ও ইথিওপিয়ার আক্রান্ত মানুষের পক্ষে এবং স্পেনে গণতন্ত্রীদের পক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাকামী, গণতন্ত্রী ও শান্তিবাদীরা এগিয়ে আসেন, এবং, অনেকে এই সব দেশে এসে প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেন। ভারতের পক্ষ থেকে স্পেনে স্বেচ্ছাসেবীরা গিয়েছিলেন। ১৯৩৮-এ সুভাষচন্দ্র বসু যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চীনের সংগ্রামরত মানুষের সাহায্যে মেডিক্যাল মিশন প্রেরিত হয়।

দুই

১৯৩৯-এ জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণ তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু করা সম্ভব হয় ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের দুর্বল তোষণ নীতির ফলে। দীর্ঘদিন ধরে জার্মানী তার সামরিক শক্তি বাড়িয়ে চলেছে, অথচ এরা তাতে ভ্রুক্ষেপ করে নি। বরং, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ মিউনিকে জার্মানী ও ইতালীর সঙ্গে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন ও ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড দালাদিয়ের যে চুক্তি করেন নির্লজ্জ তোষণনীতির ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। এই চুক্তির দ্বারা চেকোস্লোভাকিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও বহুসংখ্যক অধিবাসীর ওপর জার্মানীর অধিকার মেনে নেয়া হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ধারণা ছিল, জার্মানী উগ্র কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী। সুতরাং, জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবে। এবং তার জন্য জার্মানীর আক্রমণ হবে বরাবরই পূর্ব-গামী। পশ্চিমদিকে, অর্থাৎ, ফ্রান্স, ব্রিটেন বা অন্য কোন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের বিরুদ্ধে তারা যাবে না। এবং এ হলে তো ভালই হয়। শত্রু সোভিয়েত জব্দ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবও একই রকম ছিল। কিন্তু তা হয় নি ; হিটলার যেমন পোল্যাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি পূর্ব-দেশ দখল করে

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেছেন, বিস্তীর্ণ সোভিয়েত অঞ্চল দখল করেও রেখেছেন, তেমনি তিনি পশ্চিম ফ্রন্টও খুলেছেন। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নরওয়ে ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সবই দখল করেছেন। ব্রিটেন আক্রমণ করেছেন। অষ্ট্রিয়া, গ্রীস, যুগোস্লাভিয়াও দখল করেছেন।

নিতান্ত বাধ্য হয়ে, আত্মরক্ষার তাগিদে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, এবং শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড বিপদের সময়েও এদের মনোভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। হ্যারি ট্রুমান, যিনি পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হন, বলেন, "আমরা যদি দেখি জার্মানী জয়লাভ করছে, তাহলে আমরা রাশিয়াকে সাহায্য করব। আর, যদি দেখি, রাশিয়া জিতছে তা হলে আমরা জার্মানীকে সাহায্য করব। এবং, এই ভাবে এরা নিজেরা মারামারি করে করুক।" [নিউ ইয়র্ক টাইমস্, ২৪শে জুন, ১৯৪১]

যুদ্ধ যখন শেষ হচ্ছে, ১৯৪৫ সালের এপ্রিল-মে মাসে, এবং সোভিয়েত সৈন্য এগিয়ে আসছে জার্মান সৈন্যকে তাড়া করে পশ্চিম-অভিমুখে, তখন ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একযোগে জার্মান ভূখণ্ডে তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ায়। জার্মানীকে খণ্ড করে পশ্চিমাংশে তিন দেশের সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে সোভিয়েত প্রভাব থেকে পশ্চিমকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। আজও 'ন্যাটো' এই কাজ করে চলেছে।

তিন

কোনরূপ প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, ২২শে জুন, ১৯৪১। সোভিয়েত আক্রমণের পরিকল্পনা স্বয়ং হিটলার প্রস্তুত করেন। এবং আক্রমণের গোপন নাম 'প্ল্যান বারবারোসা।' হিটলারের নিজের দেয়া নাম। মধ্যযুগের অন্যতম সম্রাট ও যুদ্ধজয়ী ফ্রেডরিক আই, বারবারোসা। হিটলার দম্ভভরে বলেছিলেন, ক'দিন? মুণ্ডহীন ধাতু-সৈন্যের মত সোভিয়েত শক্তি মুহূর্তের মধ্যে ধ্বসে পড়বে!

কিন্তু হিটলারের এই দম্ভ-চিন্তা যে কত ভুল তা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। অগ্রবর্তী জার্মান সৈন্য প্রথম দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপক অঞ্চল দখল করে ফেলে। তারপর, ১০ লক্ষ সৈন্য ও ২ হাজার ট্যাঙ্ক নিয়ে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, হিটলার বাহিনী মস্কো অভিমুখে বড় রকমের অভিযান শুরু করে। কিন্তু

জার্মান সৈন্য মস্কো দখল করতে পারে নি। ডিসেম্বরের গোড়ায় সোভিয়েত সৈন্য উল্লেখযোগ্য পালটা আঘাত করে, এবং, জার্মান সৈন্য পিছু হঠতে বাধ্য হয়। মস্কোর নিদারুণ শীতে জার্মান সৈন্যরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হিটলারের মস্কো আক্রমণ পরিকল্পনা যে কত ভুল তা জার্মান সৈন্যরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে। মস্কোতে এই সময় শীত তাপাঙ্কের ৩০/৪০ ডিগ্রি নীচে। নেপোলিয়নকে রাশিয়ার শীতের কাছে পরাভব স্বীকার করতে হয়। হিটলারকেও।

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। স্তালিনগ্রাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান শিল্প-কেন্দ্র। বাকুর তেল অঞ্চলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় রুশ এলাকার প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র। জার্মানরা জানত, স্তালিনগ্রাদ দখল না করলে ককেশাস দখল করা যাবে না। জুলাই, ১৯৪২-এ জার্মান সৈন্য স্তালিনগ্রাদ আক্রমণ করে। কিন্তু এখানেও জার্মানরা পরাজিত হয়। জুলাই ১৯৪২ থেকে অক্টোবর ১৯৪৩, ককেশাসের এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জার্মানরা পিছু হঠে।

সব চেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য লড়াই হয় লেনিনগ্রাদকে কেন্দ্র করে। ২৭শে আগস্ট, ১৯৪১ জার্মান সৈন্য লেনিনগ্রাদ শহর অবরোধ করে। এই দিন শেষ ট্রেন লেনিনগ্রাদ ছেড়ে যায়। ২৫ লক্ষ মানুষের এই শহর। ৪ লক্ষ শিশু। জার্মান সৈন্য চার দিক থেকে শহরে ঢোকার ও বের হবার সব পথ বন্ধ করে শহরবাসীকে না খাইয়ে মেরে ফেলার চক্রান্ত করে। দু'বছরের ওপর চলে এই অবরোধ। এর মধ্যে বহুবার জার্মান বোমারু বিমান শহরের ওপর বোমা বর্ষণ করেছে। খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়েছে, ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে, বহু নরনারী শিশু মারা গিয়েছে। এই দুই বছরের অবরোধে অনাহারে রোগে মারা গেছে ৬, ৪১, ৮০৩ জন মানুষ। এত মানুষ মারা গেছে যে এদের কবর পর্যন্ত দেয়া সম্ভব হয় নি। তবু শহরবাসীর মনোবল এতটুকু নষ্ট হয় নি। তারা প্রতিরোধ চালিয়ে গেছে। ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৪৪। শহরের ওরানিয়েনবাম এলাকা থেকে সোভিয়েত সৈন্য জার্মানদের ওপর বড় রকম আক্রমণ করে। ১৫ই জানুয়ারী শহরের দক্ষিণ দিক থেকেও বড় রকমের আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। এবং এই আক্রমণে জার্মান সৈন্য পরাজিত হয়। এই জয়ের দ্বারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি বিশেষ ভাবে নির্ধারিত হয়ে পড়ে। এর পরে জার্মান সৈন্য একটানা পশ্চাদপসরণ এবং সোভিয়েত সৈন্যের অগ্রগমন অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে। একের পর এক দেশে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশ করেছে, তাদের সঙ্গে স্থানীয় প্রতিরোধ-সংগ্রামীরা

যোগ দিয়েছে, এবং জার্মান সৈন্য পরাজয় স্বীকার করে সরে গিয়েছে। পশ্চিম ফ্রন্টেও জার্মান সৈন্যরা আর সুবিধা করে উঠতে পারে নি। যুদ্ধ-কালের একাধিক জার্মান সেনাপতি এবং পরবর্তীকালে বিশিষ্ট ঐতিহাসিকেরা অনেকেই বলেছেন, পূর্ব ফ্রন্টেই স্থির হয়ে গেছে যুদ্ধে পশ্চিম ফ্রন্টের গতি কি হবে।

১৬ই এপ্রিল, ১৯৪৫ বার্লিনের কাছে অগ্রবর্তী সোভিয়েত সৈন্যের সঙ্গে জার্মান সৈন্যর প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়। ১লা মে রাইখস্টাগের পতন ঘটে। ৮ই মে আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে জার্মান সৈন্যের বিরুদ্ধে এই কঠিন সংগ্রামে কেবল যে সোভিয়েত সৈন্যরাই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছে, তা নয়, এই সময় শহর ও গ্রামের অ-সামরিক ব্যক্তিদের ভূমিকাও কম গৌরবের নয়। প্রধানত মেয়েদের। যুবতী, বৃদ্ধা, সবাই। এরা ক্ষেতখামারের কাজ দেখেছে। কারখানায়ও পুরুষদের সঙ্গে কাজ করেছে। যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন করেছে। খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। ফ্রন্টে রসদের জোগান দিয়েছে। যুদ্ধজয়ে তাই এদের ভূমিকা খুবই বেশি।

কেবল সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, জার্মান-অধিকৃত সব দেশেই প্রতিরোধ সংগ্রামে দেশপ্রেমিক মানুষ এই ভূমিকা পালন করেছে। অধিকৃত দেশগুলিতে প্রতিরোধ সংগ্রামীরা জার্মান সৈন্যদের বিরুদ্ধে অতর্কিত অন্তর্ঘাতমূলক কাজের দ্বারাও সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিশেষ করে রেলপথ ভেঙে দিয়ে, বোমা মেরে সেতু উড়িয়ে দিয়ে এরা জার্মান সৈন্যদের অগ্রগতি রুখেছে বহু জায়গায়। জার্মান সৈন্যরা ব্যতিব্যস্ত হয়েছে এই সব কাজের দ্বারা।

চার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে জার্মান দখলে ইউরোপের যে সব দেশ ছিল, সে সব দেশেই দখলদারী জার্মান সৈন্য ও তাদের দালাল-সরকারের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক প্রতিরোধ-সংগ্রামীরা কঠিন, দৃঢ় সংগ্রাম করেছে, এবং এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে।

চেকোস্লোভাকিয়ায় বড় রকমের অভ্যুত্থান হয়, স্লোভাকিয়ায় ২৯শে আগস্ট, ১৯৪৪ তারিখে, এবং, কেবল এই অঞ্চলের মানুষ নয়, ইউরোপের বহু দেশের সংগ্রামীরা এই জাতীয় অভ্যুত্থানে সহযোগী হিসাবে অংশ গ্রহণ করে। ৯ই মে ১৯৪৫ তারিখে প্রাগ্ অভ্যুত্থান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান সূচনা করে।

প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য ২৫ হাজারের ওপর মানুষ প্রাণ হারায় চেক্ ও স্লোভাক এলাকায়।

রুমানিয়ায় ইউনাইটেড্ ন্যাশনাল ফ্রন্টের নেতৃত্বে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন চলে।

বুলগেরিয়ায় ফাদারল্যাণ্ড ফ্রন্ট প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয়। সেপ্টেম্বর ১৯৪৪-এর অভ্যুত্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পোল্যাণ্ডে ২০ লক্ষ প্রতিরোধ-সংগ্রামী নানাভাবে অংশ গ্রহণ করে। পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় শহর ক্র্যাকো। এই এলাকায় হিটলারের প্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রতিরোধ সংগ্রামীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জার্মানরা এত বোমা বর্ষণ করে যে ওর পুরোনো ওয়ারশ শহর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। যুদ্ধের পর আবার একই রকম চেহারায় শহরটি গড়ে তোলা হয়েছে।

হাঙ্গেরীতে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ফ্রন্ট প্রতিরোধ সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল।

যুগোস্লাভিয়ায় মার্শাল জোশেফ ব্রজ টিটোর নেতৃত্বে পিপ্‌লস্ লিবারেশন আর্মি জার্মান দখলদারীর বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে এবং দেশকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। অবশ্য, শেষ পর্যায়ে সোভিয়েত সৈন্য যুগোস্লাভিয়ায় প্রবেশ করে বেলগ্রেড থেকে জার্মান সৈন্যদের বিতাড়ন করে।

আলবানিয়ায় অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ন্যাশন্যাল লিবারেশন কংগ্রেস গড়ে ওঠে, এবং এই সংগঠনের নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালিত হয়। মে, ১৯৪৪-এ পারমেট শহর জার্মান দখল থেকে মুক্ত হয়।

খাস জার্মানীতেও হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে ওঠে। নাৎজী বাহিনীর বিরুদ্ধে নানা স্থানে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম হয়।

গ্রীস, বেলজিয়াম, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সব দেশেই এইভাবে প্রতিরোধ-সংগ্রাম গড়ে ওঠে।

ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ সংগ্রামীরা লড়াই চালিয়ে যায়। বাইরে থেকে চার্লস দ্য গল সংগ্রাম করেন; বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ফেড্রিক জোলিও-কুরি ছিলেন প্রতিরোধ সংগ্রামীদের অন্যতম।

ব্রিটেনে লণ্ডন ও আরও কয়েকটি শহরে প্রচণ্ড জার্মান বোমাবর্ষণ হয়। সমুদ্রে ব্রিটিশ জাহাজ আক্রান্ত হয়। জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বত্র ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে ওঠে। দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল,

রক্ষণশীল ও শ্রমিক দল কোয়ালিশন সরকার গঠন করে আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নেতৃত্বে।

আফ্রিকা ও এশিয়ার আক্রান্ত দেশগুলিতেও দখলদারী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে ওঠে।

চীনে এই প্রতিরোধ সংগ্রাম থেকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়। কোরিয়া, ভিয়েতনাম (ইন্দো-চীনের অন্যান্য অঞ্চল সহ), বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, এই সব দেশে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ভারতেও তাই।

বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদবিরোধী এই যে সংগ্রাম তাতে সেইসব দেশের বিভিন্ন মুক্তিকামী গণতান্ত্রিক দল, অন্যান্য সংগঠন, কমিউনিস্ট, সোস্যাল ডেমোক্রাট, ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

পাঁচ

ছ' বছরের এই বিধ্বংসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পাঁচ কোটির ওপর মানুষ মারা গেছে। পঙ্গুর সংখ্যা অগুণতি।

ওসিয়েসিম্, ট্রেব্লিঙ্ক, বুখেন ওয়াল্ড্, ব্যাভেন্স্ব্রাক্, মাউর্থাসেনের মত লোমহর্ষক মৃত্যু-শিবিরে লক্ষ লক্ষ মানুষ নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।

লিডিস্, ওরাডুর, খেতিনের মত শহর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ঘরবাড়ী, গির্জা, গ্রন্থাগার, পুরাকীর্তি কত যে ধ্বংস হয়েছে তার কোন লেখাজোখা নেই।

এমন যে যুদ্ধ, তা যেন আর না হয়।

আজও আবার যুদ্ধ বাঁধাবার চক্রান্ত চলছে। পরমাণু যুগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। নবরূপে ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব ঘটছে। তাই এই সতর্কবাণী।

চিন্মোহন সেহানবীশ

স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও ভারতের বুদ্ধিজীবী সমাজ

১৯১৬ সনের জুলাই মাসের গোড়ায় স্পেনে প্রজাতন্ত্রী, কমিউনিষ্ট, সোশ্যালিস্ট, এনার্কিস্ট প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের এক যুক্তফ্রন্ট সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে। বহু শত বছর ধরে স্পেনের মানুষ অত্যাচারী, সামন্ততান্ত্রিক শাসকবর্গের হাতে যে অকথ্য অত্যাচার ভোগ করে আসছিল তার থেকে মুক্তির পথ যেন তাদের কাছে অবারিত হল এতদিনে। কিন্তু বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ১২শে জুলাই (১৯৩৬) প্রথম প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল। সে অপচেষ্টা দমনের অল্পকাল পরেই মরোক্কো থেকে শুরু হল জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ। শুরু হল স্পেনের মাটিতে রক্তক্ষয়ী ও মর্মান্তিক এক গৃহযুদ্ধ। সে গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর পক্ষে দেখতে দেখতে সামিল হয়ে গেল হিটলার ও মুসোলিনী। অন্যান্য দেশেরও গণতন্ত্র-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মহল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এগিয়ে এল ফ্রাঙ্কোর সাহয্যে। আর পৃথিবীর সমস্ত গণতন্ত্র-সচেতন মানুষ দাঁড়াল স্পেনের যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে। গণতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য গড়ে উঠল ইতিহাসখ্যাত আন্তর্জাতিক বাহিনী। সে বাহিনীর সদস্য হিসাবে অসমসাহসিক সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করে অমর হলেন প্রাজ্ঞ নেতা ও সাহিত্যরসিক রালফ ফক্স, কবি কর্ণফোর্ড ও লর্কা, নন্দনতাত্ত্বিক ক্রিস্টোফার কডওয়েল, গণিতশাস্ত্রী ও দার্শনিক ডেভিড গেস্ট, ভাস্কর্যশিল্পী ফেলিসিয়া ব্রাউন প্রমুখ মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা।

স্বভাবতই এ সংগ্রাম ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী মহলে ও পরে সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের শিবিরে প্রচণ্ড সাড়া জাগায়। গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার দু'মাসের মধ্যে (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথকে দেখা গেল ব্রাসেল্‌সে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসে প্রেরিত এক বাণীতে এই কথা বলতে :

'If peace is to be anything more than the mere absence of war, it must be founded on the strength of the just and not on the weariness of the weak. The groan of peace in Abyssinia is no less ghostly than the howl of war in Spain······We cannot have peace until we deserve it by paying its full price, which is that the strong must cease to be greedy and the weak must learn to be bold.'

শুধু প্রসঙ্গক্রমে নয়, পরের বছর রবীন্দ্রনাথ আরো সরাসরি স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন এক বিবৃতি মারফৎ। তিনি জানালেন যে:

'In Spain world civilization is being menaced and trampled underfoot. Against the demorcatic Government of the Spanish people, Franco has raised the standard of revolt. International fascism is pouring men and money in aid of the rebels. Moors and foreign legionaries are sweeping over the beautiful plains of Spain, trailing behind them death, hunger and desolation.

'Madrid, the proud centre of culture and art, is in flames. Her priceless treasures of art are being bombed by the rebels. Even hospitals and churches are not spared. Women and childeren are murdered, made homeless and destitutes.

'This devastating tide of international fascism must be checked. In Spain this inhuman recrudescence of obscurantism of racial prejudice, of rapine and glorification of war must be given the final rebuff. Civilization must be saved from its being swamped by barbarism.

'In this hour of the supreme trial and suffering of the Spanish people, I appeal of the conscience of humanity. Help the peoples' front in Spain, help the Government of the people, cry in a million voices halt to reaction, come in your millions to the aid of democracy, to the success of civilization and culture.'

আন্তর্জাতিক ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রামে স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন এই কবির আহ্বান। এরই সূত্র ধরে সেদিন এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "League against Fascism and War"। রবীন্দ্রনাথ যে তার সভাপতি, তা বলাই বাহুল্য। দেশে দেশে গণতান্ত্রিকদের ফ্রাঙ্কো-বিরোধী সমাবেশ সত্ত্বেও স্পেনের গৃহযুদ্ধে একদিকে হিটলার ও মুসোলিনীর প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ আর অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির 'হস্তক্ষেপ না করার' (non-intervention) ভুয়ো নীতি যখন শেষ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রী সরকারকে পর্যুদস্ত করে ফ্রাঙ্কোকে স্পেনের অধীশ্বর করল তখন রবীন্দ্রনাথ বর্বর ফ্যাসিজমের উপরে অভিসম্পাত হানার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ ও অন্যান্য সম্রাজ্যবাদীদের কুটিল চক্রান্তকেও নিন্দা করতে ভোলেন নি। কখনো কবিতায় 'যুদ্ধ বাধল স্পেনে' আচমকা এসে পড়েছে অন্য কথা ছাপিয়ে, কখনো বা 'সাম্রাজ্যবাদকে দেখলুম কুটিল চক্রান্ত করে প্রজাতন্ত্রী স্পেনের ভরাডুবি ঘটাতে' লিখেছেন ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে, আবার 'সভ্যতার সংকটে' লিখলেন '...পরে এক সময়ে স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্ণমেন্টের তলায় ইংলণ্ড কি রকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি, একদল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন' ইত্যাদি। স্পেন সত্যই সেদিন কবির মনকে আচ্ছন্ন করেছিল বহুল পরিমাণে।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য সাধারণ্যে প্রচার করে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিজমের বিপক্ষে সামিল করার ব্যাপারে অসামান্য কৃতিত্ব জওহরলাল নেহরুর। তিনি সেদিন প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সমর্থন জানানোর জন্য সরাসরি ছুটে গিয়েছিলেন বার্সেলোনায়, লণ্ডন ও প্যারিসে, বিরাট সব জনসমাবেশে ঐ সরকারকে সর্বাধিকভাবে সাহায্য-দানের আবেদন জানিয়েছিলেন, স্পেন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নেগ্রিনের কাছে সমর্থনজ্ঞাপক চিঠি লিখেছিলেন নিজে এবং গান্ধীজীকেও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন লিখতে। জাতীয় কংগ্রেসে স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারের সমর্থনে প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল তাঁরই উদ্যোগে—তাঁর আত্মজীবনীর 'পরিশিষ্ট' রচনা থেকে জানা যায় যে তার জন্য তাঁকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কংগ্রে-সের কোন কোন প্রভাবশালী মহলের।

ডাঃ মুলকরাজ আনন্দ ও ডাঃ অটলও (পরবর্তী দিনে ইনি চীনে ভারতীয়

মেডিকেল মিশনের নেতৃত্ব করেন) নেহরুর মত সেদিন ছুটে গিয়েছিলেন রক্তাক্ত স্পেনের বুকে—ভারতবর্ষের প্রগতিশীলদের তরফ থেকে। আর শ্রীযুক্ত হৃদ্দার সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন বিখ্যাত 'আন্তর্জাতিক বাহিনীতে'। স্পেনের ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক বাহিনীর আশ্চর্য বীরত্বের কথা যে সেদিন আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী কারাগারে অবরুদ্ধ বন্দীদের মনে চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল তার কথা জানা যায় 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীঅনন্ত সিংহের এক প্রবন্ধে এবং শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার সিংহের Andaman, The Indian Bastille গ্রন্থে।

বাঙলা দেশের লেখক,শিল্পী,সাংবাদিক ও ছাত্র মহলেও সাড়া জাগায় স্পেন। 'আনন্দ বাজার পত্রিকার' তখনো আজকের হাল হয়নি। তার সম্পাদনা করতেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়। তাঁর নায়কতায় সেদিন আনন্দ-বাজারের পাতায় দিনের পর দিন প্রকাশিত হত ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্পেনের সমর্থন। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, সুকুমার মিত্র, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান প্রমুখ অনেকেই তখন নিয়মিত সেখানে লিখতেন এ প্রসঙ্গে। বিশেষ করেই তাঁদের অনুপ্রাণিত করত কডওয়েল-কর্নফোর্ড-রালফ ফক্স প্রভৃতির অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত।

১৯৪২ সনে বাঙলা দেশে 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' প্রতিষ্ঠার ভিত রচনা হয়েছিল এর মারফৎ।

জ্যোতি বসু

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়

বিশ্বের সমস্ত দেশের জনসাধারণ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ের ৪০তম বার্ষিকী পালন করছেন। ৪০ বছর আগে, ১৯৪৫ সালের মে মাসে ফ্যাসিস্তদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। সমগ্র বিশ্বের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তারের বাসনা চূর্ণ হয়ে যায়। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ, কমিউনিষ্ট পার্টি এবং সোভিয়েত লাল ফৌজের চূড়ান্ত ও গৌরবোজ্জ্বল অবদান ভোলার নয়।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই ঐতিহাসিক বিজয় হলো রুশ দেশে মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা বিশ্বের মানচিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটায়।

আমি বৃটেনে এবং এ-দেশে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন দেখেছি এবং কোন না কোন ভাবে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি। এই প্রবন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আমি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

১৯৩৫ সালে আমি লণ্ডনে যাই এবং ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে দেশে ফিরে আসি। লণ্ডনে পৌছেই আমি বৃটেনের কমিউনিষ্ট পার্টি'র সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করি। পরের বার, অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে আমি কমিউনিস্ট হই—আমার সাথে আর কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রও বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি'র নির্দেশ অনুযায়ী প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করি।

আমরা যখন বৃটেনে তখন দেশে দেশে ফ্যাসিস্ত অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেছে। ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে হিটলারের নাৎজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হিটলার উইমার রিপাবলিক ভেঙ্গে দিয়েছে। নাৎজিরা কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মী ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে।

এর বহু পূর্বে, ১৯২২ সালে ফ্যাসিস্ত মুসোলিনি ইতালিতে ক্ষমতা দখল করেছে। ক্ষমতা দখল ও সংহত করার পর মুসোলিনি হিটলারের এবং জাপানি যুদ্ধবাজদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে এবং এইভাবেই রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৩৩ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাইখস্ট্যাগে অগ্নিসংযোগের মেকি অপরাধে জার্মানির লাইপজীগে জর্জি ডিমিট্রভকে নাৎজি আদালতে বিচারের প্রহসন শুরু হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের মহান নেতা ডিমিট্রভকে নাৎজিরা বেশিদিন আটক রাখতে পারেনি। নাৎজিরা তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। মুক্তি পেয়েই ডিমিট্রভ মস্কোতে চলে যান এবং তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহক কমিটির সাধারণ সম্পাদকপদে নির্বাচিত হন। তারপর থেকে ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিলোপের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সাধারণ সম্পাদক পদে বহাল ছিলেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ জয়লাভের পর ডিমিট্রভ জনগণতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

রাইখস্ট্যাগে অগ্নিসংযোগের সাজানো মামলার সুযোগ নিয়ে নাৎজিরা কমিউনিস্ট কর্মী ও ইহুদিদের উপর ব্যাপক হিংসাত্মক অভিযান শুরু করে। শক্তিশালী জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আর্নস্ট থেইলমানকে নাৎজিরা জেলে আটক করে এবং পরে তাঁকে জেলখানার ভিতরেই হত্যা করে।

নাৎজি ঝটিকা বাহিনীর সাথে কমিউনিস্টদের রাস্তায় রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ চলে। জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 'পিপলস্ ফ্রন্ট' গঠনের জন্য সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কাছে আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এই বিশ্বাসঘাতকতা নাৎজি পার্টি ও তার নেতা হিটলারের হাতকেই শক্তিশালী করে। বস্তুতঃ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিশ্বাসঘাতকতাই ফ্যাসিবাদের পথ প্রশস্ত করে।

১৯৩২ সালে জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া দখল করে। ১৯৩৫ সালে ফ্যাসিস্ত ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ ও দখল করে। ১৯৩৬ সালের ২০শে জুলাই নাৎজি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ত ইতালি স্পেনের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপ সংগঠিত করে, স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে স্পেনের নির্বাচিত সরকারের (যার মধ্যে কমিউনিস্টদের এক বিরাট ভূমিকা ছিল) পতন ঘটে এবং হিটলার ও মুসোলিনির সাহায্যপুষ্ট ফ্রাঙ্কো'র ফ্যাসিস্ত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৯৩৭ সালে জাপান উত্তর ও মধ্যচীন আক্রমণ করে, পিকিং ও সাংহাই দখল করে এবং বিদেশী প্রতিযোগীদের অধিকৃত অঞ্চল থেকে বিতাড়ন শুরু করে। ১৯৩৮ সালের শুরুতে জার্মানি (তখন জার্মানিতে হিটলারের পার্টি'র শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত) অস্ট্রিয়া দখল করে, ১৯৩৮ সালের শরৎকালে চেকোশ্লাভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল জার্মানির হাতে চলে যায়। ১৯৩৯ সালের শুরুতে হাইনান দ্বীপ দখল করে। ১৯৩৯ সালে পোলাণ্ডের উপর জার্মানি আক্রমণ চালায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিটলার কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। ১৯৩৮ সালের শেষে জাপান ক্যান্টন দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি ১৯৩২ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সালে।

ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি' ফ্যাসিবাদের ব্যাখ্যার জন্য এই সময়ে বক্তৃতা সংগঠিত করে পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই প্রসঙ্গে আমার রজনী পাম দত্ত'র 'ফ্যাসিবাদ ও সামাজিক বিপ্লব' পুস্তকের কথা মনে পড়ছে। এই পুস্তকে ফ্যাসিবাদের বিভিন্ন দিকের উপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা, ইণ্ডিয়া লীগ ও লণ্ডন মজলিসে সঙ্ঘবদ্ধ ভারতীয় ছাত্ররা ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি'র বিশ্লেষণের দ্বারা পরিচালিত হয়েছি।

তারপর '১৯৩৭ সালে মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক জর্জি ডিমিট্রভ তাঁর রিপোর্টে ফ্যাসিবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। অনেক আলোচনার পর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস সিদ্ধান্তে আসে, 'ফ্যাসিবাদ হলো অর্থ যোগানদার গোষ্ঠীর চরম সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব''।

হিটলার তার নাৎজিদলের নাম দিয়েছিল 'জাতীয় সমাজতন্ত্রী' (ন্যাশানাল সোস্যালিস্ট)।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞাই ছিল সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রচার আন্দোলনের নির্দেশিকা। নাৎজিবাদের দর্শন ছিল: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিকে যে হেয় করা হয়েছিল তার শোধ তুলতে হবে—জার্মানিকে মাথা তুলে দাঁড়াতে এবং সমগ্র বিশ্বকে পদানত করতে হবে। ইহুদি ও কমিউনিস্ট—উভয়ই দেশের চরম শত্রু, এদের নির্মূল করতে হবে।

দেশের যুবসমাজকে চাকুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠীগুলিকেও বলা হয়েছিল তারা নির্ভয়ে তাদের শোষণ চালিয়ে যেতে পারবে। উগ্র জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করে যুব সমাজের একটা বড় অংশকে নাৎজি পার্টি'র দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছিল। নাৎজিরা স্লোগান তুলেছিল জার্মানির হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে।

ফ্যাসিবাদ কী এবং কেন, ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের অগণিত মানুষের কী সর্বনাশ হবে—ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি' তার সীমিত সঙ্গতি নিয়েও পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা, সভা-বৈঠক প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণকে বোঝানোর জন্য অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে গেছে।

আমরা, ভারতীয় ছাত্ররা, ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রচারাভিযানের কাজ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম।

লণ্ডনে ওসওয়ালড মোজলের নেতৃত্বে একটি ফ্যাসিস্ত পার্টি' গঠিত হয়েছিল। এই পার্টি' কিছু মধ্যবিত্ত যুবককে আকৃষ্টও করেছিল। মোজলের পার্টি' নাৎজিদের মতাদর্শ প্রচার করতো। তবে এই পার্টি' ব্রিটেনের রাজনীতিতে একটি শক্তি হিসাবে গণ্য হতো না।

জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের বিজয় সম্পর্কে ১৯৩৪ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্তালিন বলেছিলেন: 'জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের বিজয়কে সোস্যাল ডেমোক্রাসির বিশ্বাসঘাতকতার দরুন শ্রমিক-শ্রেণীর দুর্বলতার লক্ষণ বলে গণ্য করলেই শুধু চলবেনা, একে বুর্জোয়াদের দুর্বলতা হিসাবেও গণ্য করতে হবে—বুর্জোয়ারা আর পুরাতন সংসদীয় পদ্ধতিতে শাসন পরিচালনায় সক্ষম নয় এবং ফলে তারা তাদের স্বরাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদী শাসনপদ্ধতির আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে, বুর্জোয়ারা শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তিতে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে সক্ষম নয় এবং তার ফলে তারা যুদ্ধ নীতির আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে।'

লণ্ডনে থাকাকালীন আমাদের অন্যতম একটি কাজ ছিল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কোন নেতা লণ্ডনে এলে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো। ১৯৩৬ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লণ্ডনে এলে তাঁকে আমরা সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম। নেহরুকে আমরা শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হিসাবেই নয়, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী হিসাবেও গণ্য করতাম। তখন স্পেনে গৃহযুদ্ধ চলছে। নেহরু স্পেনের বার্সিলোনাতে চলে গেলেন সাধারণতন্ত্র সরকারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের

নেহরু এবং সুভাষ বোসের উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে দ্বারকানাথ কোটনিসের নেতৃত্বে চীনে 'কংগ্রেস মেডিকেল মিশন' পাঠানো হয়।

স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি'র নেত্রী ডোলোরেস ইবারুরী (যিনি লা পাসিওনারা বলে পরিচিতা) স্পেনে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন জনমত সংগ্রহের জন্য প্যারীতে এসেছিলেন। তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য যে সভার আয়োজন করা হয়েছিল তাতে পণ্ডিত নেহরু উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ফরাসি সরকারের এক আদেশ অনুযায়ী তিনি কোন কিছু বলার সুযোগ পাননি। স্পেনের সংগ্রামী সরকারের প্রতি সহানুভূতির প্রতীক হিসাবে নেহরু লা পাসিওনারার হাতে একটি পুষ্পস্তবক তুলে দেন।

ফ্যাসিস্ত ইতালি এবং নাৎজি জার্মানির সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট ফ্রাঙ্কোর আগ্রাসী আক্রমণের হাত থেকে স্পেনের সাধারণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভূত সাহায্য করেছে। কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির মতো ধনবাদী সরকারগুলির কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি। এই প্রসঙ্গে আমরা সাধারণতন্ত্রী স্পেনকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক ব্রিগেড পাঠানোর ঘটনা স্মরণ করছি। কডওয়েল, র‍্যাল ফ্ ফক্স প্রমুখ নবীন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীগণ আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে যোগদান করেন এবং এঁদের অনেকে স্পেনে জীবন বিসর্জন দেন। এই ঘটনা আমাদের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচারভিযানে আরও অনুপ্রেরণা যোগায়।

১৯৩৮ সালে সুভাষ বোস লণ্ডনে এলে তাঁকে আমরা সংবর্ধনা জানাই। বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি'র অন্যতম বিশিষ্ট নেতা আর পাম দত্ত তাঁর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনাকালে সুভাষ বোস তাঁর অভিমত খোলাখুলি ব্যক্ত করেন। এই বিশেষ সাক্ষাৎকারের পূর্ণ রিপোর্ট পরের দিন 'ডেইলি ওয়ার্কার'-এ (কমিউনিস্ট পার্টি'র মুখপত্র— যার পরে 'মর্নিং স্টার' নামকরণ করা হয়) প্রকাশিত হয়।

কমিউনিস্ট পার্টি' ছাড়াও বৃটেনের লেবার পার্টি'র একাংশও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ছিলেন। উদাহরণ হিসাবে অধ্যাপক হ্যারলড্ লাস্কির নাম উল্লেখ করা যায়। অধ্যাপক লাস্কির বিভিন্ন বক্তৃতা, পুস্তক ইত্যাদি বুদ্ধিজীবীদের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আকৃষ্ট করে। লেবার পার্টি'র এই অংশ গুরুত্ব দিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরাও বক্তৃতা শোনার জন্য যেতুম। লাস্কির বক্তৃতায় তাঁকে

বলতে শোনা গেছে, এখনও সময় আছে, ফ্যাসিস্ত আক্রমণ ঠেকাতে হবে। তখন চেম্বারলেনের নেতৃত্বে গঠিত রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ হিটলার সম্পর্কে তোষণের নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। এঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, হিটলার অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নই আক্রমণ করবে। এঁদের ধারণা অনুযায়ী জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ বাধবে এবং তাতে দুই শত্রুই খতম হবে; এটা হলে তাঁদেরই সুবিধা হবে। অতএব তাঁরা কোনও পক্ষের সাথে জড়িত না থাকার নীতিই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। এটাই তাঁদের নৈতিকতা। স্তালিন এই নৈতিকতার যোগ্য উত্তর দিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চ স্তালিন বলেন:

"যারা মানবিক নৈতিকতার কোন স্বীকৃতি দেয় না তাদের কাছে নৈতিকতা প্রচার করা বোকামির কাজ হবে। পুরাতন ঝানু কুটনীতিকগণ বলেন, রাজনীতি রাজনীতিই। তবে এটা স্মরণ রাখতে হবে, যারা হস্তক্ষেপের নীতির সমর্থক তারা এক বড় ও বিপজ্জনক খেলা খেলছেন যা তাদের জন্য গুরুতর ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।" (স্তালিন: সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি'র অষ্টাদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট)। বলাই বাহুল্য স্তালিনের এই হুঁশিয়ারি পরবর্তীকালে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

চেম্বারলেন মিউনিখে গিয়ে হিটলারের সাথে এক চুক্তি করে এলেন। ফিরে এসে তিনি বৃটেনের অধিবাসীদের বললেন: 'আমি আমাদের সময়কার শান্তি এনেছি।'

লণ্ডনের সমস্ত রাস্তায় চেম্বারলেনের ছবি দেখা গেল। তাতে লেখা আছে: "ওঁকে দেখুন, ওঁর কথা শুনুন, ওঁকে প্রেরণা দিন"।

ব্রিটিশ জনমতের চাপে চেম্বারলেন অবশেষে ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। আমরা খবরের জন্য পার্লামেন্ট হাউসে গেলাম। দেখা গেল বহু মানুষ গীর্জার দিকে ছুটছেন।

আমাদের কাছে একটা বিষয় স্বচ্ছ হয়ে উঠল যে বৃটেনের যুদ্ধ প্রস্তুতি ছিল না, কারণ বৃটিশ সরকার ধরেই নিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নই হিটলারের লক্ষ্যবস্তু।

অবশেষে চেম্বারলেনের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করল এবং চার্চিলের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। তখন যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যবস্থা কিছুটা জোরদার হলো।

আমি ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে জাহাজে ভারতে ফিরে এলাম। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে নাৎজি বিমানবাহিনী লণ্ডনের উপর বোমা বর্ষণ শুরু করে; তখন অবশ্য আমি ভারতে পৌঁছে গেছি।

ভারতে ফিরে আমি পার্টি'র সাথে যোগাযোগ করি। পার্টি'র নির্দেশ অনুযায়ী আমি কাজে লেগে যাই।

১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলারের সেনাবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। এই কাহিনীতে আসার আগে ১৯:৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জার্মানির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ সে সময় অনেকে এই চুক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আমাদের মধ্যে কোন প্রশ্ন ছিল না। আমরা তখন বলেছিলাম সোভিয়েত ইউনিয়ন সঠিক কাজই করেছে।

স্তালিন জানতেন, হিটলার কোন না কোনদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবেই। এই অনাক্রমণ চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই কৌশল যে কত সঠিক ছিল তা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলো। প্রথমদিকে জার্মান বাহিনী বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল। তখন আমাদের পার্টি'র অনেক সমর্থকও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, সোভিয়েত প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। তবে আমাদের সে আশঙ্কা ছিল না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করা যাবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর যুদ্ধের চরিত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটল—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হলো। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যেও কেউ কেউ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তবে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নও ছিল। "ভারত ছাড়" আন্দোলনে বহু নেতা ও কর্মীকে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকগণ কারাবদ্ধ করেছিল। বন্দীমুক্তির দাবিতে আমাদের পার্টি' আন্দোলন করেছে। আমাদের পার্টি' তখন বড় ছিল না। আমাদের সীমিত শক্তি নিয়েও আমরা সারা দেশে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন এবং বন্দীমুক্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম।

আন্দামানে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের অনেকে কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। তাঁরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সংকল্প ঘোষণা করে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। বৃটিশ সরকার সেই বিবৃতি লক্ষ লক্ষ কপি ছাপিয়ে বিলি করেছিল, কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়নি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর পার্টি'র নির্দেশে আমরা কলকাতায় "সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি" গঠন করি। সমিতির অফিস ছিল কলকাতার ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটের চারতলায়। আমি ছিলাম সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির প্রথম সম্পাদক। সমিতির মুখপত্রের নাম ছিল "ইন্দো-সোভিয়েত জার্নাল"।

তখন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসুস্থ। একদিন অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী ও আমি রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করতে যাই। কবির সচিব এ কে চন্দ আমাদের জানালেন: দেখা হবে না; কারণ যুদ্ধের খবরে কবি অত্যন্ত বিচলিত—ডাক্তাররা দেখা করতে বারণ করে দিয়েছেন।

সচিব আমাদের বললেন: এর আগে অপর কয়েকজন এসেছিলেন। তাঁদের কবি বলেছেন: "খুবই চিন্তার বিষয়, তবে তাঁর আশা, সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজিত হবে না।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠির কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। তিনি ৩০ দশকের গোড়াতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে গিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি তীর্থ দর্শনে এসেছেন। অবশ্যই অপর কয়েকটি বিষয়ে তাঁর প্রশ্নও ছিল।

জাপানি কবি নোগুচির কাছে প্রেরিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন।

আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করে আমার প্রবন্ধ শেষ করবো। লালফৌজ যেদিন বার্লিনকে নাৎজি জার্মানির হাত থেকে মুক্ত করলো সেদিন কলকাতায় আমাদের পার্টি'র উদ্যোগে শ্রমিক-কৃষক এবং মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষের এক বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল সংগঠিত করা হয় এবং এই মিছিল কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। আমার ধারণা ঐ মিছিলে অন্ততঃ ৫০ সহস্রাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হীরেন মুখার্জী

ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন ও এদেশের বুদ্ধিজীবীরা

১৯৪১ সালের ২২ জুনের ঘটনার কথা ভাবা কারোর পক্ষেই খুব কষ্টকর নয়। অনেক ভারতীয়র হৃদয়েই সেদিনের স্মৃতি আশ্চর্যভাবে খোদাই হয়ে আছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই সেই আনন্দময় দিনটির কথা আজও মনে করতে পারবেন যেদিন খবর এলো, হিটলারী অপশাসনের দিন শেষ হয়েছে। সন্দেহ নেই, ব্যাপারটা ছিল খুবই উৎকণ্ঠার। কারণ, হিটলারের ছিল চমকে দেবার মতো কিছু সুযোগ, এক বিশাল সুশিক্ষিত সেনা বাহিনীর বিপুল শক্তি। কিন্তু একই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের যাঁরা বন্ধু তাঁদের মনে এই আশাও ছিল, তাঁরা একথা জানতেন, সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী শক্তি কতখানি, তাব জয়ের সম্ভাবনা কত প্রবল। যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকে বারবার বলেছেন সোভিয়েতরা কখনই, কখনই হারতে পারে না।

হিটলারের বিশ্বাসঘাতকতার খবর এসে পৌঁছোনো মাত্র ক'লকাতায় আমাদের পরিচিত কয়েকজন একজায়গায় মিলিত হলাম। খবরটি শোনামাত্র ক্রোধে জ্বলে উঠলেন রাধারমণ মিত্র। রাধারমণ মিত্র হলেন মীরাট ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক। খবরটা শুনেই তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, সোভিয়েতকে হার স্বীকার করতে দেওয়া চলবে না, আর তা হ'লে ভারতের মুক্তিই বা আসবে কোন পথে? ওই দিনই আমরা ফ্রেণ্ডস অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংগঠনিক কমিটি তৈরি করে ফেললাম। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। এই ভূপেন্দ্রনাথের অন্য পরিচয়, তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাই। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। শুধু তাই নয়, মার্কসবাদী চিন্তাভাবনা এবং মার্কসীয় দর্শন অধ্যয়নের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। লেনিনের জীবদ্দশায় ভূপেন্দ্রনাথ মস্কোতে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছেও আমরা আবেদন রেখেছিলাম, আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য। তাঁর আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা ছাড়া কোন মহৎ কাজ সাধিত হতে পারে না। তিনি তখন শারীরিক ভাবে খুবই অসুস্থ, তা সত্ত্বেও তিনি সানন্দে ফ্রেণ্ডস অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন বা এফ এস ইউ-এর পৃষ্ঠপোষক হতে রাজী হলেন। জওহরলাল নেহরুর ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়ার পাঠকমাত্র নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারেন, সেখানে মৃত্যুশয্যায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের বার্তার উল্লেখ রয়েছে। সেখানে তিনি 'অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্যকে কঠোর ভাবে মোকাবিলা করে, বিশাল এক মহাদেশের কবল থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত' সোভিয়েতের বিজয়ের কথা বলেছেন। সোভিয়েতের সফলতায় তিনি বলেছেন, 'এত দ্রুত এবং বিস্ময়কর অগ্রগতি একই সঙ্গে আমাকে আনন্দিত এবং ঈর্ষান্বিত করে তুলেছে।' সেইসঙ্গে উল্লেখ করেছেন 'শোষণের ওপর ভিত্তি' করে গড়ে ওঠা ভারতীয় প্রশাসন এবং ইউ এস এস আর-এর 'সহযোগিতামূলক' ব্যবস্থার মূল পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার একটি নতুন দিক আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম যখন তিনি আমাদের সতর্ক করে দিলেন। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে আমাদের সাবধান করে দিয়ে তিনি বললেন, যদিও অ্যাংলো-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তবু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কৌশলে তার কাজ চালিয়ে যাবে এবং তাকে কখনই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

যুদ্ধকালীন প্রতিকূল পরিস্থিতেতে কিন্তু সারা ভারতের প্রগতিশীল চিন্তাসম্পন্ন মানুষের মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজনহয়ে পড়েছিল। লেখক শিল্পীএবং বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিলঅভাবনীয় সমর্থন। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভি (বম্বে ক্রনিকল) এবং সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (আনন্দ বাজার পত্রিকা)-এর প্রবন্ধ প্রকাশ করে আমাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। তারা নিয়মিত সোভিয়েত জীবন ও অগ্রগতির পরিচয় সমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। শ্রমিক-কৃষক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদরাও স্বেচ্ছায় আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ইউ এস এস আর-এর সঙ্গে যুদ্ধকালীন চুক্তি সত্ত্বেও ভারতের বৃটিশ সরকার এফ এস ইউ সম্বন্ধেও সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা আঁচ করেছিলেন এই 'ফ্রন্ট' আসলে বেআইনী ঘোষিত কমিউনিষ্ট পার্টি'রই ভিন্ন সংস্করণ। তাঁরা এই ফ্রন্টের সমর্থক এবং সক্রিয় কর্মীদের ওপর চালিয়েছিলেন অকথ্য অত্যাচার। বিভিন্ন ভাবে তাঁদের অপদস্থ করা হতো, যখন-তখন তাঁদের

বাড়িঘর তল্লাশী চালানো হতো, নষ্ট করে ফেলা হতো সমস্ত 'প্রগতিশীল' বইপত্র এবং কখনো কখনো এদের গ্রেপ্তারও করা হতো। অবশ্য এই ধরণের শোষণ বা অত্যাচারের যে বিশেষ ফল হয়েছিল এমন নয়, ভয় পেয়েছিল তারাই যারা আগে থেকেই ভয়ে পিছিয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সরোজিনী নাইডু, যিনি তাঁর কবিতার জন্য ভারতের নাইটিঙ্গল নামে পরিচিত হয়েছিলেন, এঁদের মতো মহান ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে এফ এস ইউ একটি প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র পেয়েছিল।

হিটলারের আক্রমণের কয়েকদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ইস্তাহার। এই ইস্তাহারে প্রায় একশো জন শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবী তাঁদের সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন। বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কেউই বাদ ছিলেন না। এঁদের নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত রসায়নবিদ পি সি রায়। এতে ইউ এস এস আর-এর প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন প্রকাশ করা হয়েছিল। তাঁদের বিস্ময়কর কীর্তিকে 'মানব ইতিহাসে নজীরহীন' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং 'পরাধীন ও অসহায়-প্রায় একটি দেশের পক্ষ থেকে' তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়েছিল। প্রার্থনা জানানো হয়েছিল, সোভিয়েতে ইউনিয়ন একদিন অত্যাচারীকে পরাজিত করে বিজয় পতাকা ওড়াতে পারবে। এই ইস্তাহার সংগঠিত ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল, তাদের প্রথম সারিতে নিয়ে এসেছিল। ১৯৪১ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর একের পর এক ছাত্র সম্মেলন হতে থাকলো। বাংলা, অন্ধ্র, পাঞ্জাব, বোম্বাই এবং আরো নানা জায়গায় সম্মেলনে সকলেই সোভিয়েত জনগণের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন। সোভিয়েত সংগ্রহশালার নানা কাগজপত্র ঘেঁটে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গেছে, ১৯৪১ সালের ২৬ জুন সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক ফারুকি লণ্ডনের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মাইস্কির কাছে এক তারবার্তাও পাঠিয়েছিলেন। আন্দোলনের মুখপত্র 'দ্য স্টুডেন্ট'-এর আগষ্ট সংখ্যায় বলা হয়েছিল, 'আমাদের শ্লোগান—ফ্যাসিবাদ স্বাধীনতা শান্তি ও প্রগতির শত্রু।' ওই সংখ্যাতেই বাংলার বুদ্ধিজীবীদের কাছে স্বাধীনতা প্রগতি এবং মানবতার আশার মূল কেন্দ্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করার আহ্বানকে সমর্থন জানানো হয়েছিল। একই ভাবে সমর্থন জানিয়েছিল সারা ভারত কিষাণ সভা এবং এ আই টি ইউ সি-এর নেতৃত্বাধীন অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন।

এফ এস ইউ-এর সাংগঠনিক কমিটি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মিটিং, বিক্ষোভ সমাবেশ (যেখানে যেখানে সম্ভব), ঘরোয়া বৈঠক ও আলোচনা চক্র, বই এবং প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ, ছবি ও চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন জননেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। বেশ কিছু সময় পর এবং নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে মস্কোর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছিল। এফ এস ইউ-এর ক'লকাতা অফিস, ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীট (এখন, যুক্তিযুক্ত ভাবেই যার নতুন নাম হয়েছে লেনিন সরনী) সেই সময়ে হয়ে উঠেছিল শহরের সব থেকে বেশি পরিচিত প্রগতিশীল সম্মেলন। নানা কষ্টকর এবং পরিশ্রম-সাধ্য সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কিছুদিন পরে সুন্দর সুন্দর প্রদর্শনীর উপযুক্ত ছবি, সাহিত্য প্রকাশনা (এবং পরে ১৬ এবং ৩৫ মিলিমিটারের ফিল্ম) সোভিয়েত থেকে আসতে শুরু করে। আমাদের কাছে VOKS হয়ে উঠল ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাদের বুলেটিনগুলির জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করতাম। প্রথম দিকে, এই বুলেটিনগুলিকে সাইক্লোস্টাইল করা হতো। ভারতীয় বৃটিশ পুলিশের কাছে এইসব বুলেটিন রাখা অবশ্যই অপরাধ বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু আমাদের দেশপ্রেমিকেরা ভালোমন্দ যে কোনো পরিস্থিতিতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু হবার জন্য আগ্রহী ছিলেন এবং তার জন্য যে কোনোরকম ঝুঁকি নিতেও তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। সোভিয়েত জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে খুব ঘন ঘন অনেক প্যামফ্লেট সে-সময়ে বেরোতো। ১৯৪১ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে কলকাতায় দুটি প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয়। একটি ইংরাজীতে দ্য ল্যাণ্ড অব সোভিয়েতস এবং অন্যটি বাংলায়, সোভিয়েত দেশ। মলাটে ছিল, লাল ফৌজের অন্যতম যোদ্ধা দ্মিত্রি শাপলিনের ভাস্কর মূর্তি। জওহরলাল নেহরু তখন ছিলেন জেলে। তাঁকে বই দু'টি পাঠানো হয়েছিল। পরে তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন, বই দু'টি তাঁর ভালো লেগেছে। ইংরাজীতে একটি নিয়মিত পাক্ষিক বেরোতো, নাম ইন্দো-সোভিয়েত জার্নাল। প্রথম কয়েকমাস পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন এস কে আচার্য, পরে সে দায়িত্ব আমার হাতে আসে। তিন বছর ধরে পত্রিকাটি একটানা প্রকাশিত হয়েছিল, ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত, পরে এটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বোম্বাইতে। কারণ, এফ এস ইউ-এর সদর দপ্তরও সেখানেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সোভিয়েত জনগণের চিন্তাভাবনা ধরা পড়ে বা যুদ্ধের উত্থান-পতনের খবর পাওয়া যায় অথবা

সোভিয়েত সভ্যতার ভিত্তি সম্পর্কে জানা যায় এমন সমস্ত কিছু সোভিয়েত খবরাখবর বা লেখাঝোকা আমরা ওই পত্রিকায় ব্যবহার করতাম। অবশ্য যেগুলো সে সময়ে পাওয়া সম্ভব হতো।

এফ এস ইউ-এর গোড়ার দিনগুলোতে প্রকাশনা ছড়িয়ে পড়েছিল অন্ধ্র, কেরল, বাংলা এবং পাঞ্জাবে। তেলুগুতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একাধিক পুস্তিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল, নিঃসন্দেহে যা খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই কাজকে ভীষণভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল প্রগতিশীল লেখকদের আন্দোলন (১৯৩৬ সালে যার সূচনা), যা আজও প্রেরণার উৎস স্থল। এই আন্দোলন ছিল এফ এস ইউ-এর মস্তো বড়ো সাথী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেমচাঁদ এবং ভাল্লাথোলের মতো ভারতীয় সাহিত্যের দিকপালরা আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। সক্রিয়ভাবে কাজে নেমেছিলেন সুমিত্রানন্দন পন্থ এবং যশপাল, মাজাজ এবং কৃষণ চন্দর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে ও তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, আন্নাভাউ শাঠে ও শ্রীশ্রী এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের এই আন্দোলন (যাকে আমরা দ্বিধাহীন ভাবেই ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন বলে চিহ্নিত করতে পারি) খুব শীগ্‌গিরই তার সাথী হিসেবে পেল উৎসাহী ইণ্ডিয়ান পিপলস থিয়েটারকে (আই পি টি এ তৈরি হয়েছিল ১৯৪৩ সালের মে মাসে)। আই পি টি এ সাধারণ মানুষের মধ্যে আনল একটা জোয়ার, সোভিয়েত অভিজ্ঞতার মধ্যে পেল অফুরন্ত সম্পদ। আর তাই নিয়েই যোগ দিল স্বাধীনতার যুদ্ধে।

১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। কলকাতায় তাঁর শেষকৃত্যে সেদিন যোগ দিয়েছিলেন অগণিত মানুষ। যাঁরা সেদিন তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এফ এস ইউ-ও ছিল। এফ এস ইউ-এর পক্ষ থেকে ফুলের স্তবকে ফুল দিয়ে কয়েকটি কথা লিখে রবীন্দ্রনাথকে তা নিবেদন করা হয়েছিল। সেখানে লেখা হয়েছিল, "বিশ্বের মহান ব্যক্তিত্বের অন্যতম, ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যায় অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে যিনি গর্জে উঠেছিলেন, গর্জে উঠেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ভারতও আজ যে সাম্রাজ্যবাদের শিকার, সেই রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণে ফ্রেণ্ডস অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন গভীর শোকাহত। আর সেই সঙ্গে আমরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করছি আনন্দমুখর নতুন বিশ্বের জন্য তাঁর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদের কথা। সোভিয়েতের দিকে তাকিয়ে তিনি

বলেছিলেন, সোভিয়েত সেই সব জীবনের পথ দেখাচ্ছে।" বে-আইনী ঘোষিত ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি এবং তাদের মুখপত্র "কম্যুনিস্ট"-এর পক্ষ থেকেও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ পাঠানো হয়েছিল (ভল্যুম ৩, নম্বর ৬, আগস্ট ১৯৪১)। বে-আইনী ঘোষণাকে উপেক্ষা করেই তখন 'কম্যুনিস্ট' প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটিতে একটি শোকসংবাদ ছাপা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, 'যেদিন রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন, আমাদের দেশের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, শুধু সেদিনকার জন্য নয়, আগামী দিনের জন্যও বিশ্বের ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নিল। তাঁর সাম্প্রতিক কার্যাবলীর মধ্যে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে গঠিত ফ্রেণ্ডস অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষক হতে রাজী হওয়ার কথা উল্লেখ করা যায়।' (১০ মে, ১৯৭৪-এর বাংলা সাপ্তাহিক 'সপ্তাহ' পত্রিকায় চিন্মোহন সেহানবীশের লেখা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী খুব শিগগিরই সত্য প্রমাণিত হল। লাল ফৌজ যখন দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ছে, যখন বিশ্ববাসীর প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে এই লাল ফৌজ, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ বেতার যন্ত্রে কান লাগিয়ে বসে আছেন, উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছেন সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ ইস্টার্ন ফ্রন্টে কি ঘটে চলেছে জানার জন্য, যখন সোভিয়েতের জয়ের পথে এক পা অগ্রসর হওয়ার অর্থ স্বাধীনতা ও অগ্রগতির পথে এক ধাপ এগোনো, যখন তাদের এক হাত পিছিয়ে আসা মানেই ফ্যাসিবাদ-জনিত বিপদকে আরো প্রকট করে তোলা, যখন জনমতের চাপে পড়ে বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েতের সঙ্গে মৈত্রী করতে বাধ্য হয়েছে, তখন হ্যারি ট্রুম্যান (যিনি পরবর্তীকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন) একটি বিশাল জনসমাবেশে জোর গলায় ঘোষণা করলেন, "যদি আমরা দেখি রাশিয়া জয় লাভ করছে তবে আমাদের জর্মনকে সাহায্য করতে হবে, আর যদি জর্মনরা রাশিয়াকে হারিয়ে দিতে শুরু করে তবে আমাদের রাশিয়ার পক্ষ নিতে হবে। আর সেদিক থেকে তাদের পরস্পরকে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধে যতটা সম্ভব মরতে দেওয়াই ভালো।" ভাগ্যক্রমে অনেক আগেই লেনিনের তীক্ষ্ণ ও সজাগ বুদ্ধি সোভিয়েতদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, 'যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ওপর আক্রমণ বা আগ্রাসন নেমে আসতে পারে' এবং "মনে রাখতে হবে চারপাশে আমাদের ঘিরে রয়েছেন জনসাধারণ, বিভিন্ন শ্রেণী এবং সরকার,

যে খোলাখুলিভাবেই আমাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে।" বিশ্ববাসীর পক্ষেই মঙ্গলজনক ঘটনা এই যে সোভিয়েতের শক্তি ও সাহসের ভিত্তি কখনও একটুও কেঁপে ওঠে নি। এর রহস্য কোথায় লুকিয়ে আছে সে কথা আজ আমরা বুঝতে পারছি। কারণ, নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির 'হাউ দ্য স্টীল ওয়াজ টেম্পারড' এবং পরবর্তীকালে শোলোখভ ও যুদ্ধকালীন সোভিয়েতের উৎসাহপূর্ণ সাহিত্য আজ একটু একটু করে ভারতীয় পাঠকের কাছেও পরিচিত হতে শুরু করেছে।

ভারতবর্ষেও এরকম ফাঁকা আওয়াজের নেতার অভাব ছিলো না। অনেকেই শুনেছেন, হিটলারের সেই গা-কাঁপানো ভবিষ্যৎবাণী, সোভিয়েতকে ধ্বংস করা তো কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার। ফ্রান্সই যদি বারো দিনের মধ্যে পরাজিত হয় তাহলে সোভিয়েতই বা কতদিন বেঁচে থাকতে পারে?

হিটলার যে বিশ্বজয়ের দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন, সেকথা আজ আমরা জানতে পারছি। তাঁর পরিকল্পনা ছিল কয়েক মাসের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে কবলিত করে ইরাণ-ইরাক এবং ভারতের দিকে হাত বাড়ানো। এদেশের প্রায় সর্বত্রই এমন কি প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখেও একথা শোনা গিয়েছিল, কারণ বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে চায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জর্মনী পরস্পর মারামারি করে মরুক এবং পৃথিবী আবার পুরনো সাম্রাজ্যবাদীদের করতলগত হোক এটা কারোর কাছেই পরিস্কার হতে বাকি ছিল না। কিন্তু ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্যভাবেই লেখা হচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিককার কথাটা একবার ভালো করে ভেবে দেখুন। ১৯৪১-এর মস্কোর যুদ্ধের কথা। এক বিরাট ধাক্কার মুখে প্রতিরোধকে আপাতভাবে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল। নাৎজী জেনারেলরা চোখে বায়নাকুলার লাগিয়ে মস্কোকে দেখছিল আর ভাবছিল কতদিনে তা দখল করবে। অন্যদিকে অগণিত দেশপ্রেমিক যোদ্ধার অতি মানবিক প্রতিরোধ, সমাজতন্ত্রের রাজধানীকে রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং তারপর ফ্যাসিস্তদের ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ। যেমন বলা যায়, কয়েক ডজন নাৎজী ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার জন্য পানফিলভ লিজেনড্রি ডিভিশনের ২৮ জন রুশ সেনা জীবন দিয়েছিল। হিটলার ৪ লক্ষ সৈন্য হারালেন, সেইসঙ্গে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। হিটলার সেই প্রথম অনুভব করলেন পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ। সেই সময়ে হিন্দি কবি শিবমঙ্গল সিং-এর লালফৌজকে নিবেদিত সেই কবিতার কথা নিশ্চয়ই অনেকেরই মনে পড়বে। শিবমঙ্গল লিখেছিলেন, "...দশ সপ্তাহ

পরিণত হবে দশ বছরে, মস্কো থাকবে বহু দূর!" আমাদের মনে পড়ে, তখন কলকাতায় দেখা স্বল্প দৈর্ঘের কিছু সোভিয়েত ছবি, সম্ভবত ১৯৪২-এর গোড়ার দিকে, মস্কো যুদ্ধের ওপর তোলা, শত্রুপক্ষের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ব্যানার, নাৎজী যুদ্ধবন্দীদের দল, ফ্যাসিস্তদের দাপাদাপির পর রাস্তাঘাট ঠিকঠাক করা। আমাদের মধ্যে তখন একটা জিনিস কাজ করছিল, তাহলো সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে একাত্মভাবোধ। বিশেষ করে স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধের সময় সারা বিশ্ব রুদ্ধশ্বাসে যার দিকে তাকিয়েছিল। এই অনুভব থেকেই মানুষের মধ্যে প্রশ্ন এসেছিল, ১৯৪১-এর শেষ দিক থেকে এফ এস ইউ যাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ঃ ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্টের কি হলো? বৃটেন এবং আমেরিকা একে কতদিন দূরে সরিয়ে রাখবে?

১৯৪১-এর গ্রীষ্মকালে এফ এস ইউ পেল ব্যাপক গণসমর্থন। বিশেষ করে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সি ভি রমন, মেঘনাদ সাহা, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবং কে পি চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। এমন ঘটনাও অজস্রবার ঘটেছে যখন যামিনী রায়ের মতো ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতি বন্ধুত্বের প্রকাশ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। দেশের নানা জায়গায় এফ এস ইউ-এর নানা সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষর নিয়ে ইস্তাহার বিলি করা হয়েছে। কিছুদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯৪২-এর জানুয়ারীতে জওহরলাল নেহরু কিছু সময়ের জন্য কলকাতায় ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে ছিলেন। এফ এস ইউ-এর প্রতিনিধিরা সেই সময়ে তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং নেহরু তাঁদের আন্দোলনকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। মতপার্থক্য থাকা সত্বেও কংগ্রেস নেতা জে সি গুপ্ত বা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো অন্যান্য দলের নেতারা এফ এস ইউ-এর বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। ১৯৪১-এর জানুয়ারিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে সমর্থন ও অভিনন্দন জানিয়ে একটি বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। শুধু যে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক বা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাই সোভিয়েতের সমর্থনে তখন এগিয়ে এসেছিল তাই নয়, ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনগুলিও নিয়েছিল একই ভূমিকা।

১৯৪২-এর জুলাই-আগস্ট নাগাদ কলকাতায় এফ এস ইউ-এর একটি

সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মিঞা ইফতিকার উদ-দিন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী এবং তখন পাঞ্জাব রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি। স্বাধীনতার কিছুদিন পর তাঁর অকাল মৃত্যু এই উপমহাদেশের পক্ষেই এক মস্তো ক্ষতি। সম্মেলনে সারা ভারত কিষাণ আন্দোলনের তরুণ নেতা জগজিৎ সিংকে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। আমি হয়েছিলাম সংযুক্ত সম্পাদক, বিশেষ দায়িত্ব ছিল ইন্দো-সোভিয়েত জার্নাল-কে নিয়মিত প্রকাশ করা। দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য, বিশেষ করে ১৯৪২-এর ৯ আগস্টের আন্দোলনের পর (গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়' স্লোগানের ভিত্তিতে) এবং সরকারের অহিংস দমন নীতির জন্য এফ এস ইউ-এর পূর্ণাঙ্গ সর্বভারতীয় সম্মেলন কিছুটা পিছিয়ে যায় এবং বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৪-এর এপ্রিলে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সেই সম্মেলনে সভানেত্রী হয়েছিলেন। অংশগ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, এন এফ যোশী (বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা), এস এ ব্রেলভি, খাজা আহমদ আব্বাস এবং আরও অনেকে। সেই সম্মেলনের পর বেশ কয়েক মাস ধরে কাজ চলেছিল পুরোদমে। এই সময়ে দ্য স্টুডেন্ট পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছিল (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫১), পুরোপুরি সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে সোভিয়েত নারীসমাজকে নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন তাতে।

লিওনিদ মিত্রোখিনের সাম্প্রতিক একটি লেখা থেকে জানা যাচ্ছে ১৯৪৩-এর ৬ জানুয়ারি তারিখে এফ এস ইউ-এর শ্রীনগর শাখা কাশ্মীরের জনগণের পক্ষ থেকে সোভিয়েতকে একটি শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিল। এই শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডি পি ধর। সোভিয়েত সংগ্রহশালায় রয়েছে এরকম অজস্র চিঠি ও বার্তা, যা সেই যুদ্ধের দিনে ভারত থেকে পাঠানো হয়েছিল নানা বাধা বিপত্তির ভেতর, মূলত কাবুলের মধ্যে দিয়ে।

বোম্বাই সম্মেলনের আগে কলকাতায় এফ এস ইউ-এর একটি রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৪-এর ২১ থেকে ২৩ এপ্রিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অংশগ্রহণ করেছিলেন লেখক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, মঞ্চশিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, আইনবিদ ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা। দু'শরও বেশি মানুষ। একটি ইস্তাহারও প্রকাশ করা হয়েছিল। ইস্তাহারে সোভিয়েত জনগণের নৈতিক ও পার্থিব অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, তারা এখন পুরো ছকটাই ঘুরিয়ে দিয়েছেন ফ্যাসিস্ত আক্রমণ-

কারীদের দিকে এবং আজ তাঁরা গোটা পৃথিবীর বিস্ময়। এই সাফল্যের কারণ হিসেবে ইস্তাহারে বলা হয়েছিল, সোভিয়েত নাগরিকরা আজ জানেন যে দেশের মালিকানায় আজ তাঁরাও অংশীদার এবং একটি পূর্ণাঙ্গ কমনওয়েলথ তারা গড়ে তুলেছেন যা এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও হয়নি। ঐতিহাসিক কারণেই এই দলিল হলো এক অমূল্য সম্পদ।

ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েতের প্রতি এদেশের সমর্থন যে কিরকম ছিল তা বোঝা যায় ১৯৪২-এর আগস্টের কংগ্রেস প্রস্তাবে, যেখানে ইংরেজকে 'ভারত ছাড়' নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। বৃটেন তখন সোভিয়েতের সহযোগী। তা সত্বেও দেওয়া হয়েছিল এই গুরুত্ব দিয়েই যে রাশিয়ার প্রতিরোধকে বিপন্ন করা যাবে না। স্বাধীনতা রক্ষা করতেই হবে। এই ঘটনা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ১৯৪৭-এর গোড়ার এফ এস ইউ-এর রাজ্য সম্মেলনে। সেখানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বড় ভাই। শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে অনেক কথা বলেছিলাম তখন। বিশেষ করে সোভিয়েতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা জানতে। বলা বাহুল্য, সেই সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনেক বক্তব্যকেই অদ্ভুতভাবে বিকৃত করা হয়েছিল। অথচ নেতাজী বারবারই সোভিয়েতের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বলেছেন।

চিত্ত বসু

ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও ভারত

॥ এক ॥

ফ্যাসিবাদ সংকটাকীর্ণ পুঁজিবাদের গর্ভ থেকেই জন্ম নেয়। সাম্রাজ্যবাদ আর ফ্যাসিবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণভাবে বৈরীমূলক নয়—অবৈরীমূলক। কারণ উভয়ের মধ্যেকার বিরোধ যা ফুটে ওঠে,তা নিষ্পত্তিযোগ্য। কোন মতেই নিষ্পত্তি-হীন নয়। কারণ উভয়ের মধ্যে জন্ম সূত্রে সাদৃশ্য রয়েছে। সাদৃশ্যগুলো মূলতঃ জন্মজ। কাজেই পরিদৃশ্যমান বিরোধ বা বিরোধগুলি স্থায়ী নয়, অস্থায়ী; নিষ্পত্তিযোগ্যহীন নয়, নিষ্পত্তিযোগ্য। কিন্তু পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের মধ্যে বিরোধ বৈরীমূলক এবং নিষ্পত্তিযোগ্যহীন। একের ধ্বংসে অপরের অস্তিত্ব। তেমনি জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে যে বিরোধ তাও বৈরী-মূলক; একের জয় অপরের পরাজয়। আবার অনুরূপ যুক্তিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যেকার বিরোধ বৈরীমূলক এবং নিষ্পত্তিযোগ্য নয়। কারণ একের জয়ে অপরের পরাজয় সূচিত হয়।

ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বিশ্লেষণই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। প্রথম মহা-যুদ্ধের সূচনা পর্ব থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অবধি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল থেকে আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ঘটনাপুঞ্জের দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যা এই সত্যকেই উদ্ভাসিত করে।

॥ দুই ॥

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ হয় পৃথিবীর উপনিবেশগুলির মানচিত্রের পরিবর্তন করে। বনেদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যুদ্ধজয়ের মধ্যে দিয়ে অপেক্ষাকৃত উদীয়-মান এবং দুর্বলতর সাম্রাজ্যবাদী-দেশগুলির হাত থেকে অনেক উপনিবেশ কেড়ে

নেয় এবং তাদের (বনেদী সাম্রাজ্যবাদীরা) আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। পৃথিবীর এক বিশাল অংশই তাদের পদানত হয়ে যায়। ভার্সাই চুক্তিই তার সাক্ষী।

সেই চুক্তির পরে পৃথিবীতে যে ভারসাম্য সৃষ্টি হল, তার পরিবর্তনের অভিলাষই হচ্ছে পরবর্তী যুগের ফ্যাসিবাদের আবির্ভাবের নিয়ামক কারণ। ইংরেজ-ফরাসী আর ইতালী-জার্মান শক্তির বিরোধ তার থেকেই জন্মলাভ করেছিল। বিরোধ অনেকদিন অনেক বছরই চলেছে। এই বিরোধের কারণ আর কিছুই নয়, পৃথিবীর মানচিত্রকে আবার পরিবর্তন করা, হৃত উপনিবেশ-গুলিকে আবার ফিরিয়ে আনা। এই বিরোধিতা সদা বৈরীমূলক নয়, কারণ প্রমাণ রয়েছে, ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি দুটো এক বিশেষ পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান-ইতালী এই শক্তি জোটের সঙ্গেও মিতালী করেছে। সুতরাং পরিদৃশ্যমান বিরোধগুলি সদা 'বৈরীমূলক' থাকে নি, নিষ্পত্তিযোগ্য বিরোধ হয়ে গেছে। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্রগতির একটি বিশেষ সময়কালে (সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানী দ্বারা আক্রান্ত হবার পরে) ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, ফ্যাসিবাদ বিরোধীযুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে লড়াই করেছে, ফ্যাসীবাদের পরাজয়কে সুনিশ্চিত করেছে। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে শীতল যুদ্ধ শুরু হয়েছে, যুদ্ধ শেষ হবার চুক্তির কালি না শুকোতে শুকোতেই। শীতল যুদ্ধের টানাপোড়েনের শেষে আবার চলেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধে অস্ত্র সজ্জার দাপাদাপি। পৃথিবী আজ মারণ যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই সময়ে শত্রু-মিত্রের অবস্থান একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে নি। অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে, এমন কি পার্শ্ব-পরিবর্তন হয়েছে—শিবির পরিবর্তনও হয়েছে।

এই মূল্যায়নের মর্মবস্তু হোল, সদা বৈরীমূলক দ্বন্দ্ব ও অবৈরীমূলক দ্বন্দ্ব, তার থেকে উদ্ভূত প্রধান দ্বন্দ্ব এবং অপ্রধান দ্বন্দ্ব, এই সবকে কেন্দ্র করেই এই সব অবস্থান পরিবর্তন। ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যার দ্বারাই এই অভ্রান্ত সত্যের আবিষ্কার সম্ভব, অন্য কোন ভাবে নয়।

॥ তিন ॥

জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম উপনিবেশগুলির জনগণের প্রধানতম সংগ্রাম। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামগুলির পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ যেমন প্রধান শত্রু, তেমনি ফ্যাসিবাদও

প্রধান শত্রু। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে এই দু'টি—সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ একই সময়ে যুগপৎ প্রধান শত্রু রূপে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোনটি প্রধান এবং অপ্রধান শত্রু তা নির্ভর করে বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের উপর। ইতিহাসবোধ এবং নিপুণ দেশপ্রেমিক নেতৃত্বই তা সঠিক ভাবে নিরূপণ করতে পারে। সংকট কালে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির পারস্পরিক অবস্থানের আলোকে মুক্তি সংগ্রামের পথটি বেছে নিতে পারলেই মুক্তি সংগ্রাম সাফল্য লাভ করে। আর তা করতে না পারলে সাফল্য অর্জন যেমন সম্ভব হয় না, তেমনি পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে অনেক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলিকে সমর্থন করা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের একটি প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্যটি কি তা লেনিনের শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত। সেই শিক্ষার আলোকে কর্তব্যটি হোল :

কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কর্তব্য হচ্ছে পশ্চাদপদ দেশগুলিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। গীর্জার পুরোহিতদের এবং অন্যান্য প্রভাবশালী প্রতিক্রিয়ার শক্তি, মধ্যযুগীয় পশ্চাদগামিতা এবং প্যান-ইসলামিজমের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করতে হবে। বৃহৎ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রামকে এবং সামন্তবাদ ও তার অবশেষের বিরুদ্ধে নিরলসভাবে সংগ্রাম চালাতে হবে এবং কৃষক সংগ্রামকে উন্নত বৈপ্লবিক সংগঠনে পরিণত করতে হবে। সর্বশেষে পশ্চিম ইউরোপের সাম্যবাদী সর্বহারাদের সঙ্গে প্রাচ্যের এই কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলনের খুব নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে।
[সূত্র : পিপলস ডেমোক্রাসি, ৪ মে; ১৯৮৫ সংখ্যা]

শিক্ষাটি পরিষ্কার, ব্যাখ্যাও সার্বজনীন। শিক্ষাটির মর্মবস্তু হচ্ছে, উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রাম এবং ইউরোপীয় সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে সেতু বন্ধন।

॥ চার ॥

ফ্যাসিবাদের বিপদের কথা কোন অজানা ব্যাপার নয়। ফ্যাসিবাদের বিজয় যদি হোত হিটলার-মুসোলিনীর নেতৃত্বে, পৃথিবী থেকে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, মানবিক মূল্যবোধ—সবই বিলুপ্ত হয়ে যেত। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলি (ভারত সহ) এ সম্পর্কে আদৌ উদাসীন ছিল না। ফ্যাসিবাদের বিপদ বিশ্বমানবতার বিপদ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এ সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিল।

ফ্যাসিবাদের পরাজয় সম্ভব না হলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলি একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতো। এটাও সর্বজনীন সত্য। আরও সত্য হচ্ছে, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পরে সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৪৫ সন থেকে জুন ২৭, ১৯৭৭ সন—এই সময়সীমার মধ্যে ৫৪টি উপনিবেশিক দেশ জাতীয় মুক্তি অর্জন করেছে। এই দেশগুলি হল এশিয়ার, আফ্রিকার, লাতিন আমেরিকার। ভারতও তাদের মধ্যে অন্যতম। ফ্যাসিবাদের পরাজয় না হলে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রে এরূপ বৈপ্লবিক এবং যুগান্তকারী পরিবর্তন সম্ভব হোত না। সমাজতন্ত্র বিলুপ্ত হোত, বিলুপ্ত হতো গণতন্ত্র, বিলুপ্ত হোত মানব সভ্যতার সব ফসলও। সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান অতুলনীয় এবং অমূল্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে নায়কত্ব দিয়ে রক্ষা করেছে পৃথিবী ও মানব সভ্যতাকে, উপনিবেশিক মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। এটি এমন একটি সত্য যা তর্কাতীত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পরে এই যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলি এশিয়া আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় সাফল্য লাভ করলো এটা একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয় বা তার ফলশ্রুতিও নয়। বার্লিনের পতন অথবা টোকিওর আত্ম-সমর্পণ অথবা এধরণের অন্য ঘটনাই কি সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি? যারা এরূপ মনোভাব পোষণ করে, তারা ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম। ইতিহাস বোধ সম্পর্কে অজ্ঞতাই তার কারণ। ফ্যাসিবাদের পরাজয় আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে—এবং তার কারণে সাম্রাজ্যবাদের শক্তি দুর্বল হয়েছে; সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির অনুকূলে ভারসাম্য গিয়েছে। তার ফলশ্রুতিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলি আরও শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের সুযোগে সংগ্রামে সাফল্য লাভ করেছে। দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলিও আরও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, রক্ত-ঘাম-অশ্রু ঝরিয়েছে, মুক্তি অর্জন করেছে। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায়, ভিন্ন ভিন্ন সুযোগে মুক্তি সংগ্রাম এগিয়ে গিয়েছে এবং পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সাফল্য অর্জন করেছে। এক একটি দেশের মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের আলাদা-আলাদা কার্য-কারণ রয়েছে। সেগুলো সবিস্তারে পর্যালোচনা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পর্যালোচনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোকে।

॥ পাঁচ ॥

বহু সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বিশালতম মঞ্চ হিসেবে গড়ে উঠেছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের ইতিহাস এক শতাব্দীর ইতিহাস। আধুনিক ভারতের ইতিহাস ইতিহাসই হতে পারেনা জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে। শতাব্দীর এই ইতিহাসে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থা এবং বামপন্থার মতবাদিক সংঘর্ষ একটি অবিভাজ্য অংশ। ঠিক তেমনি রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস পন্থা এবং অ-অহিংস পন্থা নিয়ে স্বাধীনতা অর্জন মত-বিরোধ। এই দুটি উপাদানকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস থেকে বাদ দিয়ে দিলে, পূর্ণাঙ্গ এবং সত্যনিষ্ঠ এবং বাস্তব-ধর্মী ইতিহাস হয় না। যা হয় তা হচ্ছে, দর্জি দিয়ে পছন্দ মাফিক ছাট-কাট করা ফরমায়েসী পোষাক। তা ইতিহাস বোধ নয়—ইতিহাস বিজ্ঞানও নয়।

বামপন্থা এবং দক্ষিণ পন্থার মতবাদিক সংঘর্ষ স্বয়ম্ভু নয়—অথবা আচমকা নয়। তার পিছনেও রয়েছে সামাজিক-অর্থনীতিক-রাজনীতিক কার্য-কারণ। এই সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল ১৯২০ সনেরও আগে। প্রাক প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বামপন্থার যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রমুখ। আর প্রথম মহাযুদ্ধের উত্তরকালে যাঁরা ছিলেন বামপন্থার প্রখ্যাত প্রবক্তা তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনিবাস আয়েংগার, ডাঃ মহম্মদ আলম, কে-এফ নরীম্যান, ডাঃ এস কিচলু, পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বসু।

প্রাক যুদ্ধকালীন বামপন্থা আর যুদ্ধোত্তর যুগের বামপন্থা, এ দুয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। প্রাক যুদ্ধকালীন বামপন্থায় আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক উপাদান ছিল না বললেই চলে। অপর পক্ষে যুদ্ধোত্তর বামপন্থার মৌল ভিত্তিই ছিল আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক উপাদানসমূহের সুস্পষ্ট সন্নিবেশ। শ্রেণী দৃষ্টিকোন ছিল বেশ সুস্পষ্টভাবেই পরিদৃশ্যমান। বস্তুতঃ একটি নতুন প্রগতি-ধর্মী আর্থ-সামাজিক ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ছিল। পক্ষান্তরে দক্ষিণপন্থার নেতৃত্বে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। আধা-ধার্মিক ও আধা-সমাজ সংস্কারের চিন্তা-ভাবনা ছিল দক্ষিণপন্থার মৌল উপাদান। স্বরাজের লক্ষ্য ছিল বিমূর্ত একটি ধ্যান-ধারণা যা জীবন-জীবিকার প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা তার সংগে সংযোগ-হীন। 'রামরাজ্য' ধরনের পুনরুত্থানবাদই ছিল মুখ্য—জীবন-জীবিকার অন্যান্য

প্রশ্নগুলি 'স্বরাজ'-কল্পনার ক্ষেত্রে নিতান্তই গৌণ। প্রসংগত উল্লেখ্য, পুনরুত্থানবাদের প্রধান ভিত্তি ছিল 'হিন্দু পুনরুত্থানবাদ'।

বামপন্থা এবং দক্ষিণপন্থার বিরোধ নানা প্রসংগেই প্রকাশ পেয়েছে। পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস', গান্ধী-আরুইন চুক্তি, গোল টেবিল বৈঠক, কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড, ফেডারেশন পরিকল্পনা, ইত্যাদি নানা প্রশ্নে নানা সময়ে বিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু ১৯৩০ সনের পরে বামপন্থার প্রবক্তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। গান্ধীজীর নেতৃত্ব অবিসংবাদীই হয়ে ওঠে। গান্ধীজী ও কংগ্রেস এক হয়ে যায়। গান্ধীজী আর ব্যক্তি রইলেন না, গান্ধীজী হয়ে উঠলেন গোটা সংগঠন, গোটা কংগ্রেস। যাঁরা গান্ধীজীর প্রভাবের বাইরে রইলেন তাঁরা হলেন মাত্র দু জন। একজন ডঃ কিচলু, আর অন্যজন সুভাষচন্দ্র বসু। বস্তুতঃ ১৯২৯ সনে নেহরুর কংগ্রেস সভাপতি হবার পরে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থার একমাত্র প্রবক্তা রইলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি শেষ পর্যন্ত বামপন্থার প্রধানতম প্রবক্তাই ছিলেন।

দক্ষিণপন্থা এবং বামপন্থার বিরোধ তুঙ্গে ওঠে ত্রিপুরী কংগ্রেসে (১৯৩৯)। সুভাষ চন্দ্র ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁর মনোনীত প্রার্থী ডঃ পট্টভি সীতারামাইকে পরাজিত করে। এবং এই বিরোধ বিচ্ছেদে পরিণত হয় এ. আই. সি. সিতে 'পন্থ প্রস্তাব' গৃহীত হবার পরে। প্রসংগত উল্লেখ্য, পন্থ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা এবং অনুমোদনের ভিত্তিতেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে—যদিও কংগ্রেস সংবিধানে কংগ্রেস সভাপতিরই রয়েছে চূড়ান্ত ক্ষমতা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন করার।

এ দুটি ঘটনা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে 'জল বিভাজিকা' রূপেই স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতির পদে নির্বাচন এবং পন্থ-প্রস্তাব গ্রহণ দক্ষিণপন্থা এবং বামপন্থার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংঘর্ষ।

এই চূড়ান্ত সংঘর্ষের পেছনে প্রধানতঃ তিনটি রাজনৈতিক কারণ ছিল। এক, গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নির্বাচনে নিয়ে এবং সংগ্রামের রণনীতি নিয়ে প্রবল মত পার্থক্য। সুভাষ চন্দ্রের দৃঢ় অভিমত ছিল, ভারত এবং বৃটেনের মধ্যে আপোষের কোন সুযোগই নেই। কারণ এই দুয়ের মধ্যে সামাজিক, অর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য এত বেশী যে সেগুলির

অবস্থান একেবারে দু'টি মেরুতে। পার্থক্যকে কমিয়ে আনার কোন সম্ভাবনাই নেই। এই মনোভাব তিনি প্রকাশ করেছেন, 'ফাণ্ডামেন্টাল কোশ্চেন অব ইণ্ডিয়ান রেভলিউশন' নিবন্ধে। সুভাষচন্দ্র ইউরোপের ঘনায়মান সংকটের সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নির্বাচনের জন্য। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণের মর্মার্থ এ প্রসংগে উল্লেখ্য। সে অভিভাষণে তিনি বলেন,'আমাদের উচিত বৃটিশ সরকারের কাছে চরমপত্রের আকারে জাতীয় দাবী পেশ করা। চরম পত্রে সময় সীমা এমন ভাবে উল্লেখ করতে হবে—যার মধ্যে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে জবাব আশা করা যেতে পারে। যদি সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব না আসে অথবা জবাবটি হয় অসন্তোষজনক, তবে আমাদের এমন কর্মসূচী নিতে হবে যাতে জাতীয় দাবী অর্জন করা সম্ভব হয়।'

রণনীতি কী হবে তা নিয়েও মৌল মত-পার্থক্য ছিল। তাঁর অভিমত ছিল, "স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দুটো পথ খোলা আছে। একটি পথ হোল আপোষহীন সংগ্রামশীলতা। অন্যটি হচ্ছে আপোষ। তিনি প্রশ্ন করেন, ভারত কী স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে মাঝে মাঝে আপোষ করে এবং কোনরূপ সংগ্রামশীল পরিকল্পিত কর্মসূচী না নিয়ে? [সূত্র: ফাণ্ডামেন্টাল কোশ্চেন অব ইণ্ডিয়ান রেভলিউশন]

দুই, সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিদেশীদের সাহায্য ছাড়া ভারতের বিপ্লব সফল হতে পারেনা। এই প্রসংগে কয়েকটি প্রামাণ্য দলিলের উল্লেখ করব। প্রথমটি হোল ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা এস এস বাট্লিওয়ালার নোট। বাকী আর দলিলগুলি হচ্ছে, রোমা রোলার সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মূল্যায়ণ, জুলাই ৪, ১৯৩৮ তারিখে তাঁর অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অভিভাষণ, ১৯৩৩ সনে কমিনটার্ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস কনফারেন্সে তাঁর বক্তৃতা (১৯৪০)। নোটটি বাট্লিওয়ালা পাঠিয়েছিলেন ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর কাছে। নোটে তিনি বলেছেন: "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবার পর পরই অক্টোবর ১৯৩৯, আমি কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর সংগে আলোচনায় যোগ দিই। আমি আলোচনার সবটাই নোট নিই কারণ আমাকে পার্টি'র কাছে রিপোর্ট করতে হবে।"

নোটের একটি অংশে তিনি বলেছেন, সুভাষচন্দ্র তাঁকে বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভারতকে তার উপনিবেশে পরিণত করার কোন ইচ্ছা নেই। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি সাম্রাজ্যবাদীদের হাত

থেকে আমাদের ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সামরিক সাহায্য দেয় তা হলে আমি তাকে স্বাগত জানাবো । একটি আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত কোন সেনা-বাহিনীর সাহায্য ব্যতিরেকে আমি আমাদের স্বাধীনতা লাভের কোন সম্ভাবনাই দেখি না। যে রণকৌশলের কথা আমি ভেবে রেখেছি, তা হোল, আমরা ভারতে পুরোদমে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন শুরু করে দিই ; এবং একই সময়ে উত্তর দিক থেকে ভারতে সোভিয়েত সেনা বাহিনী এগিয়ে আসুক এই কথা ঘোষণা করে যে, ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের মিত্ররূপে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

নোটে বাটলিওয়ালা আরও বলেছেন, সুভাষচন্দ্র এই ধারণা প্রকাশ করেন যে, দেশের প্রতিটি মানুষই এই অভিযানকে স্বাগত জানাবে। একদিকে সোভিয়েত অভিযান, অন্য দিকে ভারতের প্রতিটি গ্রাম ও শহরে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জন্য জনগণের অভিযান—এই দুই দিকে সাঁড়াশির মত অভিযান ইংরেজকে ভারত থেকে চলে যেতে বাধ্য করবে। নোটে বাটলিওয়ালা আরও বলেছেন, তিনি (সুভাষচন্দ্র) খুব জোরের সঙ্গে বলেন, যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিস্থিতির সুযোগ নেবে না এবং আমাদের দেশকে দখল করবে না। তাদের বিপ্লবের তত্ত্ব ও কার্যক্রম এ ধরনের দখলদারীকে সমর্থন করতে পারে না। তাঁরা আমাদের বিপদে ফেলবে না। তিনি আমাকে মস্কোকে তাঁর অনুরোধ ও ইচ্ছাটি জানিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। আমি এটি সি পি আই পলিটব্যুরোকে জানিয়ে দিই। কিন্তু সি পি আই এই পরিকল্পনাটিকে সমর্থন যোগ্য বলে মনে করে নি। তারা একে সুবিধাবাদ বলে মনে করে।"

নোটটি থেকে ভারতীয় বিপ্লবের জন্য একটি বিশেষ পথের পরিষ্কার আভাস ফুটে ওঠে।

চল্লিশের শতকের গোড়ার দিকে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রর সম্পর্কের আরও একটি প্রামান্য দলিল হোল বর্তমান সি পি আই সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাওয়ের একটি মন্তব্য। তিনি পি সি যোশীর স্মরণ সভায় বলেছেন, খুব কম লোকই জানে যে কম্যুনিস্টরা নেতাজীকে ছদ্মবেশে ১৯৪১ সনে বিদেশ যেতে সাহায্য করেছিল। তিনি আরও বলেন, যোশী এবং অধিকারী কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে বিদেশে যেতে নেতাজীকে সবরকমের সাহায্য করতে সিদ্ধান্ত নেন। ভগত রাম এবং তলোয়ার এই দুজন কম্যুনিস্ট নেতাকে তার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁরা নেতাজীর সঙ্গে কাবুল অবধি গোপনে যান।

[সূত্র : কম্যুনিস্ট পার্টি'র দিল্লী থেকে প্রকাশিত হিন্দী দৈনিক জনযুগ, নভেম্বর ১৩, ১৯৮০] প্রয়াত কম্যুনিস্ট নেতা ভূপেশ গুপ্তের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে দিয়েও আমি এই কথাটি জানতে পেরেছিলাম।

অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে(৩ জুলাই, ১৯৩১)সভাপতির অভিভাষণে সুভাষচন্দ্রবসু বলেন,"একদিকে রয়েছে দক্ষিণপন্থী শক্তি যারা সর্বতো ভাবেই শোধনবাদী। তাদের সব কর্মসূচীই হচ্ছে শোধনবাদী। অন্য দিকে রয়েছে আমাদের কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, তারা হচ্ছে মস্কোর সমর্থক এবং তার নীতির অনুসারী। আমরা উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে একমত না হতে পারি, কিন্তু তাদের মনোভাব বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। এই দুই গোষ্ঠীর মাঝে আর একটি গোষ্ঠী আছে যারা সোস্যালিজমের প্রতি আস্থাবান। এমন সোস্যালিজম যা সব অর্থেই পুরোপুরি সোস্যালিজম। কিন্তু তাদের ইচ্ছা হচ্ছে যে ভারত তার নিজস্ব সোস্যালিজমের রূপ নিয়ে নিজস্ব পথে এগিয়ে যাক। আমি নিজেকে সেই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত একজন বলে মনে করি। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে একমাত্র সমাজতন্ত্রই ভারতের ও পৃথিবীর জনগণকে মুক্তি দিতে পারে। ভারতকে অন্যান্য জাতির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু ভারতকে নিজের পথ ও প্রণালী নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে, এবং সে প্রণালীটি হতেই হবে ভারতের প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যে কোন তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে ভূগোল এবং ইতিহাসকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। যদি তা কেউ করে, সে ব্যর্থ হবেই হবে। সুতরাং ভারতকে তার স্বকীয় অবয়বের সমাজতন্ত্র খুঁজে বের করতে হবে।"

মাদ্রাজের জেলে সুভাষচন্দ্র একটি থিসিস রচনা করেন। থিসিসের নামকরণ করেন, 'হিন্দুস্থানী সাম্যবাদী সংঘ' বলে। সেই থিসিসের উপর ভিত্তি করেই সুইজারল্যাণ্ডে কমিনটার্নে'র এক প্রতিনিধির সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৩ সনে আলাপ আলোচনা করেন। অবিশ্যি তার ফলাফল আমাদের জানা নেই। কোন প্রামান্য দলিলের খোঁজ এখনও পাইনি। ১৯৩৩ সনের জুন মাসে লণ্ডনে ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা শাপুরজী শাকলাওয়ালা। সুভাষচন্দ্রকে সেই সম্মেলনে উপস্থিত হতে দেয় নি বৃটিশ পুলিশ। তার লিখিত অভিভাষণ শুধু সম্মেলনে পড়ে দেয়া হয়। সেই অভিভাষণেও 'সাম্যবাদী সংঘ'-এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী তিনি উল্লেখ করেছেন।

১৯৩৫ সনে সুভাষচন্দ্র সাক্ষাৎ করেন রেঁামা রোলার সঙ্গে। তাঁর কথোপকথনের সারাংশ রেঁামা রেঁালা ডয়েরীতে লিখে রেখেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সে ডায়েরী প্রকাশিত হয়েছে। সেই ডায়েরীতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, এবং তাতে গান্ধীজী এবং সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে রেঁালার মূল্যায়ণ পাওয়া যায়। সেই মূল্যায়ণের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি। গান্ধীজী সম্পর্কে যে মূল্যায়ণ তাতে তিনি (রেঁালা) বলেছেন, "প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি (গান্ধী) অগ্রগতির পক্ষে কার্যতঃ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে। তিনি সব সময়েই লক্ষ্য রেখেছেন যাতে অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলির উপর কোন গুরুত্ব বা জোর না দেয়া হয়; কারণ তা হলে শ্রেণীগুলোর মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হবে।" সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মূল্যায়নে রেঁালা বলেছেন, "বোসের অভিমত অনুসারে এই প্রশ্নের উপরেই সোস্যালিষ্ট পার্টির জোর দেয়া উচিত; যদি সেই পার্টি জনগণের ভেতরে কার্যকরীভাবে কাজ করতে চায়। জনগণের মধ্যে চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে। এবং তাদের দাবীগুলির প্রতি সমর্থন জানাতে হবে। কৃষকের জন্য জমির প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সমাজবাদী চিন্তাধারা গ্রামের মানুষের কাছে প্রচার করতে হবে। এটা একান্তই প্রয়োজন কারণ গ্রামের মানুষেরাই সৈন্য বাহিনীতে পৌঁছায়। ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে গ্রামের মানুষদেরই প্রধানতঃ ভর্তি করা হয়। সৈন্য বাহিনীর মানসিক পরিবর্তন করা যাবে না যদি না তাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। বোস এ কথা লুকিয়ে রাখেন নি যে ভারত পেছিয়ে পড়া দেশ। এবং বেশ অনেক দিন ধরেই তা থাকবে। গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষেও পেছিয়ে থাকবে। কাজেই মনে তাঁর একটি ধারণা রয়েছে। সে ধারণা হোল, ইওরোপের যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ড দখল হলে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা দেখা দেবে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র হতাশ হয়ে গেলেন যখন আমি বললুম অনেক কারণে আমরা তা চাই না (সেই সুন্দর দেশ)। বোসের কথা শুনে মনে হল তিনি কম্যুনিজমের কোল ঘেঁষা। কিন্তু তিনি তা শুনতে চান না। সম্ভবতঃ এই কম্যুনিজম সম্পর্কে তার আপাত অনীহা থাকার কারণ হচ্ছে, এই পার্টির ভারতীয় প্রতিনিধিদের সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মনোভাব। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি ভারতকে স্বাধীন করতে সাহায্য করে, তবে তিনি তাতে ক্ষতির আশংকা করেন না। সেই দেশ (সোভিয়েত ইউনিয়ন) সম্পর্কে তার অভিযোগ হচ্ছে, জাতীয় স্বার্থে (সোভিয়েত ইউনিয়নের) সে আজ আর বিশ্ব-বিপ্লবে কোন উৎসাহ দেখায় না।"

১৯৪০ সনের জানুয়ারী মাসে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে (দিল্লী) সুভাষ চন্দ্রের সভাপতির অভিভাষণ আগামী দিনের তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এবং কর্মসূচীর পূর্ণাবয়ব প্রতিচ্ছবি। প্রতিচ্ছবিটা সঠিক ভাবে তুলে ধরার জন্য একটু বিশদ ভাবেই তাঁর অভিভাষণটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। সেই অভিভাষণে তিনি বলেছেন :

"আসন্ন যুদ্ধের সংকট ১৯২৭ সন থেকেই দিগন্তে ভেসে উঠেছে। প্রতি বছরই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চর্চা করে এবং প্রস্তাব নেয়। শেষতম প্রস্তাব যা বর্তমানে একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাবে পরিণত হয়েছে তা গৃহীত হয়েছে ১৯৩৮ সনে হরিপুরা কংগ্রেসে। জনগণের এটাই হচ্ছে আশা, যে মুহূর্তে সম্ভাব্য সংকট দেখা দেবে, তখনি হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবকে কার্যকরী করা হবে। আমাদের চরম পত্র দেবার প্রস্তাব এবং আগাম প্রস্তুতির কথা শুনে ত্রিপুরী কংগ্রেসে অনেকেই ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছেন। ত্রিপুরী কংগ্রেস হয়েছিল মার্চ, ১৯৩৯ সনে। আমাদের প্রবীণ নেতারা যে মর্যাদা হারিয়েছেন তা ফিরে পাবার জন্ম তাঁরা খুব বেশী আগ্রহী। তাঁরা সেই তুলনায় জরুরী জাতীয় সমস্যা সমাধানে তেমন আগ্রহশীল নন। এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে তাঁরা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্ম অথবা সময়োপযোগী কর্তব্য পালনের জন্ম যথাযোগ্য আগ্রহ দেখান নি। জনগণ তাদের কাছে সেইরূপই আশা করেছিল। তাঁরা ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ এবং ব্যক্তি স্বার্থকেই জাতীয় স্বার্থের চাইতে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। সেপ্টেম্বরের আগে মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর সমর্থকগণ দুটি পুরনো যুক্তি দেখিয়েছেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। প্রথমতঃ কংগ্রেস কর্মী বাহিনীতে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে এবং দ্বিতীয়তা সত্যাগ্রহ শুরু হলে হিংসাত্মক কাজ শুরু হবে। সেপ্টেম্বর থেকেই তাঁরা একথা বলতে শুরু করেছেন। এর সংগে তৃতীয় একটি যুক্তিও জুড়ে দিচ্ছেন। সেটি হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা।

আগে বহুবার এখানে সেখানে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হয়েছে; কিন্তু সেটাকে কোনদিন লক্ষ্য অর্জনের দিকে আন্দোলনের পথ রুখে দেবার কারণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় নি। আমরা দেখতে চাই আন্দোলনের পথ রুখবার জন্ম আর কোন কোন কারণ ভবিষ্যতে দেখানো হয়।

আমাদের বলা হচ্ছে আমরা চড়কা কেটে 'স্বরাজের' দিকে এগুবো। কিন্তু আমরা কেমন করে মহাত্মা গান্ধীর এই যাদু মন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হব। আমরা

জানি এক শতাব্দী আগে ভারত খাদি আর হাতের শিল্প ছাড়া আর কিছুই জানতো না। কিন্তু সেদিন আমরা বিদেশী আধিপত্যের শিকার হয়েছিলাম। না, এই সত্যকে, এখন সত্য বলার সময় এসেছে। জনগণকে আমাদের পরিষ্কার ভাবে বলতে হবে, চড়কা কেটে স্বরাজ পাবার কথাটি আকাশ কুসুম। একেবারে অলীক কল্পনা। চড়কা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তা স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র হবে। স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প বাক্যের সঙ্গে চড়কা কাটার শর্ত যুক্ত করে দিয়ে যেন সংকল্প বাক্যটিকে মর্যাদাহীন না করা হয়।

"কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের এরূপ মনোভাব কেন? তারা ফ্যাসিস্ত বৃটেনের সঙ্গে আপোষের কথা ভাবতে পারে। কিন্তু বামপন্থী এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের জন্য রয়েছে শেষ পর্যন্ত একমাত্র তীব্র সংগ্রাম।

"এ ব্যাপারটির উপর আরও আলোকপাত করার কাজ আপনাদের হাতে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমি এ কথা বলতে চাই, কংগ্রেসের ভেতরে দক্ষিণপন্থা এবং বামপন্থার সংঘর্ষ আজের থেকে আগামীকাল আরও বেশী তীব্র হবে। পার্টির আবরণের অন্তরালে এই সংগ্রাম বস্তুতঃ শ্রেণী-সংগ্রাম—সম্ভবতঃ অবচেতন ভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম। আর এই শ্রেণী-সংগ্রাম বিরতিহীন ভাবে চিরদিনই চলবে। আমাদের হাই কম্যাণ্ডের ঠাণ্ডা মাথায়, দৃঢ়পণ, এবং নির্মম মনোভাব অহিংসার নীতি বর্জনেরই বহিঃপ্রকাশ। ভারতীয় পরিস্থিতিতে 'ক্ষমতার রাজনীতি' ছাড়া এটা আর কিছু নয়। কিন্তু তাঁরা সংগ্রামের পথ ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? এই খেলার পেছনে কী লুক্কায়িত রয়েছে? এই প্রশ্নের জবাব দেয়া খুবই কঠিন। কিন্তু আমার অনুমান, তাঁরা ভেবে নিয়েছেন একবার জাতীয় স্তরে অভিযান সুরু হয়ে গেলে, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। সুতরাং কৌশল হচ্ছে, প্রদেশ শাসনের যে সুযোগ তাঁরা তা হাতে বহাল রাখতে চান, এবং কেন্দ্রেও যাতে কিছু ক্ষমতা তাঁরা হাতে পান তার জন্যই তাঁরা আজ সচেষ্ট। সে জন্য তাঁরা বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করতে খুবই আগ্রহশীল।

"আমাদের সামনে এই মুহূর্তের কর্তব্য হচ্ছে, জাতীয় সংগ্রাম শুরু করে দেয়া। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কি তা শুরু করবে? তারা শুরু করুক এটাই আমরা চাই। এবং সেটাই কংগ্রেসকে যুক্তভাবে সংগ্রাম টেনে আনতে পারবে। কিন্তু তারা যদি দড়ি টেনে ধরে তা হলে কি হবে? তাহলে আমরাও কি থেমে

যাব? দেশটা ওদের যতখানি, আমাদেরও ততখানি। দেশের প্রতিটি নর-নারীকে মাতৃভূমির প্রতি তার কর্তব্য পালন করতে হবে। কাজেই ইতিহাসের এই সংকটকালে আমরা থেমে থাকতে পারি না। নেতৃবৃন্দ যদি আমাদের সঙ্গে না আসেন, তবে আমাদের যতটুকু শক্তি ও সামর্থ আছে তাই নিয়েই আমাদের এগুতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

"যদি বামপন্থীরাই সংগ্রাম শুরু করে, তবে তার অর্থ এটা হবে না যে এই আন্দোলন শুধু বামপন্থীদেরই। সংগ্রামটি হবে সমগ্র জাতির সংগ্রাম। কে ডাক দিল—বামপন্থীরা অথবা দক্ষিণপন্থীরা—তাতে কিছু আসবে যাবে না। কী ধরনের ডাক হবে, আর কী ধরনের সংগ্রাম হবে—এ নিয়ে বিভ্রান্ত হলে, আমাদের পক্ষে ভুল হবে।

"স্মরণ রাখবেন, কমরেডস, বামপন্থী আন্দোলন আজ অগ্নি-পরীক্ষার সামনে। তার ভবিষ্যত নির্ভর করে আপনি এবং আমি এই দুর্যোগের থেকে কেমন ভাবে বেরিয়ে আসতে পারি—তার উপরে।

"আরও স্মরণ রাখবেন, ভারতের মুক্তি অর্জনের সুবর্ণতম সুযোগ আমাদের সামনে। এইরূপ অতি বিরল সুযোগ হারালে, আমাদের অপূরণীয় ক্ষতিই শুধু হবে। ভবিষ্যত আমাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না যদি আমরা আমাদের কর্তব্য পালন না করি।"

আমরা পর পর ছয়টি দলিলের কথা উল্লেখ করেছি—যেমন (১) ভারতীয় বিপ্লবের মৌল প্রশ্ন (২) এস এস বাটলিওয়ালার নোট (৩) নিখিল ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন (জুলাই ৪, ১৯৩১) অভিভাষণ (৪) ১৯৩৩ সনে কমিনটার্ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ (৫) ১৯৩৫ সনে রোমাঁ রোঁলার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে রোঁলার মূল্যায়ন এবং নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে অভিভাষণ (১৯৪০)। এই ছয়টি দলিল পাশাপাশি রেখে বিচার বিশ্লেষণ করলে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। আর সেই প্রতিচ্ছবির মৌল উপাদানগুলি হোল, এক, সুভাষচন্দ্র ভারতীয় বিপ্লবের সাফল্যের জন্য বিদেশী সাহায্যের অনিবার্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন। সোলি বাটলিওয়ালার নোট তারই প্রমাণ দেয়। দুই, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ সংকটের সুযোগে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সাফল্যের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের চরমপত্রের প্রস্তাব এই চিন্তা ভাবনারই ফলশ্রুতি।

তিন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য আমাদের পক্ষে ফলদায়ক হবে।

সোভিয়েতের প্রতি আস্থা রাখা ক্ষতিকারক হবে না। বাটালিওয়ালার নোট (জাতীয় স্বার্থের) তারই প্রমাণ রাখে।

চার, বৃটিশের সঙ্গে ভারতের আপোষ বা মৈত্রী একান্ত ভাবেই অসম্ভব। ভারতীয় বিপ্লবের মৌল প্রশ্ন তারই বিশ্লেষণ দেয়।

পাঁচ, 'ভারতের বিপ্লব ভারতীয় পথে ভারতীয় পরিস্থিতিতে'—এই মৌল চিন্তার প্রকাশ হয়েছে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে (১৯৩১) সভাপতির অভিভাষণে।

ছয়, জাতীয় পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ সুভাষচন্দ্রকে কম্যুনিজমের মৌল তত্ত্বের দ্বার প্রান্তে টেনে নিয়ে গিয়েছে। রোলাঁর মূল্যায়ন সেই কথাই বলে।

সাত, জাতীয় কংগ্রেসের, হাই কম্যাণ্ডের সংগ্রাম-বিমুখতা সুভাষচন্দ্রকে একেবারে হতাশ করে দিয়েছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আন্দোলনে না নামলেও, বামপন্থীদের নামতে হবে এরূপ সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন। কংগ্রেসের সংগঠনগত একতা রক্ষা করার প্রশ্নকে তিনি খুব গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ জাতীয় কংগ্রেস ছিল সেদিন দেশপ্রেমিক মুক্তি যোদ্ধাদের বিশালতম মঞ্চ। বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীর বিরোধ মূলতঃ ব্যক্তি-নেতৃত্বের বিরোধ নয়—সেই বিরোধ শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে জন্ম-নেওয়া। আর শ্রেণী-সংগ্রাম আবহকাল থাকবেই। এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ পেয়েছে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে (১৯৪০) সভাপতির ভাষণে।

এই সব কারণগুলিই সুভাষচন্দ্রকে ভারতের বাইরে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করার কর্মসূচীর দিকে দ্রুত টেনে নিয়েছে।

॥ ছয় ॥

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব, বিশেষ করে গান্ধীজী এ সবই জানতেন। বৃটিশ গোয়েন্দারা সব খবর রাখতো। তারাও যে গান্ধীজীর কানে সময়ে অসময়ে এ সব সংবাদ তুলে দেয় নি তা ভাবা যায় না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধুরন্ধর রাজনীতিকরা বেশ ভাল ভাবেই জানতো, বিপ্লবের বন্যার বাঁধ হচ্ছে গান্ধীজী এবং তাঁর রক্ষণশীল মতবাদ। পণ্ডিত নেহরু বামপন্থী চিন্তা-ভাবনার কথা

মুখে বললেও, গান্ধী প্রভাবের রাজনীতি থেকে বের হয়ে আসতে পারেন নি। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সম্মতিতে। দেশের এবং বিদেশের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে বামপন্থী বিপ্লবী মতবাদের ভিত্তিতে তিনি জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিচালনা করার সুযোগ চেয়েছিলেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসীন থেকেই। তাই তিনি দ্বিতীয় বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন। রাজনীতির প্রয়োজনে—পদের আকর্ষণে নয়। বিপরীত পক্ষে গান্ধীজীও তাঁর রাজনীতির প্রয়োজনে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতায় নেমেছিলেন। মূলতঃ ত্রিপুরী আর তার পরে 'পন্থ প্রস্তাব' দুই বিপরীত ধর্মী রাজনীতির লড়াই। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে লড়াইটি ছিল সীমাবদ্ধ তা প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলো—বামপন্থী রাজনীতি কংগ্রেস বিরোধী রাজনীতিতে রূপান্তরিত হোল। জাতীয় কংগ্রেস আর বামপন্থীদের কর্মকাণ্ডের মঞ্চ থাকল না। হয়ে গেল বুর্জোয়া শ্রেণীর সংস্থা।

পন্থ প্রস্তাব গৃহীত না হলে, কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসু শুধু বামপন্থীদের নিয়েই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলে গোটা জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বই এসে যেতো বামপন্থীদের হাতে। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমস্ত শক্তিগুলির বিশালতম ঐক্যমঞ্চের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হোত বামপন্থীদের হাতে। বামপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জাতীয় কংগ্রেসই হোত মুক্তি সংগ্রামের বর্শা-মুখ। তারপর বামপন্থীদের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি অর্জন সম্ভব হলে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথটাও হয়ে যেতে পারতো অপেক্ষাকৃত সহজ। ভারত শুধু স্বাধীন হোত তাই নয়—ভারত হোত সমাজবাদী ভারত। স্বকীয়তা-সমৃদ্ধ প্রাচীন সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উত্তরসূরী ভারতীয় বিপ্লবীরা পৃথিবীর শ্রমজীবী এবং শোষিত মানুষের কাছে এক নতুন দৃষ্টান্ত হয়ে চির-ভাস্বর থাকতো। আন্তর্জাতিক ভারসাম্যে আরও অনুকূল পরিবর্তন হোত। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক ভারত, সমাজতান্ত্রিক চীন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-ফ্যাসিবাদের হাত থেকে পৃথিবীর মানুষকে মুক্তি দিতে পারতো। একটি নতুন পৃথিবীর অভ্যুদয় হোত। একটি নতুন পৃথিবীর মানুষ আমরা হতাম।

ইতিহাসের গতিপথটি একেবারে বিপরীতমুখী হয়ে গেল। এই শিক্ষাটি ভোলার নয়।

॥ সাত ॥

ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হোল সেপ্টেম্বর ৩,১৯৩৯। কংগ্রেস নেতৃত্ব জাতীয় আন্দোলন শুরু করল না। যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের কি নীতি হবে, তা নিয়েও বিতর্কের ঝড় উঠলো। ভারতের জেলে পচার চাইতে স্বাধীনতা সংগ্রামের মিত্র খুঁজতে সুভাষচন্দ্র বিদেশ যাত্রা করলেন জানুয়ারী ১৯৪১-এ। সোভিয়েত পৌছানোই উদ্দেশ্য ছিল। বিশ্বযুদ্ধের গতিমুখের আচমকা পরিবর্তন হয়ে গেল জার্মানীর সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণের পরে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জার্মানী থেকে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করার উদ্দেশ্য সামনে রেখে সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে গেলেন। কারণ সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মস্কোর পক্ষে সাহায্য করা আর সম্ভব হবে না। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের বিবরণ দেওয়া এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কাজেই তা দিলাম না।

॥ আট ॥

ট্রাডিশনাল কম্যুনিস্ট বিশ্লেষণ সকলেরই জানা। তার পুনরুল্লেখ সম্পূর্ণভাবেই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সম্প্রতি ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের এক নিবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। তিনি ফ্যাসি-বিরোধী বিজয়ের ৪০তম বার্ষিকী দিবস উদযাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসংগে সেই সময়ের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা হোল: ফ্যাসিস্ত সামরিক শক্তি (জার্মানী এবং জাপান) ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব যুদ্ধের গোড়ার দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দর-কষাকষি করে। পরবর্তী সময়ে (জাপানের অগ্রগতির পরে) জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা করে। অন্য দিকে বুর্জোয়াদের এক অংশ (সুভাষ বোস) প্রকৃত পক্ষে জাপানীদের সঙ্গে মিতালী ও সহযোগিতা করে। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের দমনের পরে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব আবার বৃটিশের সঙ্গে সওদাবাজি করতে শুরু করে। বুর্জোয়া নেতৃত্বের এই শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গীর ফলশ্রুতি হোল এই যে যখন বৃটিশ শাসকরা বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের মুখে দাঁড়িয়ে ক্ষমতা আর ধরে রাখতে পারল

না, তখন 'স্বাধীনতা দান'-কে একটি রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় পরিণত করে দিল। তার পরিণতিতে দুটি বিবাদমান রাষ্ট্রের (ভারত ও পাকিস্তানের) আবির্ভাব হল। (পিপলস্ ডেমোক্র্যাসী, মে ৫, ১৯৮৫)

নাম্বুদিরিপাদের এই ব্যাখ্যা কোন নতুন ব্যাখ্যা নয়। ট্রাডিশনাল ব্যাখ্যারই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু আমরা যে প্রামাণ্য দলিলগুলির উল্লেখ করেছি, তার আলোকে সুভাষচন্দ্রকে বিচার করলে, এই ট্রাডিশনাল ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। অবশ্য, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের ভূমিকা তিনি সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন। গোড়ার দিকে দর-কষাকষি কথাটি খুবই সত্যি। কারণ, গান্ধীজী বৃটিশের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করতেই চেয়েছিলেন। তিনি (গান্ধীজী) ভাইসরয় লিনলিথগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বলেন, যদিও ভারত ও বৃটেনের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে মত পার্থক্য রয়েছে, তা-হলেও, ভারতের উচিত বৃটেনের এই বিপদের দিনে তার (বৃটেনের) সঙ্গে সহযোগিতা করা (সেপ্টেম্বর ৬, ১৯৩৯)।

নেহরু বলেন, 'যে সময়ে বৃটেন জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে সে সময়ে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করা ভারতের পক্ষে সম্মান হানিকর কাজ হবে' (বিবৃতি ৫ মে, ১৯৪০)।

গান্ধীজী আরও পরিস্কার করে বলেন, 'বৃটেনের ধ্বংসের উপর আমরা আমাদের স্বাধীনতা দেখতে চাই না। তা কোনমতে অহিংসার পথ নয়।' কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক প্রস্তাব গ্রহণ করে বলে,অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রতি ভারতের জনগণের দৃষ্টি ফরওয়ার্ড ব্লক আকর্ষণ করে। ভারতের জনগণ নিজেরাই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়ে রয়েছে। কাজেই যে কোন আন্তর্জাতিক বিরোধের প্রশ্নেই তারা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং প্রগতির শক্তির সমর্থনে স্বাভাবিক ভাবেই এগিয়ে আসবেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও তাদের দৃঢ় সংকল্প যে গ্রেট বৃটেনের কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে দেবে না। কমিটি এটাও পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছে যে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের উদ্যোগে ফরওয়ার্ড ব্লক সর্বপ্রকার অহিংস অসহায় ভারত সরকারে (বৃটিশ) যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য অর্থ, জনবল, এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ব্যবহারের বিরোধিতা করবে। [সূত্র : ফরওয়ার্ড ব্লক সাপ্তাহিক, আগষ্ট ১১, ১৯৩৯]

গোড়ার দিকে গান্ধী-নেহরু যুদ্ধের পরিস্থিতিতে বৃটেনের প্রতি সহানুভূতির কথা বললেও, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারতীয় জনগণের চাপে বৃটেনের বিরুদ্ধেই মত

প্রকাশ করে। এ আই সি সি যে প্রস্তাব নেয়, তাতে বলা হয়, "কংগ্রেস ফ্যাসিস্ত এবং নাৎজী আক্রমণকে নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে সুদৃঢ় অভিমত প্রকাশ করে যে শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং রক্ষিত হতে পারে যদি গণতন্ত্র সমস্ত উপনিবেশ-গুলিতে সম্প্রসারিত হয়। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হয়। আর তা হলেই তাদের উপর থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হবে। বিশেষ করে ভারতকে একটি স্বাধীন দেশরূপে স্বীকৃতি দিতে হবে [এ আই সি সি প্রস্তাব, অক্টোবর, ১৯৩৯]

এ আই সি সি-র প্রস্তাব সুভাষচন্দ্রকে খুশী করতে পারে নি। কারণ যুদ্ধের সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা লাভই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। প্রস্তাবের উপর তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন,আমাদের সামনে একটি নতুন সুযোগ। আমরা যদি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি এবং পরিস্থিতি অনুসারে সঠিক কর্মসূচী নিতে পারি, তাহলেই আমরা আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারব। [ফরওয়ার্ড ব্লক সাপ্তাহিক, অক্টোবর ১৯, ১৯৩৯]

এ আই সি সি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীতে অনেকাংশেই মিল ছিল। এই মিলের ভিত্তিটি ছিল বৃটিশ সরকারকে সহযোগিতায় নয়— এই মনোভাব। অমিল যেটা ছিল, সেটা হোল বৃটিশের বিরুদ্ধে এই সুযোগে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয় আন্দোলন শুরু করার প্রশ্ন নিয়ে। কম্যুনিষ্ট পার্টি যে অবস্থান নিয়েছিল, তা ছিল বৃটিশের পক্ষে সরাসরি সমর্থনের। সেই সমর্থন আরও খোলাখুলি হয়ে ওঠে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ করার পরে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলন, এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি জনযুদ্ধের তত্ত্বকে মেনে নেয় এবং ইংরেজের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পুরোপুরি সমর্থন জানায়। নাম্বুদিরিপাদ সেই অবস্থানের অনুকূলে সাফাই দিয়েছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মার্কসীয় তত্ত্বের আবরণে বুর্জোয়া নেতৃত্ব এবং সুভাষচন্দ্রকে নিন্দাবাদ করেছেন।

এখানেই মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগগত কৌশলের প্রশ্নটি বড হয়ে দেখা দেয়। মার্কসবাদ আন্তর্জাতিক মতবাদ। মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের প্রয়োগ বাস্তব পরিস্থিতি নিরপেক্ষ নয়। বাস্তব পরিস্থিতির সম্যক উপলব্ধির আলোকে তত্ত্বকে প্রয়োগ করাই হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটি অবিভাজ্য সার্বজনীন সত্য। সেই সত্যটিকে উপলব্ধি করতে না পারলে, মার্কসবাদ হয়ে ওঠে যান্ত্রিক আপ্তবাক্য। নাম্বুদিরিপাদের পার্টি সেই মৌলিক দুর্বলতার শিকার হয়েছিল।

দ্বন্দ্ব একটি নয়, অনেক। সেই দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্ব রয়েছে, আরও রয়েছে অপ্রধান দ্বন্দ্ব। আবার সেই দ্বন্দ্বগুলি মধ্যে কিছু কিছু বৈরীমূলক, আবার কিছু কিছু অবৈরীমূলক। কিছু কিছু নিষ্পত্তিযোগ্য—আবার কিছু কিছু নিষ্পত্তিযোগ্য নয়। দ্বন্দ্ব কাদের এই মৌল তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধি মার্কসবাদের সার্বজনীন সত্যের অভ্রান্ত সফল প্রয়োগের একমাত্র চাবি কাঠি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও বহু দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধান দ্বন্দ্বটি ছিল ফ্যাসিবাদ বনাম গণতন্ত্র। আবার উপনিবেশগুলিতে জাতীয় স্তরে প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল জাতীয় মুক্তি বনাম সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ। যে সমস্ত উপনিবেশে ফ্যাসিবাদ দখল কায়েম করতে পেরেছিল, সেখানে ফ্যাসিবাদ—সাম্রাজ্যবাদ দুটো একত্র মিলেই প্রধান দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেই সব উপনিবেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বনাম ফ্যাসিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ছিল প্রধান দ্বন্দ্ব। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কর্তব্য নির্ধারণ তেমন জটিল ছিল না। উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামটাই ছিল প্রধান সংগ্রাম। আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব এবং জাতীয় দ্বন্দ্ব এক এবং অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু যে সব উপনিবেশে ফ্যাসিবাদের দখলদারি কায়েম হয় নি, কিন্তু কায়েম আছে সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি, সেখানে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব এবং জাতীয় দ্বন্দ্ব এক হোল না। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নটি সেখানে খুব জটিল হয়ে দেখা দিল। ভারতে তেমনি একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে। মার্কসবাদের যান্ত্রিক প্রয়োগ এখানে মারাত্মক হতে বাধ্য। কম্যুনিষ্ট পার্টির অবস্থান তাই সেদিন খুবই মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছিল। গণতন্ত্র বনাম ফ্যাসিবাদ প্রধান দ্বন্দ্ব হলেও, ভারতে জাতীয় স্তরে প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল জাতীয় মুক্তি বনাম সাম্রাজ্যবাদ। সেই প্রধান দ্বন্দ্বটি বৈরীমূলক। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করে বেঁচে থাকতে পারে না—সাফল্য অর্জন করতে পারে না। কাজেই এই দ্বন্দ্বটি সম্পূর্ণ ভাবেই বৈরীমূলক, কোন মতেই নিষ্পত্তিযোগ্য নয়। আমরা সেই অবস্থানই জেনে-শুনে নিয়েছিলাম। আমরা বলতে ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর কিছু বামপন্থী শক্তি। কংগ্রেসের অবস্থানও তার কাছাকাছি ছিল, কিন্তু সচেতনভাবে নয়। কারণ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অথবা শ্রেণী-দৃষ্টিকোন থেকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ কোনদিন বুর্জোয়া শ্রেণীর পার্টি করে না।

মার্কসবাদ সামগ্রিকতার কথাও বলে। সমগ্রটি, অংশ নিয়ে। অংশকে

বাদ দিয়ে সমগ্র হতে পারে না। অংশের দ্বন্দ্বটি সব সময়েই অপ্রধান হবে, এ ধারণাও ভ্রান্ত। বিশেষ পরিস্থিতিতে অংশের প্রধান দ্বন্দ্বই, সমগ্রের প্রধান দ্বন্দ্বের চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং নিয়ামক হয়ে ওঠে। বস্তুনিষ্ঠ উপলব্ধিই তা বাছাই করতে পারে। আমরা বাছাই করতে পেরেছিলাম, কম্যুনিস্টরা পারে নি। কারণ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের কাছে যান্ত্রিক আপ্তবাক্য নয়, এটিএকটি সার্বজনীন সত্য, কিন্তু যার প্রয়োগবিধি বাস্তব পরিস্থিতি-নির্ভর।

ভারতের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের এখানেই ব্যর্থতা। লেনিন পশ্চাদপদ উপনিবেশগুলিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমর্থনে এগিয়ে আসতে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি সফল-ভাবে সে পরামর্শকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় নি। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব থাকবে, এবং বুর্জোয়া নেতৃত্ব থাকবে আপোষপন্থী এবং দোদুল্যমান, এটি কোন অজানা-সত্য নয়, একটি বহু-জানা সত্য। সাম্রাজ্যবাদীদের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধাবার চক্রান্ত এবং দেশ বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন নাম্বুদিরিপাদ। কিন্তু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন, পাকিস্তানের দাবীকে কম্যুনিষ্ট পার্টি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবীর সমতুল্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। বিষবৃক্ষের বীজ সেখানেই বপন করা হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র বসু জাপানের চর ছিলেন না। ইতিহাস তা প্রমান করেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে জাপান ও জার্মানীর সম্পর্কটি কি ছিল, তা আলোচনা করবো। এর বেশী মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ইতিহাসের সত্য গোপন যেমন রাখা যায় না, তেমনি চিরকালের জন্য বিকৃতও করা যায় না। প্রাজ্ঞ, সৎ, নিষ্ঠাবান কম্যুনিস্ট কর্মীদের এব্যাপারে ভেবে দেখার সময় এসে গিয়েছে।

॥ নয় ॥

ভারতের বাইরে সুভাষচন্দ্র যখন স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পরে, বার্লিন থেকে, তখন সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নানা ধরনের প্রচার সংগঠিত হয়েছে। এক বিতর্কিত রাজনীতিক পুরুষ তিনি হয়েছিলেন এবং এখনও রয়েছেন। মিত্র পক্ষ তাঁকে আখ্যায়িত করত ফ্যাসিস্ত বলে এবং অক্ষশক্তি আখ্যায়িত করত কম্যুনিস্ট বলে।

সুভাষচন্দ্রের ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে মনোভাব এক বহুজানা সত্য। তবুও বিকৃত প্রচার যেমন অতীতে চলেছে, এখনও হচ্ছে। এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা আবার জরুরী হয়ে উঠেছে, বিশেষতঃ যখন ফ্যাসি-বিরোধী বিজয়ের চল্লিশতম বার্ষিকী উদযাপন উৎসব চলছে। বিকৃত ইতিহাসকে সংশোধনের জন্যই তা প্রয়োজন।

ফাসিবাদের মৌল ভিত্তি হচ্ছে আর্থ-রাজনীতিক। সুভাষচন্দ্র বলেছেন: ফ্যাসিবাদ ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর গঠিত চলতি আর্থিক পদ্ধতির আমূল সংস্কার করতে সক্ষম হয় নি (টোকিও বক্তৃতা)। ফ্যাসিবাদ যে ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার আর একটি সংস্করণ তা তিনি লক্ষ্য করেছেন।

রজনী পাম দত্তের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের (জানুয়ারী ২৪, ১৯৩৮) বিবরণ জার্মান ফ্যাসিবাদের আসল এবং নগ্ন রূপটি উন্মোচন করে দিয়েছে।

নাৎজী পার্টি ও নাৎজী দর্শনকে তীব্র সমালোচনা এবং বিরোধিতা করে সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে অবস্থান কালেই ডঃ দিয়ার ফেল্ডারকে (জার্মান একাডেমী ফর ফরেন রিলেশনস-এর প্রতিষ্ঠাতা-ডাইরেক্টর) মার্চ ২৯, ১৯৩৬ সনে, একখানি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানির পূর্ণ বয়ান উদ্ধৃত করলুম।

"আমি যখন প্রথম ১৯৩৩ সনে জার্মানীতে এসেছিলাম, তখন আমার মনে আশা জেগেছিল যে এক নতুন জার্মান জাতির জন্ম হয়েছে। এবং জাতীয় শক্তি এবং মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সেই জাতি সচেতন হয়েছে। আশা করেছিলাম, সেই জাতি অন্য যে সব পদানত জাতি তাদেরই মত একই দিকে সংগ্রাম করছে, তাদের প্রতি সে সহানুভূতি দেখাবে।

আমি ভারতে ফিরে যাচ্ছি এই বিশ্বাস নিয়ে যে জার্মানীর নতুন জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র সংকীর্ণ এবং স্বার্থপর তাই নয়,—সে ক্ষমতা মদ-মত্ত। মিউনিখে সম্প্রতি হের হিটলার যে বক্তৃতা দিয়েছে তাতেই আভাষিত হয়েছে নাৎজী দর্শনের মর্মবস্তু। আমরা তা মেনে নিতে পারি না। তার নতুন জাতিতত্ত্বের দর্শনের খুব দুর্বল বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। সেই জাতিতত্ত্ব সাদা রং-এর জাতির, বিশেষ করে জার্মান জাতির মহিমা কীর্তন করে। হের হিটলার বলেন যে সাদা রং-এর জাতি পৃথিবীর সব অংশেই আধিপত্য করবে এবং এটাই হচ্ছে নিয়তি। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যটি হচ্ছে এই যে আজ পর্যন্ত এশিয়রাই ইউরোপে প্রাধান্য করেছে অনেক বার বেশী, ইউরোপ যত বার না করেছে এশিয়ার উপর। মঙ্গোল তুর্ক, আরব, (মুর) হুন, এবং অন্যান্য এশিয় সম্প্রদায় ইউরোপে বার বার হানা

দিয়েছে। আমি এ কথাগুলো বলছি শুধু মাত্র আমার বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য। আমি অন্য জাতির উপর এক জাতির আধিপত্য করার নীতিকে মানি না। ইউরোপ এবং এশিয়া শান্তিতে পাশাপাশি থাকতে পারে না এই কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা ভুল, এটা প্রমাণ করার জন্যই আমি ঐ কথা বলেছি। জার্মানী নতুন জাতীয়তাবাদ, জাতি প্রাধান্য এবং স্বার্থপরতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে দেখে আমি খুব বেদনা বোধ করছি। হের হিটলার তার 'মেইন ক্যাম্পে' জার্মানীর পূর্বতম ঔপনিবেশিক নীতিকে নিন্দা করেছিল। কিন্তু নাৎজী জার্মানীরা আবার তার পুরনো উপনিবেশের কথা বলছে।

জাতি প্রাধান্যের দর্শন এবং স্বার্থপর জাতীয়তাবাদের রণ-ধ্বনি ছাড়া আরও অনেকগুলি ব্যাপার রয়েছে যা আমাদের পক্ষে অনেক বেশী ক্ষতিকারক। জার্মানী বৃটেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার জন্য ভারত এবং ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করতে পেছ-পা হয় না। আমরা ন্যাশনাল সোসালিষ্ট পার্টি'র অনেক কাজের অনেক নজীর দেখেছি। এই কাজ তারা শুরু করেছিল প্রায় দশ বছর আগে। তারা ইংরেজী ভাষায় এক প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল, যাতে এমন সব বক্তব্যের অংশ-বিশেষ ছিল যা ভারত ও ভারতের জনগণের বিরোধী। সেই প্রচার পুস্তিকায় হের হিটলার এবং ডঃ রোজেনবার্গের ভারত-বিরোধী মন্তব্যগুলিও স্থান পেয়েছিল।"

এই চিঠিখানির বয়ান অতি পরিষ্কারভাবেই নাৎজীবাদ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মূল্যায়ণ প্রতিফলিত করে। এ কথাও প্রমাণ করে, ভারতের মর্যদা হানি হয় এমন কোন কাজ তিনি করবেন না, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি শুধু মাত্র সহানুভূতি অর্জনের জন্য।

ইতালীতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব এবং ইতালীয় শ্রমিক শ্রেণীর ফ্যাসিবাদের প্রতিরোধ-ব্যর্থতা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের রামগড় বক্তৃতা একটি ঐতিহাসিক অমূল্য শিক্ষা। অনেকেরই তা জানা। তা সত্ত্বেও পুনরুল্লেখ করছি। "১৯২২ সনের ইতালী ছিল সবদিক থেকে পুরোপুরি প্রস্তুত। তার জন্য প্রয়োজন ছিল এক মাত্র একজন ইতালীয় লেনিনের। কিন্তু সময় পার হয়ে গেল। সেই ব্যক্তি এলেন না। ফ্যাসিস্ত নেতা বেনিতো মুসোলিনী সঙ্গে সঙ্গে সেই সুযোগ কাজে লাগালো। তার রোম যাত্রা এবং ক্ষমতা দখলের ফলে ইতালীর ইতিহাস সম্পূর্ণ এক ভিন্ন খাতে চলে গেল এবং শেষ পর্যন্ত ইতালী সোস্যালিষ্ট না হয়ে

ফ্যাসিস্তে পরিণত হোল। সন্দেহ এবং দোদুল্যমানতা ইতালীয় নেতাদের গ্রাস করে ফেলেছিল (রামগড়, মার্চ ১৯, ১৯৪০)।"

॥ দশ ॥

কোন কোন মহল থেকে বলা হয় সুভাষচন্দ্র ছিলেন শুধু জাতীয়তাবাদী নয়, উগ্র-জাতীয়তাবাদী। উগ্র-জাতীয়তাবাদী আর ফ্যাসিবাদ প্রায় সমতুল্য। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে তেমনি উগ্রজাতীয়তাবাদী বলে চিহ্নিত করাও কিন্তু সত্যের বিকৃতিকরণ।

সাম্রাজ্যবাদ একটি দুনিয়া-জোড়া রাজনৈতিক বাস্তবতা। এই বনিয়াদটিও আন্তর্জাতিক। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম একটি দেশেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সীমাবদ্ধ থাকলে সেই দেশও মুক্তি অর্জন করতে পারে না। আন্তর্জাতিক ভিত্তিতেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে, এ দৃষ্টিভঙ্গী সুভাষচন্দ্রের ছিল। তারই ফলশ্রুতি হোল লীগ ফর ইণ্ডিয়ান ফ্রীডমকে, যা গড়ে উঠেছিল ভারতে ১৯২৮ সনে, আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়ালিজম-এর সঙ্গে অনুমোদন করণ।

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন সম্পর্কে তার অভিমত আরও সুস্পষ্ট। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন এ দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন জরুরী। সেই সেতুবন্ধনের প্রবক্তাও তিনি ছিলেন। তিনি বলেছেন : মার্কস ও লেনিনের লেখা থেকে এবং কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক নীতি সংক্রান্ত অনুমোদিত বিবৃতি-বয়ান থেকে যে কম্যুনিজমকে জানা যায়, আমার বরাবর ধারণা এবং আমি নিঃসন্দেহ যে সেই কম্যুনিজম জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে পুরোপুরি সমর্থন করে ('কোন পথে' : সুভাষচন্দ্র)।

আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী আরও উজ্জ্বলতরভাবে প্রকাশ হয়েছে তাঁর হরিপুরা কংগ্রেসের (১৯৩৮) সভাপতির অভিভাষণে। তিনি বলেছেন : আমাদের সংগ্রাম শুধু মাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল শিলা। আমরা শুধু ভারতের মুক্তির জন্যই সংগ্রাম করছি না—করছি মানব জাতির জন্য। ভারত স্বাধীন হলে বিশ্ব-মানবতাকে রক্ষা করা যাবে।

গ্রেট বৃটেনেও সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই সমাজবাদের জন্য বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে ঔপনিবেশিক জাতিগুলির মুক্তি সংগ্রাম-গুলির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। হরিপুরা কংগ্রেসে আবার সুভাষচন্দ্র বলেছেন : "লেনিন অনেকদিন আগে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে গ্রেট বৃটেনের প্রতিক্রিয়া শক্তি-শালী হয় এবং বেঁচে থাকে পৃথিবীর অনেকগুলি দেশের দাসত্বের উপর নির্ভর করে। বৃটিশ অভিজাত শ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণী প্রধানতঃ বেঁচে আছে এই কারণে যে বৃটিশের শোষণের জন্য অনেকগুলি উপনিবেশ এবং সমুদ্রের পরপারে পরাধীন দেশগুলি রয়েছে। ঐ সমস্ত উপনিবেশ এবং পদানত জাতিগুলির মুক্তি গ্রেট বৃটেনের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের মূলেই নিঃসন্দেহে আঘাত হানবে। এবং তা গ্রেট বৃটেনে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করবে। সুতরাং এটি অত্যন্ত পরিষ্কার, উপনিবেশবাদ উৎপাটন না হলে গ্রেট বৃটেনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। সুতরাং ভারতে আমাদের মুক্তি সংগ্রাম এবং অন্যান্য উপনিবেশে মুক্তি সংগ্রাম আসলে গ্রেট বৃটেনের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম।"

এ সব সত্ত্বেও যদি কেউ সুভাষচন্দ্রকে উগ্র-জাতীয়তাবাদী বলে আখ্যায়িত করেন, তবে এটা তার অজ্ঞতা অথবা নিবুদ্ধিতা অথবা উদ্দেশ্যমূলক ইতিহাস বিকৃতকরণ।

॥ এগার ॥

নাৎজী জার্মানীতে অবস্থান করে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়াস একটি আত্ম-বিরোধ, এরূপ ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যবস্তু আর নাৎজীবাদ-এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। এ বাস্তবতাই অনেককে ঐ ধারণার বশবর্তী করে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে নিয়োজিত সংস্থাগুলি, যেমন ফ্রী-ইণ্ডিয়া সেন্টার বার্লিন, ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন প্রভৃতি জার্মানীর নাৎজী সরকার অথবা সামরিক বাহিনীর অধীনে থেকে কাজ করে নি। কাজ করেছে স্বাধীন ও সার্বভৌম অধিকার নিয়েই। এই সংস্থাগুলি কাজ করেছে জার্মান বিদেশ দপ্তরের অধীনে। ডিপ্লোম্যাটিক মর্যাদা নিয়ে, যেমন নিরপেক্ষ দেশগুলির মিশনগুলি

বার্লিনে কাজ করেছে। এ তথ্য পাওয়া গেছে ডাঃ বার্থ, যিনি জার্মান বিদেশ দপ্তরের অন্যতম প্রধান পরিচালক ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে। তিনি বলেছেন, জার্মান বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে সেইরূপই চুক্তি ছিল সুভাষচন্দ্রের। তিনি আরও বলেছেন, সুভাষচন্দ্র বসু অথবা আজাদ হিন্দ রেডিও নাৎজী পার্টির কোন কার্যসূচির অথবা জার্মান সরকারের যুদ্ধের প্রচার করে নি। এ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য ক্রমশই বেরিয়ে আসছে।

বোঝার জন্য একটি উপমা হাজির করছি। আমাদের দেশ বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের সময় বাংলাদেশ মিশনকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে শুধু বাংলাদেশের স্বাধীন স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু প্রথম মিশনকেই এদেশ থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করার সুযোগ আমাদের সরকার দিয়েছিল। আমাদের সরকার (ভারত সরকার) কি মুক্তি সংগ্রামের পরে কী ধরনের সরকার হবে, তার জন্য কোন আগাম চুক্তি করেছিল? আবার পি এল ও বা প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগঠনকে ভারতসহ অনেক সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ডিপ্লোম্যাটিক মর্যাদা দিয়েছে। তার অর্থ কী সবাই আরাফাতের রাজনৈতিক মতাদর্শের সংগে একমত? আবার এটাও তো জানা আছে, পি এল ও'র বিরোধী গোষ্ঠি রয়েছে। ভারত সরকার কী নাক গলাচ্ছে? হালে তামিল লিবারেশন ফ্রন্ট মাদ্রাজে সদর দপ্তর খুলে কাজ করছে। ভারত সরকার তাদের সে কাজ করতে সাহায্য করছে। তার অর্থ কী এই দাঁড়ায় যে ভারত সরকার শ্রীলংকাকে তামিল গেরিলাদের হাতে তুলে দিতে চায় অথবা ভারত সরকার তামিল এলামের সংগঠকদের সঙ্গে একমত। পৃথিবীর ডিপ্লোম্যাটিক আচরণে আকছার এসব ঘটনা ঘটে থাকে। সুভাষচন্দ্র সেই সুযোগই নিয়েছিলেন বার্লিনে। সেই সুযোগের সঙ্গে মতাদর্শের কোন সম্পর্ক নেই। প্রসংগত উল্লেখ্য, নাৎজী সরকারের মধ্যেই হিটলার-বিরোধী চক্র ছিল। তারাও অনেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য মদত দিয়েছেন।

জাপানের সরকারের সঙ্গেও অনুরূপ সম্পর্ক ছিল। ঘটনার বিবরণ এ প্রসংগে মুখ্য নয়। মুখ্য হচ্ছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি। আন্তর্জাতিক সংকটের সময়ে বিশেষ ঘটনাটিই সব নয়—ঘটনার পেছনে ঘটনা, তার রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে মুখ্যতঃ বিবেচ্য।

ইতিহাসের এ ঘটনা কেমন করে অস্বীকার করা যাবে যে লেনিন ১৯১৭ সনে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য নিয়ে মস্কোতে সমাবেশ করেছিলেন বল-

শোভিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার জন্য। আবার ইতিহাস থেকে এটাও তো মুছে ফেলা যাবে না যে স্তালিন ফ্যাসিস্ত জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেছিলেন। ফ্যাসিস্ত হিটলার রিবেনট্রপের সঙ্গে সাম্যবাদী নায়ক স্তালিন চুক্তি করলেন কেন? স্তালিন তার জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি মনে করি শান্তিকামী কোন দেশ প্রতিবেশী কোন দেশের শান্তি প্রস্তাবকে অস্বীকার করতে পারে না, সে দেশের নেতা যদি হয় হিটলার-রিবেনট্রপের মত দানব। তবে একটি মাত্র শর্তেই, আর সে শর্ত হোল এই যে নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, স্বাধীনতা এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবেনা। [সূত্র : দি মার্ক্সিষ্ট —জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৫।]

॥ বার ॥

আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সামরিক বাহিনী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি যুদ্ধে সামরিক কার্যকলাপ অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। চীনের মুক্তি সংগ্রাম তার সর্বশ্রেষ্ঠ নজীর। চীনের মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক মাও-ৎসে-তুং-এর একটি মন্তব্য খুব তাৎপর্যময়। তিনি বলেছেনঃ জাতীয় মুক্তির জন্য যুদ্ধে দেশপ্রেম হচ্ছে প্রয়োগগত আন্তর্জাতিকতাবাদ (in wars of national liberation patriotism is applied internationalism)।

॥ তের ॥

ফ্যাসিবাদের পরাজয় হয়েছে চল্লিশ বছর আগে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ নির্মূল হয় নি। ফ্যাসিবাদের জন্মের ও পুষ্টির কারণগুলি এখনও রয়েছে। সংকটে আকীর্ণ পুঁজিবাদই ফ্যাসিবাদের ধাত্রী। পুঁজিবাদের সংকটের যুগে ইতিহাস দুটি সম্ভাবনারই ইঙ্গিত অথবা সংকেত দেয়। হয় শ্রমিক শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মুক্তি অর্জন করবে—নয়তো ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করবে।

সূত্র পঞ্জী :

(১) ক্রস রোড্স,—সুভাষচন্দ্র বসু।

(২) ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল—সুভাষচন্দ্র বসু।

(৩) ভারতীয় বিপ্লবের মৌল প্রশ্ন—সুভাষচন্দ্র বসু।

(৪) নেতাজী সংগৃহীত রচনাবলী।

(৫) Bose Brothers and the Indian Struggle.

—Amiya Nath Bose.

(৬) Peoples Democracy, May 5, 1985

(৭) The Marxist, Jan-March 1985

(৮) Netaji Through German Lens,

A new discovery—Nanda Mukherjee

(৯) Subhas Chandra Bose and the Congress—Pradip Bose.

(১০) Subhas Chandra Bose : The Left Winger

—Bharati Mukherjee,

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

জার্মান ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে কমিউনিস্ট আত্মসমালোচনা প্রসঙ্গে

প্রলেতারীয় বিপ্লব . অবিরাম আত্মসমালোচনা করে চলে , আপন গতিপথে বারবার থমকে দাঁড়ায় . আপাত সমাপ্ত কাজ আবার গোড়া থেকে শুরু করার জন্য ফিরে আসে , নিজেদের প্রথম প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা. দুর্বলতা. অকিঞ্চিৎকরতাকে উপহাস করে নির্মম গভীরতা ।

কার্ল মার্কস[১]

১৯৮৫ সালের মে মাসে পৃথিবীর অন্যান্য দেশসহ আমাদের দেশেও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের চল্লিশতম বার্ষিকী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করার কাজে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ও জনগণের এবং ফ্রান্স, ইতালী সহ ইউরোপ ভূখণ্ডের অনেক দেশের কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের যে বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল তা এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই স্মরণীয়। কিন্তু মার্কসবাদীদের কাছে আপাত সাফল্যই পর্যাপ্ত নয়। মার্কসের ভাষায়ঃ প্রলেতারীয় বিপ্লব শত্রুকে ধরাশায়ী করে যেন একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যাতে পরক্ষণেই সে আবার মাটি থেকে নবশক্তি সঞ্চয় করে প্রবলতর রূপে তাদের সম্মুখীন হতে পারে।[২] এই কারণেই মার্কসবাদীদের শ্রেণীশত্রুদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার জন্য আত্মসমালোচনার নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে হয়। বিজয় উৎসব পালনের দিনেও তাই পিছন ফিরে দেখা দরকার হয় যে অতীতের কোন বিশ্লেষণে ভুল ছিল কিনা, গৃহীত কার্যক্রমের ফলে শত্রুপক্ষের কোন সুবিধে হয়েছিল কিনা ইত্যাদি। উদ্দেশ্য কেতাবী ইতিহাস চর্চা নয়। উদ্দেশ্য একটিই, সমাজ-রূপান্তরে অঙ্গীকারবদ্ধ মার্কসবাদীরা যাতে নবশক্তি সঞ্চয় করে প্রবলতর-রূপে শ্রেণীশত্রুর সম্মুখীন হতে পারে। অতীতের বিশ্লেষণ প্রয়োজন আগামী দিনের জন্য। সেই বিশ্লেষণ যদি ভ্রান্ত হয় বা কঠোর নির্মম ও বাস্তব সত্যকে

স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় তবে সে বিশ্লেষণও যথার্থ মার্কসবাদী আত্মসমালোচনা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না।

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে স্তালিনের 'সোস্যাল ডেমোক্রাসী=সোস্যাল ফ্যাসিজম =সাধারণ শত্রু' এই ফরমুলা ভ্রান্ত বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল একথা আজ অনেকেই মানেন। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে স্তালিনের লেখা, স্তালিনের পরিচালনাধীন কমিনটার্নের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত প্রস্তাব, জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টি'র বক্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়, একমাত্র প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রেই তাদের কথা উল্লিখিত হবে। যোগ্যতর অনেক ব্যক্তি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।[৩] বর্তমান প্রবন্ধের পরিসর অত্যন্ত সীমিত। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ও ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টি'র অবিসংবাদী নেতা পামিরো তোগলিয়াত্তির (১৯৬৪ সালের আগস্টে ইনি মারা যান) একটি আত্মসমালোচনামূলক রচনাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টি'র তাত্ত্বিক মুখপত্র Rinascita নামক পত্রিকায় জুলাই-আগষ্ট ১৯৫৯ সংখ্যায় 'আন্তর্জাতিক-এর ইতিহাস-এর কয়েকটি সমস্যা' শিরোনামায় তোগলিয়াত্তির একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধটির একটি দীর্ঘ সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয় 'ওঅল্ড' মার্কসিস্ট রিভিউ' পত্রিকায় ঐ বছরের নভেম্বর মাসে। তৃতীয় আন্তর্জাতিক-এর ইতিহাস সম্পর্কে তোগলিয়াত্তির বক্তব্যে কতটা পরিমানে ঐতিহাসিকের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনার প্রভূত অবকাশ আছে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় প্রশ্নে তৃতীয় আন্তর্জাতিক-এর বিশ্লেষণ সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন তাকে কেন্দ্র করেই এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ।

তিরিশের দশকে তোগলিয়াত্তি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর কেন্দ্রীয় কার্য-নির্বাহক সমিতির একজন বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন, একথা হয়তো সকলেই জানেন। ১৯৫৯ সালে লেখা তাঁর এই প্রবন্ধ আত্মসমালোচনামূলক একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তোগলিয়াত্তির এই আত্মসমালোচনা হিটলারের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আমলে অনুসৃত পৃথিবীর সব দেশে কমিউ-নিষ্ট পার্টি'র নীতিরও সমালোচনা। আমরা উক্ত প্রবন্ধের একটি প্রাসঙ্গিক অংশের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই।

তোগলিয়াত্তি ঐ প্রবন্ধে বলেন : সব চেয়ে বড় ভুল হয় সোস্যাল ডেমো-ক্র্যাসিকে সোস্যাল-ফ্যাসিজম হিসাবে পরিণত করায় ; আর এই সংজ্ঞা থেকে যে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছিল তাও কম ভ্রান্ত ছিল না। এটা বলা ঠিক হবে যে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক নেতারা বিপ্লবী গণআন্দোলন বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং এমনকি অস্ত্রশক্তির জোরে সেই আন্দোলনকে দমন করতে চেয়েছিলেন, যেমনটি করেছিলেন ফ্যাসিবাদীরা… কিন্তু এই দুটি আন্দোলনের চরিত্র ছিল স্বতন্ত্র। ফ্যাসিবাদীদের সমর্থন করেছিল পুঁজিপতির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশসমূহ, আর সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে যোগ ছিল সম্পূর্ণ অন্য গোষ্ঠিসমূহের যারা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বা বুর্জোয়া শান্তিবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। এই দুটি আন্দোলনের ভিত্তিও ছিল আলাদা : বহু দেশে শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমকারী জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংস্কারপন্থী-দের নেতৃত্বাধীন সংগঠনসমূহে যুক্ত ছিল এবং ফ্যাসিবাদীরা এই সব সংগঠনের বিরুদ্ধে হিংস্র আক্রমণ চালায় এবং তাদের ধ্বংস করে দিতে চেষ্টা করে।

তোগলিয়াত্তি আরও বলেন : ফ্যাসিবাদের অগ্রগতি যে ইঙ্গিত বহন করে আনে সেই ইঙ্গিতের—সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও স্বাধীনতার ধ্বংস সাধনের ইঙ্গিত—তাৎপর্য ঠিক সময় বোঝা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সোস্যাল ফ্যাসিজম-এর তত্ত্ব উপস্থাপনের মৌলিক অর্থ এই দাঁড়ায় যে সংস্কারপন্থী নেতারা ও সামগ্রিকভাবে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসী ফ্যাসিবাদের অনুরূপ লক্ষ্য অনুসরণ করে চলেছিল। এই ধারণা ছিল স্পষ্টতই ভ্রান্ত। কারণ এটাই ঘটার কথা ছিল এবং বাস্তবে তাই ঘটেছিল—যে সোস্যাল-ডেমেক্র্যাসীর একটি অংশ (যে অংশটি খুব নগণ্য ছিল না) গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত ছিল…এই ধারণার ভিত্তিতে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক জনগণের ও তাদের সংগঠনসমূহের সঙ্গে কর্মভিত্তিক ঐক্য গড়ে তোলা খুব দুরূহ হয়ে পড়েছিল ; যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তা ছিল একান্তই বিক্ষিপ্ত ধরনের এবং তা পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে নি।

তোগলিয়াত্তি খোলাখুলি স্বীকার করেছেন, ঐক্যের এই অভাবই জার্মানীর নাৎজী ফ্যাসিবাদের বিজয়ে নিশ্চিতভাবে সহায়তা করেছে।

প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া ভালো। তাতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ কম। কেউ মনে করতে পারেন, তোগলিয়াত্তি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে যে ভুল করেছিলেন, সে ভুল তো

তিনি তিরিশ বছর পরে হলেও খোলাখুলি স্বীকার করেছেন। ১৯৩০-৩৩-এ তিনি সত্যি সত্যিই সোস্যাল-ফ্যাসিজম-এর তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং হিটলারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর চোখে সে ভুল ধরা পড়ে। এবং আন্তর্জাতিকের ইতিহাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি ভুল স্বীকার করে নিলেন, এতে তো তাঁর মার্কসবাদী চরিত্রই প্রকাশ পেয়েছে। এ রকমের ধারণা সঠিক হলে আপত্তির বিশেষ কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু মুসকিল হচ্ছে, এরকম ধারনা পোষণ করার বাস্তব কোনও ভিত্তি নেই। প্রথমত, ১৯৩০-এর আগেই তোগলিয়াত্তি সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে যে মৌলিক ও সামাজিক পার্থক্য আছে তা বুঝেছিলেন। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তাত্ত্বিক মুখপত্র 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে[৪] তোগলি-আত্তি সঠিক বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু ১৯৩০-৩৩ এই ক'বছর যখন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও পৃথিবীর বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি সোস্যাল-ফ্যাসিজম-এর তত্ত্ব প্রচারে ও সেই তত্ত্ব প্রয়োগে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় তোগলিয়াত্তি এই বিষয়ে নীরব ছিলেন। তাঁর আত্মসমালোচনায় এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত, এই সময় অর্থাৎ জার্মানীর তথা ইওরোপের শ্রমিক শ্রেণীর এই চরম সংকটের বছরগুলিতে ট্রটস্কি ও তাঁর অনুগামীরা (ইন্টারন্যাশনাল লেফট অপোজিশন) পত্রপত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা মারফৎ[৫] সোস্যাল-ফ্যাসিজম তত্ত্বের প্রয়োগ কত ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক এবং সেই তত্ত্বের প্রয়োগ জার্মানীর শ্রমিক শ্রেণীকে কি ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে, হিটলারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিতে পারে সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছিলেন। ট্রটস্কি সেই সঙ্গে এই অভিমতও প্রকাশ করেন যে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর যুক্তফ্রন্টই এই চরম সর্বনাশের হাত থেকে জার্মানীকে বাঁচাতে পারে। এই কঠিন সংকটের মুহূর্তে ট্রটস্কি যখন এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন তখন তোগলিআত্তির ভূমিকা কি ছিল? উত্তর একটাই: নীরবতা পালনই সেদিন তাঁর কাছে সুবিবেচনার কাজ বলে মনে হয়েছিল।

এই নীরবতা কি ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর? তোগলিআত্তির কাছে 'বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য' প্রশ্নটিই সর্বাগ্রে বিবেচ্য ছিল! এবং সেই ঐক্যের প্রতীক বলে চিহ্নিত সোভিয়েত ইউনিয়নের (সে দেশের ক্ষমতাসীন আমলা-তান্ত্রিক গোষ্ঠী?) প্রতি নিঃশর্ত 'পূর্ণ সংহতি' জানানোই কি সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছিল?

তোগলিআত্তির 'আত্মসমালোচনা'মূলক প্রবন্ধ পাঠ করে আমাদের মনে যে তিনটি প্রশ্ন জেগেছে সেগুলি দলনির্বিশেষ মার্কসবাদী আন্দোলনের কর্মীদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করছি।

প্রথমত, কমিন্টার্নিস্ট শিবিরে জার্মান কমিউনিস্ট নেতা থেলমান (Thalmann)-কে নিয়ে যে 'মিথ' বা অতিকথামূলক কাহিনী গড়ে উঠেছে তার বাস্তব কোন ভিত্তি আছে? ১৯৩০-৩৩, এই সময়ে থেলমান ছিলেন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা। স্তালিনের অতি বিশ্বস্ত এই কমিউনিস্ট নেতা সম্পর্কে বলা হয় যে, সমস্ত রাজনীতিক প্রশ্নে তাঁর বিশ্লেষণ ছিল নির্ভুল। কেউ কেউ তাঁকে 'জার্মনীর লেনিন' এই অভিধায় ভূষিত করতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি। কমিউনিস্ট কর্মীরা সেই ধারণা কি আজও পোষণ করেন?

ফ্যাসিবাদী নগ্ন সন্ত্রাসের শিকার থেলমান এবং হাজার হাজার জঙ্গী জার্মান কমিউনিস্টদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার কোন অভাব আছে বলে মনে করলে ভুল করা হবে। তাঁদের চরম আত্মত্যাগ কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে গৌরবের কথা। এই আত্মত্যাগ একদিকে যেমন আমাদের শ্রদ্ধায় বিনত করে অন্যদিকে মার্কসবাদী হিসাবে তা থেকে আমাদের শিক্ষণীয়ও কিছু থাকে। থেলমান-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার সঙ্গে সঙ্গেই একথাও কি আমাদের মনে পড়বে না যে, থেলমানই জার্মানীতে সোস্যাল-ফ্যাসিজম তত্ত্বের প্রধানতম প্রবক্তা ছিলেন? তাঁর রাজনীতিক সাফল্যের মূল কারণ কি স্তালিন ও সোভিয়েত আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রতি অনড় আনুগত্য? তিনিই কি সোস্যাল-ফ্যাসিজম-এর ভ্রান্ত তত্ত্বের প্রতিবাদী কমিউনিস্ট কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নি? তিনি কি ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়কে অনিবার্য বলে মেনে নেননি?

থেলমান জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্র Die Internationale পত্রিকার জুলাই-আগস্ট ১৯৩২ সংখ্যায় লেখেন: শ্রমিক আন্দোলনে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোই হবে আমাদের এখনকার মুখ্য স্ট্র্যাটেজি।...যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সোস্যাল-ফ্যাসিস্ট নেতাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারছে ততক্ষণ এই লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে পাওয়া যাবে না।[৫]

নাৎজী বিপদকে প্রতিহত করার জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠনের আশু প্রয়োজনীয়তা

সম্পর্কে সেদিন ট্রটস্কি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন সেই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে হিটলারের ক্ষমতায় আসার ছ'মাস আগে লেখা ঐ একই প্রবন্ধে থেলমান আরও লিখলেন : মিঃ ট্রটস্কি এবং শ্রমিকশ্রেণীর ঐ একই ধরণের পরামর্শদাতারা শ্রমিক শ্রেণীর কাছে যে প্রস্তাব রাখতে চাইছেন সেই প্রস্তাব এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে বিপ্লবী পার্টির ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও সোস্যাল-ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, হিটলার পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। এঁদের পরামর্শমত চলতে গেলে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ পরিহার করতে হয় এবং হিণ্ডেনবার্গপন্থী সোস্যালিস্টদের সঙ্গে, নোস্কে এবং গ্রেৎসেসিনস্কিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হয়।[৭] [পল ফন হিণ্ডেনবার্গ (১৮৪৭-১৯৩৪) : প্রুশিআন ফিল্ড মার্শাল . সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের বিরোধিতা করে ইনি ১৯২৫ সালে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৩২ সালে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সমর্থনে ঐ পদে পুনর্নির্বাচিত হন। ইনি ১৯৩৩-এর জানুআরিতে হিটলারকে চান্সেলার পদে নিযুক্ত করেন। গুস্টাভ নোস্কে (১৮৬৮-১৯৪৬) প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক মন্ত্রী। ১৯১৯.সালের স্পার্টাসিস্ট অভ্যুত্থান দমনের নায়ক। কার্ল লিবনেখট এবং রোজা লুক্সেমবুর্গকে খুন করার আদেশ ইনিই দেন। অ্যালবার্ট সি. গ্রেৎসেসিনস্কি (১৮৭৯-১৯৪৮) সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বার্লিন কমিটির প্রধান।]

থেলমান-এর বক্তব্য ছিল : ব্র্যাণ্ডলারপন্থীরা, ট্রটস্কিপন্থীরা এবং এস. এ. পি. সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ঐক্যের যে প্রস্তাব দিয়েছেন তার আসল উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে ঐক্যের যে আকাঙ্ক্ষা আছে তাকে ভ্রান্ত রাজনীতিক খাতে প্রবাহিত করা। যখন সেই ধরনের দাবি কমিউনিস্ট পার্টি নীতির ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করে তখন কোন কোন সময় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। আর এই দলত্যাগীরা খুব সচেতনভাবে সেই অসন্তোষের মনোভাব বাড়িয়ে তুলতে ইন্ধন যোগায়। [হাইনরিখ ব্রাণ্ডলার (১৮৮১- ?) স্পার্টাকুসবুণ্ডের সদস্য ছিলেন, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২১-এর মার্চ অভ্যুত্থান থেকে ১৯২৩-এর বিপর্যয়ের কাল পর্যন্ত পার্টির নেতৃত্ব দেন ও সেই কারণে বলির পাঁঠা হিসেবে তাঁকে ১৯২৪-এ নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করা হয়। তিনি বুখারিন-এর 'রাইট অপোজিসন'-এর সঙ্গে যোগ রেখে জার্মান

কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করেন। এই গোষ্ঠী 'কমিউনিস্ট পার্টি অপোজিসন' (কেপিও) নামে পরিচিত ছিল। ১৯২৯ সালে কেপিও জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়। এই সময় কমিনটার্নের সঙ্গে যুক্ত সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টি থেকেই বুখারিনপন্থী গোষ্ঠীসমূহকে বিতাড়িত করা হয়। আমেরিকার লাভস্টোন গ্রুপ-এর মত এই গোষ্ঠী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সক্রিয় ছিল॥ এস. এ. পি.—সোস্যালিস্ট ওআর্কার্স' পার্টি। বিক্ষুব্ধ বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা ১৯৩২ সালে ব্রেসলো-তে এই দল প্রতিষ্ঠা করেন: অনেক প্রাক্তন কমিউনিস্টও এই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।]

থেলম্যান আরও বলেন, যদিও ফ্যাসিবাদ এবং সোস্যাল-ফ্যাসিজম সমার্থক নয় কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে বর্তমানে জার্মানীতে বিকাশের যে স্তর তাতে এই শক্তি তাদের 'আসল রং'-এ ধরা পড়েছে। এরা যমজ। কমরেড স্তালিন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে তুলে ধরেন। সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে উপেক্ষা করা জনগণের মধ্যে এক নতুন ও বিপজ্জনক মোহ সৃষ্টি করতে পারে যে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ফ্যাসি-বিরোধী শক্তি।...পার্টির গৃহীত লাইন অনুযায়ী, এবং কমিনটার্নের সাহায্যে, আমাদের পার্টি ইদানীং যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসীর বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামে যে-সব প্রবণতা সেই সংগ্রামকে দুর্বল করতে চাইছে সেই সব প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাসীর বিরুদ্ধে মূল আক্রমণ এখন পরিচালনা করা উচিত নয়—এই মতের বিরুদ্ধে এবং এই ক্ষেত্রে সব ধরনের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে আমাদের পার্টি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বার্লিনের কমিউনিস্টরা নাৎসীদের বিরুদ্ধে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে মিলিতভাবে যে শোভাযাত্রা পরিচালনা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক সঙ্গতভাবেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এস. এ. পি., ব্র্যাণ্ডলারপন্থী এবং ট্রটস্কিপন্থীরা প্রায়শই কমিউনিস্ট পার্টি ও সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে মৈত্রীর ও যুক্ত প্রার্থী-তালিকার প্রশ্ন প্রায়শই উত্থাপন করে থাকে। ট্রটস্কি একাধিকবার তাঁর রচনা মারফত জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এবং এস. পি. ডি. নেতাদের মধ্যে আলোচনার দাবি উত্থাপন করে শ্রমিক শ্রেণীকে বিপথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেছেন।[৮]

ট্রটস্কিবাদ কারুর কাছে সমকালীন বিপ্লবী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলে গ্রহণীয় হতে পারে, কারুর কাছে বা তা মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি বলে অগ্রাহ্য

হতে পারে। দৃষ্টিকোণের ভিন্নতা থাকতেই পারে। কিন্তু ইতিহাসের সত্য বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ট্রটস্কি সোস্যাল ডেমোক্র্যাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে প্রতিনিবৃত্ত হবার কোন পরামর্শ জার্মানীর শ্রমিক শ্রেণীকে দেন নি। ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামী ঐক্য ও নির্বাচনী সমঝোতার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করে ট্রটস্কি বলেন: 'No retraction of our Criticism of Social Democracy. No forgetting of all that has been···No Common Platform with the Social Democracy, or with the Leaders of the German trade unions, no Common publications, banners, placards! March separately, but strike, together! Agree only how to strike, whom to strike, and when to strike! Such an agreement can be concluded even with the devil himself, with his grandmother, and even with Noske and Grezesinsky. On one condition, not to bind one's hands.[১] একমাত্র ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমেই সংস্কারপন্থী সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতাদের থেকে তাদের প্রভাবাধীন জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর; সোস্যাল ডেমোক্র্যাসীকে ফ্যাসিবাদের 'যমজ' বলে চিহ্নিত করে নয়—এটাই ছিল ট্রটস্কির মত। থেলমান প্রমুখ কমিউনিষ্ট নেতারা ট্রটস্কির সেদিনকার সে সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেন নি।

দ্বিতীয়ত, এটা খোলাখুলি বলা দরকার যে সোস্যাল ফ্যাসিজম-এর ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক তত্ত্ব ও জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনে সেই তত্ত্ব প্রয়োগের মূল দায়িত্ব যদি থেলমান-এর উপর বর্তায়, তবে সাধারণভাবে সেই ভ্রান্ত তত্ত্ব আন্ত-র্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ও জার্মানীর কমিউনিস্ট আন্দোলনে চাপিয়ে দেওয়ার মূল দায়িত্ব নিঃসন্দেহে স্তালিনের। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্র Die Internationale পত্রিকার ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় স্তালিন লেখেন: ফ্যাসিবাদ হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি জঙ্গী সংগঠন যা সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসীর সক্রিয় সমর্থনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুগত বিচারে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসী হচ্ছে ফ্যাসিবাদের বামপন্থী অংশ। এ বিষয়ে মনে না করার সঙ্গত কারণ নেই যে বুর্জোয়া শ্রেণীর জঙ্গী সংগঠনসমূহ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসীর সক্রিয় সমর্থন ছাড়া সংগ্রামে জয়লাভ করতে বা দেশের উপর তার শাসন-কর্তৃত্ব কায়েম করতে সমর্থ হবে। একই ভাবে এটা মনে না করারও কারণ নেই যে

বুর্জোয়াদের জঙ্গী সংগঠনসমূহের সমর্থন ছাড়া সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসীও এই সংগ্রামে চূড়ান্ত জয়লাভ করতে বা দেশ শাসন করতে সমর্থ হবে। ফ্যাসিবাদ এবং সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসী পরস্পর বিরোধী নয়; পরন্তু একে অপরের পরিপূরক। তারা একে অপরের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত নয়; তারা যমজ।[১০]

স্তালিনের বলার কায়দা অনুসরণ করে বলা যায়, এটা ধারণা না করার কোন কারণ নেই যে কমিনটার্ন প্রশাসনের চাপ ছাড়া জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এই ভ্রান্ত ধারণা আঁকড়িয়ে থাকত না। একইভাবে এটা ধারণা না করারও কারণ নেই যে ওই চাপ ছাড়া সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসী এবং ফ্যাসিবাদের যুক্ত ফ্রন্ট গঠন আটকিয়ে রাখা যেত না। সুতরাং এই ধারণা না করারও কারণ নেই যে স্তালিনের তাত্ত্বিক তৎপরতা ছাড়া হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারত না।

এ তথ্য হয়তো অনেকেরই জানা আছে যে ১৯৩৮ সালে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। বিংশতি কংগ্রেসে (ফেব্রুআরি ১৯৫১) ক্রুশ্চভ অভিযোগ করেন যে স্তালিনের পার্সোন্যালিটি কাল্ট বা ব্যক্তি-স্তুতি ১৯৩৮-এর ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়েছে। নিঃস্তালিনীকরণের যুগে তাই নতুন করে লেখা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি'র ইতিহাস (ইংরেজী সংস্করণ, মস্কো ১৯৬০)। রাজনীতির পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস পুনর্লিখনের নীতি স্তালিনের আমল থেকে অদ্যাবধি চলে আসছে। ক্রুশ্চভ-উত্তর আমলেও অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ইংরেজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৭০)। তোগলিআত্তি ক্রুশ্চভ আমলে লিখিত ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাঁর শেষ দলিলে[১১] স্তালিন আমল সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর মতে, ঐ ইতিহাসে বাস্তব সত্য বিবৃত হয়েছিল? ইতিহাসের বিকৃতি বন্ধ হয়েছিল? বর্তমান প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গ আলোচনার সুযোগ নেই। উৎসাহী পাঠকেরা আর্নেস্ট জার্মান-এর (ম্যাণ্ডেল-এর ছদ্মনাম?) লেখা প্রবন্ধ দেখতে পারেন।[১২] কিন্তু বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে যে প্রসঙ্গটি প্রাসঙ্গিক তা হল: নাৎজী ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় সম্পর্কে ১৯৬০-এর ইতিহাসে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার সঙ্গে তোগলিআত্তি কি একমত ছিলেন? না ভিন্নমত পোষণ করতেন? স্তালিনের সদর্থক ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯৬০-এর ইতিহাসে লেখা হয়

(১৯৭০-এর 'ইতিহাস'-এরও একই বক্তব্য) যে একজন বিশিষ্ট তত্ত্ববিদ ও সংগঠক রূপে তিনি 'ট্রটস্কিপন্থী' দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেন।[১৩] তোগলিআত্তি কি মনে করতেন যে ১৯৩০-৩৩ এই সময়ে জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় প্রতিহত করার যে প্রস্তাব ট্রটস্কি দিয়েছিলেন তা ভ্রান্ত ছিল? তাঁর আত্মসমালোচনার তিরিশ বছর পরে হলেও, তিনি স্তালিনের সোস্যাল-ফ্যাসিজম তত্ত্বের সমালোচনা করেন। সেই সমালোচনার যুক্তিসিদ্ধ পরিণতি কি এই নয় যে সেদিন ঐ প্রশ্নে ট্রটস্কির বক্তব্য সঠিক ছিল? দুর্ভাগ্য এই, তোগলিআত্তির আত্মসমালোচনায় এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। তোগলিআত্তির উত্তরাধিকার বহনকারী ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টির তরফে স্তালিন ও স্তালিনবাদের গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অপহরণকারী দিক সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে তাঁদের নির্দিষ্ট কোন বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন: সোস্যাল-ফ্যাসিজম তত্ত্বের বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও তোগলিআত্তি সেদিন নীরব ছিলেন কেন? সংগঠনের শৃংখলারক্ষার খাতিরে? যদি তা হয়ে থাকে তবে সে 'শৃংখলা' কি আমলাতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতার সমপর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না? এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক প্রশ্নে নীরবতা কি অন্ধ আনুগত্যের পরিচয় বহন করে না? অন্ধ আনুগত্য কি মার্কসবাদী নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? শ্রমিক শ্রেণীর কাছে, নিজের পার্টির কাছে সত্য অনুদ্ঘাটিত রাখা লেনিনীয় শৃংখলানীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। লেনিনীয় শৃংখলানীতি স্তালিনীয় আমলাতান্ত্রিক শৃংখলানীতির সমার্থক নয়। এ বক্তব্য কি আজও কমিউনিষ্ট আন্দোলনে স্বীকৃতি পাবে না?

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি তোগলিআত্তির আত্মসমালোচনা, যা আসলে স্তালিনবাদী সোস্যাল-ফ্যাসিজম তত্ত্বের সমালোচনা, করতে সময় লাগে প্রায় তিরিশ বছর। কিন্তু এখানে বলে রাখা দরকার, সোস্যাল-ফ্যাসিজম-এর তাত্ত্বিক সমালোচনা প্রকাশিত হতে এত দীর্ঘ সময় লাগলেও হিটলার দৃঢ়ভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার কিছু পরেই (অনেক দেরি হয়ে গেলেও) কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম বিশ্ব কংগ্রেসে (মস্কো, জুলাই-আগস্ট ১৯৩৫) কার্যত এই নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং অতিবামপন্থা পরিহার করে 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে

যুক্তফ্রন্ট'-এর নীতি গৃহীত হয়। শ্রেণীসমন্বয়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পপুলার ফ্রন্ট-এর নীতি নির্ধারণে ডিমিট্রভ, তোগলিআত্তি (সে সময়ে আরকোলি নামে পরিচিত), ম্যানিউলস্কি প্রমুখের কি ভূমিকা ছিল এবং কোন্ অবস্থার চাপে এই কৌশলগত পরিবর্তন সাধিত হল এবং তার পরিণতিই বা কি দাঁড়ায় তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। (এখানে শুধু এটা উল্লেখ করা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে স্তালিন লাইন পরিবর্তনের 'সবুজ সংকেত' দেন একমাত্র এই শর্তে যে গত দশ বছর যাবৎ যে 'সাধারণ লাইন' অনুসৃত হয় সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা চলবে না। লাইন ঠিক ছিল, তার প্রয়োগে ভুল হয়েছিল এই যুক্তিতে তার দায়িত্ব বর্তায় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি সহ অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের উপর। এইভাবেই সেদিন স্তালিনের অভ্রান্ততা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়েছিল।[১৪]) নিঃস্তালিনীকরণের যুগেই সর্বপ্রথম সোস্যাল-ফ্যাসিজম তত্ত্বের সংযত সমালোচনা সুরু হয়—তোগলিআত্তির উল্লিখিত প্রবন্ধই তার সাক্ষ্য। দীর্ঘদিন যাবৎ বহু কমিউনিস্ট কর্মীর যা ছিল স্বগত-চিন্তা, তোগলিআত্তিই সর্বপ্রথম তাকে লিপিবদ্ধ করেন। সে কৃতিত্ব তাঁর নিশ্চয়ই প্রাপ্য। আমরা যতদূর জানি, ১৯৬৬ সালে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে 'জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়েছে। সে বইয়ে ১৯৩০-৩৩ এই সময়ের জর্মান কমিউনিষ্ট পার্টির তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসৃত হয়েছিল তার সংযত কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করা হয়েছে। ঘটনার পর লেখা এই সমালোচনায় যা বলা হয়েছে তাতে নাৎজী ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় ও ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধে ট্রটস্কির প্রস্তাব যে সঠিক ছিল তা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বলা বাহুল্য ট্রটস্কির নাম সেখানে অনুল্লিখিত।[১৫] কারণ সহজেই অনুমেয়।

বিপ্লবী মার্কসবাদীদের কাছে আত্মসমালোচনার পদ্ধতি আত্মরক্ষার সুচতুর কৌশল নয়। মার্কসবাদী আত্মসমালোচনার উদ্দেশ্য : বাস্তব সংগ্রামের কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেদের যাচাই করে নেওয়া ও বিপ্লবী হিসাবে নিজেদের পরিশুদ্ধ করে নেওয়া, যাতে নিজেদের অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে উঠে আগামী দিনের সংগ্রামে নিজেদের যোগ্যতা অর্জন করা যায়। আত্মসমালোচনা তখনই মার্কসবাদী পদবাচ্য হয় যখন তা সত্যকে—তা সে যতই অপ্রীতিকর, রূঢ় ও বেদনাদায়ক হোক না কেন—স্বীকৃতি জানাতে কুণ্ঠিত হয় না। কমিউনিস্ট আন্দোলনে আত্মজিজ্ঞাসার সেই পরিবেশ আজও সৃষ্টি হয়েছে কি? এইটাই জিজ্ঞাসু মনের সৎ ও ঐকান্তিক প্রশ্ন।

সূত্র নির্দেশ

১, কার্ল মার্কস, 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার,' মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ), প্রথম খণ্ড প্রথম অংশ প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ২৪৩-৪।

২. তদেব, পৃ ২৪৪।

৩. Fernando Claudin, The Communist Movement : From Comintern to Cominform, trans , Brian Pearce and Francis Mac Donagh, Penguin Books, 1975, esp. pp. 152 ff, Nicos Poulantzas, Fascism and Dictatorship : The Third International and the Problem of Fascism, trans., Judith White, New Left Books, London, 1974 ; Martin Kitchen, Fascism, Macmillan, London, 1976, CH. 1 ; Georg Jungclas, 'The Tragedy of the German Proletariat', in Ernest Mandel (ed. with an introduction), 50 Years of World Revolution 1917-1967, Menit Publishers, New York, 1968, pp. 107-45 ; Leon Trotsky, The Struggle against Fascism in Germany, intro : Ernest Mandel, Pathfinder Press Inc., New York, 1976.

৪. Henri Vallin, 'Togliatli Condemns the Policy of "Social Fascism"····· ,' Fourth International, No. 8, Winter 1959-60, p. 22.

৫. Leon Trotsky, op. cit.

৬. Quoted in Vallin, op. cit., p. 23.

৭. Ibid.

৮. Jane Degras (ed.). The Communist International (1919-1943) : Documents, Vol. III, 1929-1943, Oxford University Press, pp. 232-3.

৯. 'For a Workers' United Front against Fascism', in Trotsky, op. cit. pp. 141, 138-9.

১০. Quoted in Mandel (ed.), Fifty years···, op. cit., p. 129 ; Claudin, op. cit., p. 153.

১১. **'The Yalta Memorandum', in Palmiro Togliatti, On Gramsci & Other Writings, ed. and intro. Donald Saysoon, Lawrence and Wishart, London, 1979, pp. 285-97, esp. pp. 296-7.**

১২. 'Thirty Questions and Answers about the History of the Communist Party of the Soviet Union', Fourth International, Nos. 9 & 10, 1960.

১৩. History of the Communist Party of the Soviet Union, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1960, pp. 670-1. See also A Short History of the Communist Party of the Soviet Union, Progress Publishers, Moscow, 1970, p. 300.

১৪. Claudin, op. cit., p. 175.

১৫. Mandel's Introduction to Leon Trotsky, The Strurggle against Fascism, op. cit., pp. 25 & 43.

সুধী প্রধান

ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলন ও সংস্কৃতি ফ্রণ্টের ভূমিকা

ফ্যাসিজম বলতে সাধারণতঃ লোকের ধারণা স্বৈরতন্ত্র, একনায়কত্ব-ভিত্তিক যথেচ্ছাচার এবং অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থার তাত্ত্বিক নাম। এদেশে জরুরী অবস্থা চালু হবার পর এই ধারণা বহু মানুষের মনে দৃঢ়মূল হয়েছে। কিন্তু ফ্যাসিজম নিছক ব্যক্তি-ভিত্তিক নয়।

ফ্যাসিজমো বা fascism ইতালির কথ্য ভাষা থেকে এসেছে যার অর্থ হ'ল রাজনৈতিক চেতনায় ঐকবদ্ধ কিছু লোকের সমষ্টি। পুরনো রোম-রাজত্বে বড় বড় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একদল লোক কিছু লাঠি নিয়ে যেত, যার মাথায় কুড়োল/খাঁড়া থাকতো না। এই লাঠিগুলিকে fasces বলা হ'ত। তার থেকেই fascist কথাটার জন্ম। তেমনি নাৎজী কথাটা এল ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টি' থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকে এই দুটি নীতি চালু হয় ইতালি ও জার্মানীতে। লক্ষ্য করার বিষয় এই দুটি মতবাদের প্রধান প্রবক্তারা সমাজতন্ত্রী দলগুলি থেকে এসেছিল।

প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিজম কাকে বলে তা' জানা দরকার। ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল ঘোষণা করেঃ "Under certain special historical conditions the progress of the bourgeois, imperialist,, re-actionary offensive assumes the form of fascism. These conditions are instability of capitalist relationships ; the existence of considerable declassed social elements ; the pauperisation of broad strata of the urban petti-bourgeoise and of the intelligentsia ; discontent among the rural petti-bourgeoisies and, finally, the constant menace of the mass proletarian action. In order to stabilise and perpetuate its rule the bourgeoisies

is compelled to an increasing degree to abandon the parliamentary system in favour of the fascist system, which is independent of inter-party arrangements and combinations. The Fascist system is a system of direct dictatorship, ideologically masked by the "national idea"and professions (in reality representation of the various groups of the ruling class). It is a system that resorts to a peculiar form of social demagogy (anti-semitism, occasional sorties against usurer's capital and gestures of impatience with the parliamentary "talkingshop") in order to utilise the discontent of the petti-bourgeois, the intellectual and other strata of society ; and to corruption through the building up of a compact and well-paid hierarchy of fascist units, a party apparatus and a bureaucracy. At the same time, Fascism strive to permeate the working class by recruiting the most backward strata of the workers to its ranks ; by playing upon their discontent, by taking advantage of the inaction of social democracy, etc."···

মোদ্দা কথা হ'ল ঃ বিশেষ কয়েকটি ঐতিহাসিক অবস্থা ও কারণে ধনতন্ত্র তার প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী বিকাশে ফ্যাসিজম নীতি গ্রহণ করে যখন ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলি চঞ্চল হয়, সমাজে শ্রেণীচ্যুত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, শহর ও গ্রামের বিরাট সংখ্যক পেটি-বুর্জোয়া গরীব হয়, বুদ্ধিজীবীদেরও বড অংশ নিঃসম্বল হয় এবং অনবরত সর্বহারাশ্রেণীর আক্রমণের আশংকা ধনতান্ত্রিকদের হয়। এরা জাতীয়তাবাদের বুলি আওড়ায় এবং পার্লামেন্টারী প্রথাকে বাজারের দর কষাকষি বলে মনে করে। এদের কলাকৌশলের মধ্যে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর সব থেকে অনুন্নত অংশকে তাদের অসন্তুষ্টির কারণগুলি কাজে লাগিয়ে দলে ভেড়ানো এবং সংকটকালে ধনতন্ত্রবিরোধী বোলচাল দিয়ে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করার পর ধনতন্ত্রের সন্ত্রাসমূলক স্বৈরতন্ত্রকে চালু করা। আসল উদ্দেশ্য, সামাজিক বিপ্লবকে রোখা। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের কার্যসূচী সম্পর্কিত প্রস্তাবে আরো বিস্তৃতভাবে উপরোক্ত বয়ানের ব্যাখ্যা আছে যার সংক্ষিপ্তসার আমি বাংলায় দিলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই ফ্যাসিস্ত ইতালি, নাৎজী জার্মানী এবং সাম্রাজ্য-বাদী জাপানের যে চুক্তি হয়েছিল অক্ষ শক্তির (anti-comintern pact) তাকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বিরোধী চুক্তি বলা হলেও ইতালি, জার্মানী ও জাপানের আক্রমণ প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হয় নি। স্পেনে গণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত দলের আক্রমণ, ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণ, জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং নাৎজী জার্মানী কর্তৃক চেকো-শ্লোভাকিয়া আক্রমণ একেবারেই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ যার বিরুদ্ধে পশ্চিমের তথাকথিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলি বিশেষ কিছু বলে নি বা করে নি। অপর পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকেই এই আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে 'সম্মিলিত জাতি সংস্থার' সমবেত প্রতিরোধের পক্ষে (লীগ অব্ নেশন্স) বলতে থাকে এবং স্পেনে 'আন্তর্জাতিক বাহিনী' নির্মাণে উৎসাহ দেয়। পৃথিবীর বহু দেশের প্রকৃত গণতন্ত্রী মানুষ,যার মধ্যে লেখক ও শিল্পী এবং দার্শনিকরাও আছেন, সাধারণ প্রগতিশীল মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্পেনের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। বিশ্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি।

মহান অক্টোবর বিপ্লব যখন এই শতাব্দীর বিশ দশকে গৃহযুদ্ধ,১৪টি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের আক্রমণ এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে সমাজতন্ত্রবাদের প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করতে শুরু করেছে—তখন একদিকে ধনতন্ত্রবাদের সংকট বিশ্বব্যাপী মন্দাতে প্রকাশ পাচ্ছে অপর দিকে ইতালি ও জার্মানীতে যথাক্রমে ফ্যাসিবাদ ও নাৎজীবাদ রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেছে। মনে রাখা দরকার এরা কেউই নির্বাচনের মারফতে বা 'বিপ্লব' করে ক্ষমতা দখল করেনি। ইতালির রাজা মুসোলিনীকে এবং জার্মানীর রাষ্ট্রপতি হিটলারকে গদিতে বসিয়েছিল। স্বদেশে গণতন্ত্রের নিধন এবং গণতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের উপর অত্যাচার, জার্মানী থেকে আইনস্টাইন ও টমাস মানের মত বুদ্ধিজীবীদের বহিষ্কার, পৃথিবীর নাম করা লেখক ও শিল্পীদের বইপত্রের বহ্ন্যুৎসব,শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনগুলির ধ্বংস সাধন এবং বিনা কারণে বিদেশ দখলের অভিযান—সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষকে সক্রিয় করে তুলেছিল।

ইতিপূর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মুখোস খুলে দিয়েছিল। অপর পক্ষে অক্টোবর বিপ্লবের অগ্রগতির ভূমিকাকে লক্ষ্য করে পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী অংশ ভাবতে শুরু করেছিল, যে কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদকে আটকানো নয়, সাম্রাজ্যবাদের নতুন রূপ ফ্যাসিবাদকে এবং যুদ্ধকে আটকাতে

হবে। ইউরোপে এই সকল সমস্যা নিয়ে কয়েকটি সম্মেলন হয়—যার শুরুতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আরো কয়েকজন ভারতীয় মণীষী বিবৃতি দেন। প্যারিসে আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন হলে সেখানে বৃটেন ও ফ্রান্সে পাঠরত ভারতীয় ছাত্রদের প্রগতিশীল অংশ যোগ দেন এবং স্বদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনের যোগসূত্র খুঁজে পান। এঁরাই এদেশে প্রগতিশীল লেখক সংঘ গঠনে উদ্যোগ নেন এবং সেই সংঘের সদস্য হিসাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্পেনে গণতন্ত্রী সরকারের পক্ষে যে 'আন্তর্জাতিক বাহিনী' লড়ছিল তাদের উৎসাহ দিতে রণক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মুল্‌করাজ আনন্দ ও এ্যামবুল্যান্স গাড়ী চালিয়েছেন এবং মহারাষ্ট্রের বাল মুকুন্দ হুদ্দার 'আন্তর্জাতিক বাহিনীর' সৈনিক হিসাবে লড়েছেন। এশিয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় কংগ্রেস যে মেডিক্যাল মিশন চীনে পাঠিয়েছিল তা' কমিউনিস্ট অধিকৃত এলাকাতেই কাজ করেছিল ডাঃ কোটনিসের নেতৃত্বে। স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারকে রক্ষার জন্য রমাঁ রলাঁর অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীর বিবেকের কাছে যে আবেদন পাঠান—তা' তাঁর রাজনৈতিক বিবৃতিগুলির মধ্যে বোধ করি সব থেকে দ্ব্যর্থহীন এবং সোচ্চার : স্পেনে বিশ্বের সভ্যতা আজ বিপদাপন্ন ও পদদলিত।...আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ বিদ্রোহীদের সাহায্যে অর্থ ও মানুষ পাঠাচ্ছে।...শিল্প ও সংস্কৃতির গরিমামণ্ডিত মাদ্রিদ শহর আজ পুড়ছে।...আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই ধ্বংসাত্মক গতিকে আটকাতেই হবে। স্পেনে অজ্ঞতা, জাতি-বৈরিতা, ধর্ষণ ও রণোন্মাদনার অমানুষিক প্রকাশ ঘটেছে, তাকে চরম আঘাত হানতে হবে...তাই আমি বিশ্বের বিবেকের দ্বারে আহ্বান জানাই স্পেনের পিপ্‌লস ফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক সরকারকে সাহায্য করুন, প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে আটকান; গণতন্ত্রের সাহায্যে, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সাহায্যে কোটি কোটি মানুষ এগিয়ে আসুন" (স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা—৩রা মার্চ, ১৯৩৭ সাল থেকে সংক্ষেপ করা)। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বল্লেন, গণতন্ত্রী স্পেনের মানুষের অপরাজেয় দৃঢ়তা দেখে তিনি মুগ্ধ এবং ভারতবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন (কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক পত্র 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট', ২৮।৬।১৯৩৮)। এই ভাবে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অতি হিংস্র বিকাশের প্রতিরোধে দুনিয়ার চিন্তাশীল মানুষের যে মোর্চা গঠিত হয়েছিল—এবং যা সভা-সমিতি, সম্মেলন ও বিবৃতির সীমা ছাড়িয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধের রূপ নিয়েছিল—স্পেন ও চীনের জনযুদ্ধের ক্ষেত্রে সেখানে ভারতের সাংস্কৃতিক

ও রাজনৈতিক জগতের সর্বজনবরণ্যে নেতারা নিজেদের যুক্ত করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

ভারতের পক্ষে এই প্রচেষ্টা নতুন নয়। বস্তুতঃ ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক লড়াইয়ে সামিল হওয়ার জন্য মার্ক্সের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠনে ক'লকাতা থেকে একটি পত্র ১৮৭১ সালে যায় সংযুক্তির আবেদন জানিয়ে। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'শ্রমজীবী' পত্রিকা প্রকাশ, শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য গান রচনা যার সঙ্গে 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতের সাদৃশ্য লক্ষণীয় এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে 'সমদর্শী' দল গঠিত—যাকে মার্ক্স-গঠিত "কমিউনিস্ট লীগের' সঙ্গে তুলনা না করে ফ্রান্সের বুয়োনার্টির প্রায় ঐ নামের একটা দল ছিল—তার সঙ্গে তুলনা করা চলে। যদিও বুয়োনার্টি ১৮২৫/৩০-এর মধ্যে মারা গিয়েছিলেন। তা-ছাড়া আমরা দেখতে পাই গান্ধীজীর গুরুস্থানীয় দাদাভাই নৌরজী ১৯০৪ সালের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্টকহলম অধিবেশনে হাজির হয়েছেন এবং মাদাম কামা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে স্টুটগার্ট কংগ্রেসে লেনিনের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার দাবীর পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থনের জন্য সচেষ্ট। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এদেশের প্রগতিশীল মানুষ, যাঁরা সারা পৃথিবীর সর্বশেষ সংবাদ রাখতেন তাঁরাই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসাবে ফ্যাসিবাদকে নিন্দা করতে দ্বিধাবোধ করেননি এবং সেই আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেছেন।

কিন্তু এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার ছিল প্রত্যক্ষ। তাই তারা সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদকে পৃথক করে দেখতে থাকে। এর একটা কারণ, পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তথাকথিত পার্লামেন্টারী শাসন এবং তার পক্ষে পুঁজিবাদী প্রচার। বিশেষ করে সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদকে শ্রমিক আন্দোলনের যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া বলে ঘোষণা। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বশান্তির নামে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী সরকার কর্তৃক ফ্যাসিবাদকে আগ্রাসী হতে সাহায্য করা। তৃতীয়তঃ, সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ক্রমাগত কুৎসা প্রচার। চতুর্থতঃ, এদেশের প্রগতিশীল প্রচারে অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপ ও এশিয়াতে ফ্যাসিবাদের অত্যাচারকে যত ফলাও করে দেখানো হয়েছে এদেশে সেই পরিমাণ সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারকে আমলাতান্ত্রিক অত্যাচারের নাম দিয়ে দমন নীতি এড়ানোর কৌশল জনসাধারণের বিভ্রান্তির কারণ ঘটিয়েছে।

তার ফলে আমরা দেখেছি রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিকে বহু প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নেতা মানতে পারেন নি। এবং হিটলার ও জাপানের হাতে মিত্রশক্তির পরাজয়ে ভারতের সাধারণ মানুষ খুশী হয়েছে। এতে যেমন গোটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল তেমনি তার ফলে প্রগতিশীল অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। অনেকের মনে হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে জাতীয়তাবাদীরা লড়বে এবং ফ্যাসিবাদকে কমিউনিস্টরা লড়বে। অথবা শত্রুর শত্রুর সাহায্য নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের এই দুর্বলতা দূর করতে বাংলার সংস্কৃতি কর্মীরা চল্লিশ দশকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ১৯৩৬ সালে প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যার নেতৃত্বে ছিলেন মুল্‌করাজ আনন্দ এবং সজ্জাদ জহীর প্রভৃতি ত্রিশ দশকের ইউরোপ প্রত্যাগত ব্যক্তিরা, যাঁরা ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্ট এবং রাজনৈতিক পপুলার ফ্রন্ট দেখে এসেছেন। বাংলা দেশে অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতিও এই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নেন। কিন্তু আগেই বলেছি রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর প্রগতি লেখক সংঘের ক্রিয়াকলাপ স্তিমিত হয়। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বৃটিশ সরকার যে দমননীতি শুরু করে তাতে শিল্পী সাহিত্যিকদের আন্দোলনে ভাঁটা পড়া এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী যুগে সাংবাদিকরা যে পরিমাণে জেল খেটেছেন, সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে, জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে সে পরিমাণ অত্যাচারের সামনে শিল্পী সাহিত্যিকরা পড়েন নি। কিছু কিছু বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে, নজরুল জেলে গেছেন। কেউ কেউ চাকুরীতে উন্নত স্তরে উঠতে বাধা পেয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী কঠোর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উত্তর ভারতে প্রগতি লেখক সংঘের ২১১ জন বিনা বিচারে বন্দী হ'ন। আমি বিশেষ করে খ্যাতনামা শিল্পী সাহিত্যিকদের কথা মনে রেখেই বলছি যে সাম্রাজ্যবাদী দমন নীতির সামনে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশ মনে মনে জাতীয়তাবাদের সমর্থনে থাকলেও প্রত্যক্ষ কাজে সংগ্রামীদের এড়িয়ে চলতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে তারই প্রকাশ আমরা দেখেছিলাম।

কিন্তু তরুণদের সাহস বেশী এবং সে যুগে ধনতন্ত্রবাদকে তারা যে পরিমাণে

মার্ক্সবাদের দৃষ্টিতে বিচার করতে পেরেছিল সেই পরিমাণে তারা ছাত্র আন্দোলন, ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিউট এবং বাংলার জেলাগুলিতে কৃষক আন্দোলনের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে নিজ নিজ ক্ষমতা ও আঙ্গিকের সাহায্যে শিল্পকলায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। আগেই বলেছি,একধরণের শিক্ষিত মানুষ যারা নিজেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস নীতির দুর্বলতার (ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ—গণসংগ্রামের পরিবর্তে গান্ধীনীতি—১৯৪২ সালের ৯ই আগস্টের আগে পর্যন্ত) জন্য যোগ দিতে পারেনি তারা হিটলার ও জাপানের বিজয়ে খুসী হয়েছিল। কিন্তু তারা যখন দেখলো হিটলার স্তালিনগ্রাদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে এবং জাপানী সৈন্যবাহিনী বর্মা দখল করে আমাদের সীমান্তে উপস্থিত এবং চট্টগ্রামে ও ক'লকাতায় বোমা ফেলছে তখন তারা ক'লকাতা ছেড়ে মফস্বল শহরগুলিতে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পাঠাল। কিন্তু গ্রামের মানুষ, শহরের কল-কারখানার মানুষ যাবে কোথায়? বিশেষ করে কল-কারখানার মালিকরা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় মাল সরবরাহ করার জন্য শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করেছিল এবং তারা সংগঠিত হয়ে অধিকতর সুবিধা আদায়ের জন্য অর্থনৈতিক সংগ্রামও করছিল। এ যুগে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও প্রবল হয়। এই ভাবে নতুন সংস্কৃতি আন্দোলনের পক্ষে এদেশে জমি তৈরী হ'ল। সাধারণ মানুষ সহজে যাতে আকৃষ্ট হয় তার জন্য ছাত্ররা (ছাত্র ফেডারেশন) পোস্টার নাটক করল। ইউথ কালচারাল ইউনিট একাংক নাটক শুরু করল এবং জেলাগুলিতে নতুন ধরণের গানের রচনা ও প্রচলিত সুর প্রয়োগ করে গাওয়া হতে থাকে। ইউথ কালচারাল ইউনিট রবীন্দ্রনাথ নজরুল ও অতুল প্রসাদের দেশপ্রেমিক গানগুলিকে সমবেত ভাবে গাওয়ার ব্যবস্থা করে।

১৯৪২ সালের শুরুতে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গানের আন্দোলন। বস্তুত জেলায় জেলায় প্রয়াত বিনয় রায় যে আন্দোলনের প্রসার ঘটান এবং যা পরবর্তী যুগে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং গণনাট্য সংঘের প্রাথমিক কাঠামো তৈরী করতে প্রভূত সাহায্যকারী হয় তা হলো গানের আন্দোলন।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ গ্রামবাসী এবং নিরক্ষর। চল্লিশ দশকের শুরুতে সিনেমা এবং বেতারের প্রসার আজকের মত ছিল না। অ্যামেচার থিয়েটার আন্দোলনও তখন অত্যন্ত সীমিত, বিশেষ করে মফঃস্বলের গ্রামে বা শহরে কালেভদ্রে অর্থাৎ বছরে ১।২ বারের বেশী হ'ত না। গানই ছিল শৈল্পিক

প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। তাই বিনয় রায়ের নিজের রচনা এবং ক'লকাতা ও মফস্বলের প্রগতিশীল শিল্পী ও কবিদের রচনা নিয়ে গানের দল গড়তে জেলায় জেলায় তিনি ঘুরে বেড়াতেন। তা'ছাড়া কলকাতা শহরে ট্রাম শ্রমিক, করপোরেশন শ্রমিক, চটকল শ্রমিকদের মধ্যেও সাংস্কৃতিক দল গঠন করা হয়েছিল। অর্থাৎ সংস্কৃতিকে মধ্যবিত্ত স্তর থেকে শ্রমিক ও কৃষকদের স্তরে নিতে চেষ্টা করা হয়েছিল। যার জন্য একদিকে দশরথ লাল, এরশাদ, রহমান অপর দিকে নিবারণ পণ্ডিত, রমেশ শীল, গোমানী দেওয়ান, টগোর অধিকারী, মধাই ওঝা, ওমর শেখ, আন্নাভাও সাথে এবং কেরালা ও অন্ধ্রের অসংখ্য লেখক শিল্পীরা জনসমক্ষে নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে উপস্থিত হলেন। ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ ও তার জনক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কিনা জনসাধারণের শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মে সে দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিলেন। প্রকৃত পক্ষে ফ্যাসিবিরোধী সংস্কৃতি আন্দোলন যে ভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিবর্তন, আগষ্ট বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা এবং ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করার কৌশলকে জনপ্রিয় করেছিল তা রাজনীতিগত ভাবে করা সম্ভব হয় নি। আমার আজো মনে আছে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মত দক্ষিণপন্থী নেতাকেও বলতে শুনেছি যে, ১৯০৫-৮ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়কার সংস্কৃতি আন্দোলনের কথা তাঁর মনে পড়েছে। আমি এই পর্বের বিস্তৃত বিবরণ আমার সম্পাদিত Marxist Cultural Movement of India-তে দিয়েছি। উৎসুক পাঠক সেখানে এই যুগের শিল্পসাহিত্যে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব এবং গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, অংকন, নৃত্যশিল্প ও ছায়াছবি নির্মাণের ব্যাপারে তথ্য পাবেন।

কিন্তু যে কথা আজ বিশেষ করে বলা দরকার তা হচ্ছে যে, শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শহর ও গ্রামের মানুষকে তাদের অসহনীয় দুরবস্থার মধ্যেও সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মে উদ্যোগী হতে সাহায্য করা হয়েছিল। শিক্ষিত শ্রেণীর শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়ে সারা দেশের মঞ্চে উপস্থিত করা হয়েছিল এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জনগণের শিল্পীদের অংশ গ্রহণকে শিল্পকর্মের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করার চেষ্টা হয়েছিল, সে চেষ্টা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে হ্রাস পেতে থাকে। সংস্কৃতি আন্দোলন ব্যবসায়ী প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত 'বিশেষজ্ঞদের' উপর নির্ভরশীল হতে থাকে। যার ফলে আজ রাষ্ট্র পরিচালনায় সিনেমার নায়করা প্রাধান্য পাচ্ছে। গণ-আন্দোলনে আজ সিনেমার জনপ্রিয়

ব্যক্তিরা মঞ্চসজ্জার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় এবং কেবল রাজীব গান্ধী নয়, বামপন্থীদের সভা-সমাবেশেও তাদের পেলে সংগঠকরা কৃতার্থ বোধ করেন। চল্লিশ দশকের ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংস্কৃতি-আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি নিহিত ছিল সকল সৃষ্টির মূল জনসাধারণের কাছে যাওয়া এবং তাদের ঘুমন্ত শক্তিকে জাগ্রত করা, এটা ভুললে চলবে না।

মোহিত সেন

ফ্যাসিবাদ ও বিপ্লব

লেনিন বহুকাল আগে বলেছিলেন, পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন যে ভুলভ্রান্তি করে তার একটি কারণ হল নবাগত দলভুক্তদের প্রশিক্ষণ না-দেওয়া। বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে নতুন নতুন যেসব প্রজাতি আসে তাদের যদি সেই আন্দোলনের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার তত্ত্বগত বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ করা না-হয়, তাহলে এই নবাগত শক্তিগুলি প্রায়শই পুরনো ভুলগুলি করে থাকে। আন্দোলনে যারা কিছুটা প্রবীণতর, তাঁদের অবশ্য তরুণদের প্রতি অভিভাবকসুলভ সদয় দাক্ষিণ্যের মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়; আবার সেই সঙ্গে তাঁদের এটাও ধরে নেওয়া উচিত নয় যে তাঁরা যা জানেন, তরুণরাও তা জানেন।

আমার মনে হয়, ফ্যাসিবাদের ব্যাপারে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী শক্তির ক্ষেত্রে কথাটা বিশেষভাবে সত্য। যাঁরা ১৯৩০-এর দশক থেকে আন্দোলনে আছেন এবং যাঁরা ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি আন্দোলনে এসেছেন তাঁদের সকলের মনেই ফ্যাসিবাদ এমন স্বতঃস্ফূর্ত বীভৎসতা ও প্রচণ্ড প্রতিরোধের উদ্রেক করে, যা তিন-চার দশক বাদে আজও তাজা এবং সজীব। এঁদের মনে সমান সুস্পষ্ট অন্যান্য যেসব স্মৃতি জাগে, তার একটি হল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের লাইন—আগস্ট ১৯৩৫-এ অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে ডিমিট্রভ যে-লাইন চমৎকার স্বচ্ছতার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। সে সময়ে যাঁরা কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন, এই রিপোর্ট তাঁদের চৈতন্যেরই অংশ হয়ে রয়েছে। তাঁদের মনে এবিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতেই হবে এবং তাকে পরাস্ত করা যায় একমাত্র অতি ব্যাপক এক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলে—যে ফ্রন্ট উদারপন্থী বুর্জোয়া গণতন্ত্রী পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রসঙ্গত, সেই কারণেই সি পি এম নেতৃত্ব এমন একটা সংকটে পড়েছেন। এমন কি তাদের অনেকের কাছেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে প্রয়াসী লোকজনের সাহচর্যে নিজেদের কল্পনা করাটা নিতান্তই বিতৃষ্ণাজনক। সেই কারণেই, সি পি এম নেতৃত্বের মধ্যে যাঁরা জয়প্রকাশ পরিচালিত আন্দোলনে তাঁদের পার্টি'কে প্রায় লীন করে ফেলেছিলেন তাঁরা পর্যন্ত তা করছিলেন এই যুক্তিতে যে এই আন্দোলনের একটা "গণতান্ত্রিক সারবস্তু" আছে, কারণ তা "আধা ফ্যাসিস্ত" ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে চালিত!

কিন্তু ১৯৭০-এর দশকে যাঁরা কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন সেই লক্ষ লক্ষ নতুন লোকেরা কি এই ধরনের প্রায়-সহজাত দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার? তাঁরা কি জানেন ফ্যাসিবাদ কী? কিংবা তার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করা হয়েছিল? কিংবা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট কিভাবে সারা পৃথিবীতে বিপ্লবী শক্তিগুলির অগ্রগতিকে সহজতর করেছিল? দুর্ভাগ্যবশত, জানেন না। সেটা মোটেই তাঁদের দোষ নয়। এ দোষ আমার মতো লোকেদের এবং এখনও যাঁরা আন্দোলনে আছেন তাঁদের—এ ব্যাপারে নবাগত-দের শিক্ষিত করার জন্য তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টা করেন নি।

লেনিন ১৯০২ সালে তাঁর অমর রচনা 'কী করতে হবে?'-তে স্বতঃস্ফূর্ততার এই রোগের বিরুদ্ধেই তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তরুণতর বিপ্লবীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং নিজে থেকে ফ্যাসিবাদের সামাজিক সারমর্ম বুঝতে সক্ষম হবেন না, কিংবা তার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়তে হবে তাও বুঝতে পারবেন না।

বাম-ঘেঁষা ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা ও তর্কবিতর্ক থেকে কিছুটা যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বর্তমান প্রবন্ধে বিবেচ্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকা দরকার।

প্রথম, ফ্যাসিবাদ কী? এর শ্রেণীগত সারমর্ম হল—এক প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক একনায়কতন্ত্রী ধরনে একচেটিয়া পুঁজির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচেয়ে উগ্র জাত্যাভিমানী ও সবচেয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির শাসন। পুঁজিপতিশ্রেণীর সমস্ত শক্তির শাসন তা নয়, এমন কি সমস্ত একচেটিয়া পুঁজিপতির শাসনও নয়, এ হল তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির শাসন।

তার শাসনের ধরন তার শ্রেণীগত সারমর্মের সঙ্গে সংহতি রেখে চলে। এটা নেহাৎ একটা বুর্জোয়া সরকারকে আরেকটা বুর্জোয়া সরকারে বদলানোর

ব্যাপার নয়। এ হল বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনের ধরনের ক্ষেত্রে এক গুণগত পরিবর্তন, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে সন্ত্রাসমূলক একনায়কতন্ত্রী পদ্ধতিতে পরিবর্তন।

সুতরাং এটা হল বিপ্লবের নিকৃষ্টতম শত্রুদের শাসন এবং এমন ধরনের শাসন যা বিপ্লবী শক্তিগুলির অগ্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে নিকৃষ্টতম।

তার অর্থ এই যে সকল দেশে এবং সকল সময়ে পুঁজিপতিশ্রেণী কেন, এমন কি একচেটিয়া পুঁজিপতি বর্গকেও, সমধর্মী একটা ব্যাপার বলে বিবেচনা করা ভুল। পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে সমস্ত বিবাদ ও সংঘাত যে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে ও তার বিপ্লবী মিত্রদের কাছে তাৎপর্যহীন তা নয়। এ ধরনের সমস্ত বিবাদই যে উপদলীয় লড়াই তাও নয় এবং শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী মিত্ররা বড় জোর তাকে কিছুটা কাজে লাগাতে পারে, নিছক তাও নয়। পুঁজিবাদের সংকট যত বিকাশ লাভ করে, জনসাধারণের অসন্তোষ যত বাড়তে থাকে এবং বিপ্লবী শক্তিগুলি সমবেত হতে থাকে, পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে সংঘাত তত বিকাশ লাভ করে, পৃথকীকরণের ব্যাপারটা এগিয়ে চলে; শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী মিত্রদের তা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। এই সংঘাত ও পৃথকীকরণ সবচেয়ে দুষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণের ক্ষেত্রকে ব্যাপক করে তোলার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে। অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীকে কখনোই বুর্জোয়াশ্রেণীর অপেক্ষাকৃত কম প্রতিক্রিয়াশীল বা উদার মহলের লেজুড় হলে চলবে না, এই সব মহলের বুর্জোয়াশ্রেণীর অপেক্ষাকৃত বেশি প্রতিক্রিয়াশীল, এমন কি ফ্যাসিস্ত অংশগুলির সঙ্গে আপস করার অন্তর্নিহিত প্রবণতাকেও সর্বদা মনে রাখতে হবে। কিন্তু তাকে থাকতে হবে ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সামনের সারিতে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর কম প্রতিক্রিয়াশীল ও উদার অংশগুলিকে, বিশেষ করে তাদের অনুগামী জনসাধারণকে টেনে আনার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

এছাড়াও এর অর্থ এই যে, এমন কি সবচেয়ে 'গণতান্ত্রিক' বুর্জোয়া গণতন্ত্রেও শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে গুলিবর্ষণ করা হয়, গ্রেপ্তার করা হয়, নানা ধরনের দমনপীড়ন চলে—এই ঘটনার সঙ্গে ফ্যাসিবাদকে মিশিয়ে ফেলা চলবে না। এগুলি ছাড়া কোন বুর্জোয়া শাসনই থাকতে পারে না। এর বিরুদ্ধে কি লড়াই করতে হবে? নিশ্চয়ই হবে এবং লড়াই করতে হবে সম্ভাব্য সর্বশক্তি দিয়ে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে

'সাধারণ' বুর্জোয়া নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই থামিয়ে দেওয়া তো চলবেই না, বরং আরো তীব্র করে তুলতে হবে আর কিছুর জন্যে না হলেও অন্তত এই জন্যে যে এ ধরনের নিপীড়ন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকেই আঘাত দেয়। কিন্তু এ ধরনের নিপীড়ন থেকে ফ্যাসিবাদ গুণগতভাবেই আলাদা একটা জিনিস।

ফ্যাসিবাদের অর্থ হল সমস্ত নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারহরণ। ফ্যাসিবাদের অর্থ হল সমস্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সমস্ত গণতান্ত্রিক বিরোধীপক্ষ ও সমস্ত গণতান্ত্রিক গণসংগঠন নিষিদ্ধ করা। তার অর্থ ধর্মঘটের অধিকারের অবসান। প্রতিবাদ মিছিল, নির্বাচন প্রভৃতির অবসান। ফ্যাসিবাদ শ্রমিকশ্রেণী, তার বিপ্লবী মিত্র ও সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির কাছ থেকে তাদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত সবকিছুকে এবং সমাবেশ ও সংগঠনের জন্য তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সবকিছুকে কেড়ে নেয়।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। অমর সালভাদর আলেন্দের নেতৃত্বে চিলিতে গণঐক্য মোর্চার বিজয়ের আগে চিলি ছিল এক বুর্জোয়া গণতন্ত্র, সেখানে প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে গ্রেপ্তার, গুলিবর্ষণ প্রভৃতির সম্মুখীন হতে হতো। কিন্তু ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে ফ্যাসিস্ত অভ্যুত্থানের পর চিলিতে এই শক্তিগুলিকেই সম্মুখীন হতে হয়েছে গুণগতভাবে নিকৃষ্ট একটা জিনিসের—দুর্বৃত্ত আর খুনীদের শাসনের, যেখানে কোনো স্বাধীনতা নেই, নেই কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার। আরেকটি উদাহরণ দিই। ১৯৩৩ সালের আগে জার্মানিতে কমিউনিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও অন্যান্যদের সর্বপ্রকারের নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হত, প্রায়শই বহু নেতাকে জেলে যেতে হত। কিন্তু নাৎজীরা যখন ক্ষমতায় এল তখন মৃত্যু, বন্দীশিবির আর আত্মগোপন অবস্থা ছাড়া কিছুই রইল না।

ফ্যাসিবাদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের গুণগত পার্থক্যের কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে।

দ্বিতীয়, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর উপরের বিশ্লেষণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। একথা সত্য, ফ্যাসিবাদের বিজয়ের অর্থ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিনাশ। আর বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের নিশ্চয়ই কোনো মোহ নেই। তাঁরা এটা পরিষ্কার দেখতে পান যে এটা হল পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসনের একটা ধরন এবং তার মধ্যে রয়েছে বিরোধ ও সীমাবদ্ধতা। কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিজয়ের অর্থ এই নয় যে পুঁজিপতিশ্রেণীর

শাসন শেষ হয়ে গেল। তার অর্থ, পুঁজিপতিশ্রেণীর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশগুলি জয়লাভ করল। তার অর্থ এই নয় যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিরোধ ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে তার জায়গায় গণতন্ত্রের একটা উচ্চতর ধরন এল, শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী মিত্ররা যে-গণতন্ত্রকে তাদের আশু দাবির জন্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য সংগ্রামে আরও ভালভাবে কাজে লাগাতে পারবে। তার অর্থ, জনগণের অর্জিত গণতান্ত্রিক সাফল্যগুলি এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রে গভীরতর ও ব্যাপকতর সংগ্রামের যে সম্ভাবনা থাকে তাকে পুঁজিপতিশ্রেণীর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ধ্বংস করে দিল এবং কেড়ে নিল। ফ্যাসিবাদের বিজয়ের অর্থ শুধুই বুর্জোয়া শ্রেণীর উদার গণতান্ত্রিক অংশগুলির পরাজয়ই নয়। এর অর্থ, সর্বোপরি ও প্রধানত, সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির পরাজয় এবং বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর পরাজয়। শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনকে, তার পার্টিগুলিকে ও তার নেতাদেরই আলাদা করে বেছে নেওয়া হয় বিশেষ হিংস্র ও বিধ্বংসী আক্রমণের জন্য।

সুতরাং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা উদার বুর্জোয়াদের জন্য 'শ্রমদান' ধরনের একটা কিছু নয়। শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী মিত্রদের পক্ষে এটা হল নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার লড়াই। ব্যাপারটা জীবন-মরণের। ফ্যাসিবাদ যদি জেতে তার অর্থ হবে এই যে শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী মিত্ররা ভয়ঙ্কর ও মারাত্মকভাবে পরাজিত হল এবং বলাই বাহুল্য, সেখান থেকে সামলে ওঠা সহজ হবে না।

কিছু কিছু বামপন্থী মহলে কখনও কখনও শোনা যায় যে সাময়িকভাবে ফ্যাসিবাদের জয়টা খারাপ হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ভালোই, কারণ দক্ষিণপন্থী ও প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবে এবং জনসাধারণও তাড়াতাড়ি বামপন্থার দিকে চলে আসবে। উদার বুর্জোয়া গণতন্ত্র যেসব দেশে আছে সেখানে জনসাধারণের মনে প্রচণ্ড মোহ আছে বলে শত্রুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের কাজটা অনেক বেশি কঠিন।

কিন্তু অভিজ্ঞতা কী দেখায়? পর্তুগালে ফ্যাসিবাদ টিঁকেছিল পঞ্চাশ বছর এবং এখনও সমস্ত সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কৃষকরা, বাম-অভিমুখী হন নি। স্পেনে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় রয়েছে ১৯৩৬ সাল থেকে এবং সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য ব্যাপক গণতান্ত্রিক বর্গের সঙ্গে মিলে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র না হোক, পুঁজিপতিশ্রেণীর অংশগুলি সমেত এক গণতান্ত্রিক কোয়ালি-

শনকে দিয়ে সেই ফ্যাসিস্ত শাসনকে স্থানান্তরিত করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিবিপ্লব জয়ী হয়েছিল ১৯৬৫ সালে এবং এক দশক বাদেও কমিউনিস্ট পার্টি নিজেকে পুনর্গঠিত করতে পারে নি।

তৃতীয়, ফ্যাসিবাদ যেভাবে ক্ষমতায় আসে, তার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ কী? এখানে ডিমিট্রভের কথাগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

"জনসাধারণের উপরে ফ্যাসিবাদের প্রভাবের উৎস কী? ফ্যাসিবাদ জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারে কারণ তার বাগাড়ম্বরপূর্ণ আবেদনটা থাকে তাদের সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন আর চাহিদার কাছে। জনসাধারণের মনে যেসব কুসংস্কার গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকে ফ্যাসিবাদ যে শুধু সেগুলিকেই প্রভাবিত করে তাই নয়, জনসাধারণের শ্রেয়তর হৃদয়বৃত্তিকে, তাদের সুবিচার-বোধকে, এমন কি কখনও কখনও তাদের বিপ্লবী পরম্পরাকেও কাজে লাগায়…

"ফ্যাসিবাদের লক্ষ্য থাকে জনসাধারণকে বল্‌গাহীনভাবে শোষণ করা, কিন্তু তাদের সামনে সে আসে চতুরতম পুঁজিবাদবিরোধী বুলি নিয়ে; লুঠেরা বুর্জোয়াশ্রেণী, ব্যাঙ্ক, ট্রাস্ট ও ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের গভীর ঘৃণার সুযোগ সে নেয় এবং এমন সব শ্লোগান সে তুলে ধরে যেগুলি সেই মুহূর্তে রাজনৈতিকভাবে অপরিণত জনসাধারণের কাছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক…

"ফ্যাসিবাদ জনগণকে তুলে দেয় সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অর্থগৃধ্নু শক্তিগুলির মুখের গ্রাসে পরিণত হবার জন্য, কিন্তু জনগণের সামনে সে আসে 'সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত সরকার'-এর দাবি নিয়ে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকারগুলি সম্পর্কে জনসাধারণের মোহভঙ্গের উপরে ভরসা করে ফ্যাসিবাদ শঠতাপূর্ণভাবে দুর্নীতির নিন্দা করে…

"বুর্জোয়াশ্রেণীর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলির স্বার্থেই ফ্যাসিবাদ পুরনো বুর্জোয়া পার্টি ছেড়ে চলে-আসা হতাশ জনসাধারণকে পাকড়ায়। কিন্তু জনসাধারণের মনে সে রেখাপাত করে বুর্জোয়া সরকারগুলির উপরে তার আক্রমণের প্রচণ্ডতা দিয়ে এবং পুরনো বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রতি আপসহীন মনোভাব দিয়ে।

"অসূয়া আর শঠতায় অন্য সব ধরনের বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াকে ছাপিয়ে গিয়ে ফ্যাসিবাদ তার বাগাড়ম্বরকে প্রতিটি দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এমন কি একই দেশের বিভিন্ন সামাজিক বর্গের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। আর সাধারণ পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর লোকেরা, এমন কি শ্রমিকদের একটা অংশও

অভাব বেকারি ও অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা হেতু হতাশাগ্রস্ত হয়ে ফ্যাসিবাদের সামাজিক ও উগ্র জাত্যাভিমানী বাগাড়ম্বরের শিকার হয়।

"ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় আসে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী আন্দোলনের ওপরে **আক্রমণ চালাবার পার্টি হিসেবে,** অস্থির অসন্তুষ্ট জনসাধারণের ওপরে আক্রমণ চালাবার পার্টি হিসেবে; অথচ সে তার ক্ষমতায় আরোহণকে উপস্থিত করে 'সমগ্র জাতি'র পক্ষ থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে 'বিপ্লবী' এবং 'জাতির মুক্তি'র জন্য 'বিপ্লবী' আন্দোলন হিসেবে।" (বড় হরফ মূল রচনার)

যে সুনির্দিষ্ট উপায়ে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় আসে তা হল এক **ব্যাপক প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন** গড়ে তোলা। শুধু সেনাবাহিনী বা আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় আসে একথা কল্পনা করা ভুল। নিশ্চয়ই সে এই দুটোরই মধ্যেকার প্রতিক্রিয়াশীলদের কাজে লাগায়। এবং প্রতিবিপ্লবী প্রক্রিয়ার এক বিশেষ মুহূর্তে তার গুরুত্বও বিরাট হয়ে ওঠে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুতি চালায় যথাসম্ভব ব্যাপক জনসাধারণকে সক্রিয় করে তুলে; দৃশ্যত সেটা স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে, আসলে গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী অগ্রগতির ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে।

চতুর্থ, ফ্যাসিবাদের ক্ষমতায় আসার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে হবে? কিংবা, আরেকভাবে বলতে গেলে, শুধু একা কমিউনিস্টদের চেষ্টা দিয়েই কি ফ্যাসিবাদের ক্ষমতায় আসা রোধ করা যাবে?

বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলনের সার্বিক অভিজ্ঞতা অঙ্গুলিনির্দেশ করে এই সিদ্ধান্তের দিকে যে একমাত্র একটা ব্যাপক ফ্যাসিবিরোধী গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনই ফ্যাসিবাদের বিজয়কে রোধ করতে পারে। কমিউনিস্টরা একার চেষ্টায় তা পারে না। কমিউনিস্টরা যেখানে এ রকম মোর্চা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানেই ফ্যাসিবাদ জয়ী হয়েছে। এর সবচেয়ে মর্মান্তিক উদাহরণ হল ১৯৩৩ সালের জার্মানি।

ফ্যাসিস্তরা যদি কোনো বিষয়কে কমিউনিজম ও কমিউনিজমবিরোধিতার প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয় তাহলে তাদের জয় অবধারিত হয়ে ওঠে। কারণ ফ্যাসিস্তদের ক্ষমতা দখলের প্রয়াস চলে ঠিক তখনই যখন জনসাধারণের 'র‍্যাডিকালাইজেশন'-এর চাইতে গণ-অসন্তোষ বেশি, যখন কমিউনিস্টরা শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ও জনসাধারণের অন্যান্য অংশের সমর্থন লাভ করতে পারে নি, অথচ বুর্জোয়া শাসনের সংকট দেখা দিয়েছে। ফ্যাসিস্তরা যে

কমিউনিজম বিরোধিতার ধ্বজা তোলে তার কারণ মোটেই এই নয় যে তাদের মতে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখল আসন্ন; তার উদ্দেশ্য হল আলোড়ন-ক্ষুব্ধ চলমান অথচ সচেতন লক্ষ্যবিহীন জনসাধারণকে বিপথে চালিত করা, গতিমুখ বদলে দেওয়া এবং বিভেদ সৃষ্টি করা।

যে রণকৌশলগত নীতির প্রয়োগ ফ্যাসিস্ত বিজয়কে রোধ করে তা হল, সর্বোপরি কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে তুলে ধরা, অর্থাৎ **গণতান্ত্রিক অগ্রগতি, না ফ্যাসিবাদ।**

ফ্যাসিস্তদের কমিউনিস্টবিরোধী ধূম্রজালকে এটাই ছিন্ন করে দেয় এবং তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক লড়াই ও সংঘর্ষের জগতে কে কাকে পরাস্ত করবে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সেটা স্থির হয় কে কাকে বিচ্ছিন্ন করবে, তাই দিয়ে।

ফ্যাসিস্তদের উপরে বিচ্ছিন্নতা চাপিয়ে দেবার রণকৌশলের দুটি অবিচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত দিক আছে। একটি দিক হল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি যাদের কাছে শ্রেয় ও প্রেয়, জনগণের অর্জিত গণতান্ত্রিক সাফল্যগুলিকে যারা রক্ষা করতে চায়—তাদের সকলকেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টেনে আনতে হবে—তাদের দোদুল্যমানতা ও উৎসহীনতা সত্ত্বেও। অন্যটি হল, যারা আমূল পরিবর্তনকামী, যারা গণতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর চায়, তাদের সকলকে ফ্যাসিবিরোধী মোর্চায় নিয়ে আসতে হবে। সর্বোপরি এইখানেই কমিউনিস্টদের পালন করতে হবে উদ্যোগ ও ঐক্যবিধানের অপরিহার্য ভূমিকা।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আরেকটি দিকও উপযুক্তভাবে উপলব্ধি করা দরকার—সেটি হল ফ্যাসিস্ত শিবিরে বিভেদ। একথা কল্পনা করা ভুল যে ফ্যাসিবাদের শক্তিগুলি সবাই গোড়া থেকে ঐক্যবদ্ধ। ফ্যাসিস্ত জোট গঠন ফ্যাসিবিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের মতোই রীতিমতো একটা প্রক্রিয়া। লেনিনই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে শত্রুকে "পরাজিত করা যায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে এবং শত্রুদের মধ্যে যে কোনো, এমন কি ক্ষুদ্রতম বিরোধকে অতি-পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, সযত্নে, সমনোযোগে, দক্ষতার সঙ্গে ও **বাধ্যতামূলক ভাবে** ব্যবহার করে" (বড় হরফ মূল রচনায়)।

যেসব কনসেশন ও আপস প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ়, এমন কি প্রসারিত, করে এবং ফ্যাসিবিরোধী

শক্তিগুলিকে ভিন্নমুখী ও বিভক্ত করে—এমন সব কনসেশন দেওয়া ও আপস করার নীতি থেকে উপরের এই রণকৌশলগত নীতিটিকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে। এ ধরনের সীমারেখা টানার প্রয়োজনীয়তার ফলে কিন্তু রণকৌশলগত নীতিটির প্রয়োজনীয়তা বাতিল হয়ে যায় না।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্য চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে ব্যাপক ফ্যাসিবিরোধী শক্তিগুলি গণতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আদায়ের জন্য কতখানি ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে, তার উপরে। শুধু 'স্থিতাবস্থা' রক্ষা করে চলার অর্থ ফ্যাসিস্ত বিজয়কে ডেকে আনা। কারণ 'স্থিতাবস্থা'র ভিতরেই এমন কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে যা ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়। একচেটিয়া পুঁজি 'স্থিতাবস্থা'র একটি অঙ্গ। জমিদারিও তাই। কালোবাজারী, মজুতদার, ফাটকাবাজরাও তাই। এমন কি নয়া-উপনিবেশবাদীরাও 'স্থিতাবস্থা'র অঙ্গ। আর যেসব সামাজিক শক্তির অভিব্যক্তি হল ফ্যাসিবাদ—সেই শক্তিগুলিকে উদার বুর্জোয়ারা যে-কনসেশন দেয়, তাদের সঙ্গে যে-আপস করে—সেগুলিও 'স্থিতাবস্থা'র অঙ্গ। গণ-অসন্তোষও তাই।

অতএব, প্রতিবিপ্লবী পশ্চাৎগামিতার ফ্যাসিস্ত প্রচেষ্টাকে ঠেকানো এবং পরাস্ত করা যায় একমাত্র বৈপ্লবিক, গণতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রামের সাহায্যে। সেই জন্যই দরকার এক ফ্যাসিবিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম। এই কর্মসূচীতে উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচিত হবে এব সমস্ত ফ্যাসিবিরোধী শক্তির স্বার্থকে গণ্য করা হবে। উদার বুর্জোয়াশ্রেণীরং স্বার্থকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে গণ্য করতে হবে শ্রমিকশ্রেণী কৃষকসমাজ পেটিবুর্জোয়া ও জনসমষ্টির অন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক অংশের স্বার্থকেও।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। সেটি এই যে বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলি নয়া-উপনিবেশবাদী অন্তর্ঘাতের চর। হিটলার শুধু যে তার নিজের দেশে ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিল তাই নয়, তাকে অন্তর্ঘাতের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিল এবং পরে যতগুলি সম্ভব দেশে তাঁবেদার ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নগ্ন আগ্রাসনের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সেই হিটলারের উর্দি গায়ে চাপিয়েছে। অবশ্য খোলাখুলি সামরিক আগ্রাসন আজ অনেক বেশি অসুবিধা-জনক, যদিও তাকে একেবারে বাতিল করা যায় না কোনো মতেই। তাই,

সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে সি আই এ-র কার্যকলাপ এবং 'ডি-স্টেবিলাইজিং' বা স্থিতিশীলতা নষ্ট করে করে দেওয়ার তৎপরতা।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাই শুধু আমাদের দেশেই নয়, আমাদের মতো দেশগুলিতে নয়া-উপনিবেশবাদী অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। যা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ও বিকশিত করার সংগ্রামের সঙ্গে মিশে যায়।

নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অতি-গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হল শান্তির জন্য ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সংগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে পৃথিবীর সমস্ত উপনিবেশবাদবিরোধী শক্তির ঐক্য ও তৎপরতার উপরে। তা নির্ভর করে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্র ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির একচেটিয়াবিরোধী সংগ্রামের শক্তিগুলির সংহতির উপরে।

উপরে যেসব কথা বলা হল তা থেকে এটা পরিষ্কার যে ফ্যাসিস্ত আক্রমণের পরাজয় ছাড়া বিপ্লবী অগ্রগতির কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। একথাও স্পষ্ট যে গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক অগ্রগতি ছাড়া এবং ফ্যাসিবাদের সামাজিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপরে আঘাত ছাড়া, যারা তাদের সংগ্রামকে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পরেও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই বিপ্লবী শক্তিগুলি সমেত সমস্ত ফ্যাসিবিরোধী শক্তির ঐক্য ও তৎপরতা ছাড়া ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়।

সৌরেন বসু

নয়া ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বিপ্লব

ইতিহাস আজ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। —সে যেন আজ এক আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনায় ভরপুর,—যেন পরিবর্তনের জন্মবেদনায় ব্যথাতুর।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের অমীমাংসিত সমস্যাবলি আজ পুঞ্জীভূত চাপে, ধূমায়িত দ্বন্দ্বের আকারে চতুর্দিক থেকে সমগ্র মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, সোচ্চারে যেন দাবী করছে মানবিক হস্তক্ষেপ—আকুল আগ্রহে যেন অপেক্ষা করছে মানবসত্তার প্রয়োজনে সব সমস্যার সমাধানের।

একদিকে যেমন সমগ্র মানব সমাজের সামনে পারমাণবিক-ধ্বংস অথবা গণ-আন্দোলনের স্রোতে নিরস্ত্রীকরণের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার প্রশ্ন আশু হয়ে পড়েছে ;অন্যদিকে তেমনই মানব সমাজ আজ এমন এক যুগে প্রবেশ করেছে যেখানে প্রকৃতির সাথে মানুষের সরাসরি সম্পর্কের পুনঃসংস্থাপনের প্রশ্ন বড় কাছাকাছি এসে পড়েছে, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার অভূতপূর্ব বিকাশের দ্বারা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করে মানবজাতির সর্বমুখী কল্যাণে নিযুক্ত করার সম্ভাবনায়।

যে কোন আঞ্চলিক সমস্যাই আজ এক বিশ্বরূপ পরিগ্রহ করছে, আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে যুক্ত হয়ে পড়ছে, সে পাঞ্জাব-ভূপালের গ্যাস কাণ্ড সমস্যাই হোক, আর লেবাননের গণহত্যাই হোক কিংবা ইরাণ-ইরাক যুদ্ধ বা আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার প্রাসাদ-বিপ্লবই হোক। বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার জালে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে ফেলেছে প্রায় সারা দুনিয়ার দেশগুলিকে। কতকাল আগে, পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌছবার পূর্বেই "কমিউনিস্ট ইশতেহারে" বলা হয়েছিল,—"নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য অবিরত বর্ধমান এক বাজারের

তাগিদ বুর্জোয়া শ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্বত্র তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়। যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র।"

"বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও উপভোগে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে।...দেশজ উৎপন্নে যা মিটত তেমন সব পুরনো চাহিদার বদলে দেখছি নতুন চাহিদা যা মেটাতে দরকার সুদূর দেশ বিদেশের নানা আবহাওয়ার উৎপন্ন।"

এই "ইশতেহার"-এ বর্ণিত চরিত্রকে বজায় রেখেই পুঁজিবাদ তার জন্মের দেড়শত বৎসর পূর্তির মুখে রূপ পাল্টিয়েছে—এমনকি সাম্রাজ্যবাদের রমরমার যুগের উপনিবেশবাদও নয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ "উন্নত", "উন্নতিশীল", "অনুন্নত" বলে ভাগ করা হয়েছে দুনিয়াটাকে; আজ বাক্য তৈরী হয়েছে "উন্নত" ও অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে ধনের সমবন্টনের জন্য প্রচেষ্টাতেই মানবজাতির কল্যাণ নিহিত। তথাকথিত তৃতীয় দুনিয়ার সাহায্যকল্পে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সর্দারীতে হয়েছে 'বিশ্বব্যাঙ্ক', 'আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল' (IMF)। এই তৃতীয় দুনিয়ায় কৃষি ও বিদ্যুতের উন্নত ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে ঘুম নেই। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ঝাঁপিয়ে পড়েছে বীজ, সার, কীটনাশক উপকরণ "উন্নতিশীল" ও "অনুন্নত" দেশগুলিতেই কারখানা মারফৎ প্রস্তুত করার। এই নয়া উপনিবেশীয় শোষণ প্রথা সহজ হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে এই সমস্ত দেশগুলির অধিকাংশে স্থানীয় পুঁজির প্রতিষ্ঠায়। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থা এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মূলসূত্রটি ধোঁয়াটে করে দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থা যার মাথার উপর "নৈবেদ্যর কদলী" হয়ে রয়েছে জাতিসঙ্ঘ, যেখানে ফাটাফাটি, চ্যাচামেচির অন্তরালে চাবি-কাঠি সাম্রাজ্যবাদীদের 'ভেটো'র মধ্যে। নয়া উপনিবেশবাদী শোষণের জাল বিস্তার যেমন সূক্ষ্ম হয়েছে, তেমনি সহজ হয়েছে এই খাতক দেশগুলির শাসন ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের। এই সব দেশে আমলাতান্ত্রিক, পুলিশী এবং সামরিক ব্যবস্থার বিশেষ শিক্ষার প্রশিক্ষণেও বিশ্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—কোন দেশের সামরিক অফিসার-এর "বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি" সম্মেলনের প্রতিনিধি হতে, কিংবা উচ্চতম পুলিশ কর্তার "আন্তর্জাতিক কৃষি সম্মেলন" থেকে ফিরে এসে "নকশালীদের" গণহত্যার ব্যবস্থা করতে এখন আর কোন অসুবিধে নেই।

নানা কৌশল ও কারচুপির মধ্যেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত সঙ্কট প্রকট

হয়ে উঠছে। পণ্য বিক্রয়ের প্রয়োজনেই যে পুঁজিবাদ তার বিকাশের প্রথম পর্যায়ে ধর্মান্ধতা ও মধ্যযুগীয় কুসংস্কারকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল, আজ সেই বুর্জোয়া দর্শন ও সাহিত্য চরম অবক্ষয়ের পর্যায়ে নেমে গিয়ে স্বার্থ-অর্থ ও দেহ-সর্বস্বে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধের মারণাস্ত্র তার পণ্য উৎপাদনের প্রধান বিষয় হয়েছে—বুর্জোয়া মানবতার মুখোস ছিঁড়ে ফেলে আজ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার জনগণকে রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের গিনিপিগে পরিণত করতেও দ্বিধা করছে না। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কুসংস্কার, আচার অনুষ্ঠান, উগ্র ক্যাথলিকতন্ত্র, মোল্লা-তন্ত্র, কট্টর হিন্দুয়ানী—জাতপাত, বর্ণ-জাতিভেদ, অন্ধ ভাগ্য-বিশ্বাস প্রভৃতি সব আজ আমদানি করছে বুর্জোয়ারা তার দর্শন হিসাবে, শোষণ-শাসনের আসল চেহারাকে আড়াল করার জন্য।

নয়া ফ্যাসিবাদের প্রশ্নটি আজ এই পুঁজিবাদী বিশ্বসঙ্কটের অভিব্যক্তির একটি দিক হিসাবে হলেও, দেশে স্থানীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে তা গৃহীত হয়ে চলেছে গত দুই দশক ধরে। অতি উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্কটের সময় পুঁজিপতিদের এক প্রতিক্রিয়াশীল অংশের ফ্যাসিস্ট পদ্ধতি গ্রহণের যে ধ্রুপদী পদ্ধতি ছিল ত্রিশের মধ্যভাগ থেকে চল্লিশের দশক অবধি—আজ আর তা নেই। যথেষ্ট পরিমাণে অনগ্রসর দেশেও মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি গোষ্ঠী পুঁজিবাদের সামগ্রিক অবক্ষয়ের যুগে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রসারের জন্য চূড়ান্ত ফ্যাসিস্ট পদ্ধতি নিয়েছে ও নিচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, ইরাণের খোমেনি শাসন, পাকিস্তানের সামরিক শাসন,—আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে, এমনকি আমাদের এই "রঘুপতি-রাঘব"র ভারতে ইন্দিরা-সঞ্জয়-সিদ্ধার্থের ৭৫-৭৬-এর শাসনেও দেখা গিয়েছে। তথাকথিত তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশে সামরিক একনায়কত্ব তো জল-ভাতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বনেদি পুঁজিবাদী দেশ ফ্রান্স, বৃটেনেও নগ্ন পুলিশী আক্রমণ দেখা যায় শ্রমিক আন্দোলনের সময়; ইংলণ্ডের ধর্মঘটী কয়লাখনি শ্রমিককে ফাঁসীর হুকুম দিতে "হার ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেণ্ট"-এর হাত কাঁপেনি—কালো মানুষদের দাসত্বমূলভ অবস্থা সব সময়েই আমেরিকার 'নিষ্কলঙ্ক' গণতন্ত্রের গায়ে কালি ছিটিয়ে দিচ্ছে।

সঙ্কটে জর্জরিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই অবক্ষয়ের যুগে ফ্যাসিস্ট পদ্ধতির যে কোন দেশে আবির্ভাব হতে পারে উগ্ররূপে, যার প্রচণ্ড আঘাত আসবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আর যার নিষ্ঠুর বলি হবে বামপন্থীরা, কমিউনিস্টরা। তবে ঠিক যেমন মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করলেও ইতিহাস তার ইচ্ছামত হয় না

তেমনিই ফ্যাসিবাদ গ্রহণ করা কেবলমাত্র একতরফা ভাবে পুঁজিপতি শোষক শ্রেণীরই ইচ্ছার অধীন নয়—সেই প্রসঙ্গেই এবার আসা যাক।

বিপ্লবের সমস্যাবলি :

প্রথমতঃ, পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ীই—পূর্ববর্তী শোষক সমাজের…"যেসব বিচিত্র সামন্ত বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল, তার 'স্বভাবসিদ্ধ ঊর্ধতন'দের কাছে তা এরা (বুর্জোয়া শ্রেণী) ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে। মানুষের সাথে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার 'নগদ টাকার' বাঁধন ছাড়া এরা আর কিছুই বাকি রাখেনি।…লোকের ব্যক্তি মূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময় মূল্যে…ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে শোষণ এতদিন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে, নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ পাশবিক শোষণ।…চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী—সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরী ভোগী শ্রমজীবীরূপে।… পারিবারিক সম্পর্ককে পরিণত করেছে একটা নিছক আর্থিক সম্পর্কে।" (কমিউনিস্ট ইশতেহার) এবং সব কিছু মিলিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণের ফলে মানব সমাজের সামনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরবর্তী স্তরে শোষণহীন সমাজ ছাড়া অন্য কোন সমাজের রূপ আসে না। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত সঙ্কটের আজকের যুগে পরবর্তী ব্যবস্থার, সমস্ত প্রকার শোষক সমাজের বিকল্পে প্রকৃতির সাথে মানুষের সরাসরি সম্পর্কের প্রশ্ন এসে পড়ছে।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ে সোভিয়েত লাল ফৌজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শোষণের কবলমুক্ত হওয়ায় ঔপনিবেশিক পদ্ধতির সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান হয়ে যায়, যা সমস্ত প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সমগ্র বিশ্বের জনগণের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। শান্তির জন্য এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে দেশ-নির্বিশেষে মানুষ এগিয়ে আসতে থাকলো,—এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন এক নতুন প্রেরণা পেল—হিরোশিমা-নাগাসাকির আনবিক বোমার ধ্বংসলীলা সত্বেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভয়ে মানুষ নতুন করে আর ভীত হল না। আন্তর্জাতিকতা, সমাজতন্ত্রের বাণী পূর্ণ বিজয়ের যুগে পদার্পণ করল।

মানুষের প্রতিরোধ স্পৃহার এই বিশ্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদের দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণুরূপ

সম্পর্কে সচেতনতা, শোষণহীন সমাজে উত্তরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মানুষের সংগ্রামের প্রেরণা আজও তার মনে জাগরুক থেকে গেছে আর সেইটিই হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার পক্ষে, ইচ্ছানুযায়ী নয়া-ফ্যাসিবাদের প্রবর্তন করতে, এক কথায় **পুরানো কায়দায় শাসন শোষণ চালাতে** সাম্রাজ্যবাদকে নিয়ত বাধা দিচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর একদশকের মধ্যেই উত্তর কোরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ ও খোদ মার্কিন মুলুকে ম্যাকার্থিবাদের ফ্যাসিস্ট পদ্ধতি বিফল হয়ে জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতারই জয় হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দিনগুলি ছিল বিশ্ববিপ্লবী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। একে সুসংগঠিত করে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নেতৃত্বদানের পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধোত্তর নেতা নিকিতা ক্রুশ্চভ এই উদ্দীপনার মাথায় জল ঢেলে দিলেন "পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান"ও "শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের" অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপস্থিত করে।—বিশ্বের জনগণ এক বিরাট ধাক্কা খেল, সাম্রাজ্যবাদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। শুধু এইখানেই এটি সীমাবদ্ধ থাকলে ক্রুশ্চভকেই ইতিহাসের "কালো ভেড়া" বলে আখ্যা দিয়ে সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা কিছু সহজ হত। কিন্তু বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বই ঐ যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির **নতুনত্ব ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারলেন না**—তাই চীনা পার্টির নেতৃত্বে যে সব কমিউনিস্ট পার্টি ক্রুশ্চভের বিরোধিতা করলেন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনেই 'সংশোধনবাদী' ও 'বিপ্লবী' বলে যে ভাগ হ'ল, তাঁরাও সমাধান দিতে পারলেন না, ফলে মতাদর্শের সংগ্রাম পরস্পরের প্রতি বাছাবাছা গালিগালাজেই পর্যবসিত থেকে গেল।

পরিস্থিতির নতুনত্ব ছিল ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির জনগণের যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির আন্দোলন ও এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার জনগণের জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একই পরিপ্রেক্ষিত প্রস্তুত হয়ে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক রূপের সম্ভাবনা, শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকায় একটি শোষিত শ্রেণী থেকে সামাজিক শক্তি হিসাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের পর্যায়ে আবির্ভাবের লক্ষণগুলি। (এসব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি চীনা বিপ্লবের সাফল্যে বিশ্ব মানবের বিজয়োল্লাসে, ভিয়েতনামী মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, জাপানের নৌ-শ্রমিকদের ধর্মঘটে—শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের রূপ দেখেছি ফ্রান্সে বন্দুক হাতে পার্টির

বে-আইনী ঘোষিত পত্রিকা "ল্যুম্যানিতে" প্রকাশ্যে বিক্রয় করায় বা ইতালীর কমিউনিস্ট নেতা তোগলিয়াত্তিকে গুলি করার প্রতিবাদে ইতালীর সমস্ত শহরে শ্রমিক ধর্মঘটে।)—অন্যদিকে নব অর্জিত জাতীয় মুক্তির এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে রাষ্ট্র শক্তির সাহায্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশে পুরনো ধরনের উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের সংগঠন ও পদ্ধতি অচল হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ;—জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সময়ে দেশীয় বুর্জোয়াদের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের প্রশ্নটি যে ভাবে ছিল এই নতুন অবস্থায় তার আমূল পরিবর্তন হ'য়ে সংগ্রামের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণভাবে এসে পড়ছিল।

বৈশিষ্ট্য ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে। শান্তি-আন্দোলন জনগণের গণতন্ত্র ও শোষণমুক্তির আন্দোলন হিসাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, সমাজতন্ত্র ইতিহাসের ধারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছিল, কমিউনিস্টরা ছাড়াও গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী দলগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে এগিয়ে আসছিল—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকান, ইউরোপীয়, এশীয় ও আফ্রিকার মানুষের একই 'ট্রেঞ্চে' এক নতুন আন্তর্জাতিকত বোধের উন্মেষ করে দিয়েছিল—পরস্পরের সমস্যা বোঝার এক নতন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল।

পরিস্থিতির পরিবর্তন বুঝতে না পারার ফলে যে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে আবদ্ধতা এলো এবং বিপ্লবী আন্দোলন পিছিয়ে গেল অনেকদিনের জন্য কেবল তাই নয়, সমগ্র রাজনৈতিক উদ্যোগ চলে গেল ঐ মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদেরই হাতে আর প্রচুর খেসারত দিতে হল অনেক দেশের জনগণকে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণচেতনার জোয়ারের মুখে যেখানে জাতিসঙ্ঘ প্রভৃতি সংগঠন গড়ে উঠল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টির প্রতিষ্ঠান হিসাবে, তা শেষে সাম্রাজ্যবাদেরই টোপ ফেলার যন্ত্রে পরিণত হ'ল, শান্তি আন্দোলনের সংগ্রামী মেজাজ ভোঁতা হয়ে তা শ্রেণী-সমন্বয়ের এক আখড়ায় পরিণত হল। আর "অ-পুঁজিবাদী পথ" (non-Capitalist path)-এর মোড়কে সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সমাজতান্ত্রিক ঢালাও সাহায্য দিয়ে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলিতে পুঁজিবাদের ঘাঁটি গড়ার সুযোগ করে দিলে, সে সব দেশের কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল। "জাতীয়" বুর্জোয়ার সাথে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে শ্রমিক শ্রেণীকে বুর্জোয়াদের অধীন করতে গিয়ে কী খেসারত দিতে হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার

কমিউনিস্টদের তা কারোরই অবিদিত নয়। ভারতে তো 'ভিলাই'-এর মোহ কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্যোগ ভারতীয় একচেটিয়া বুর্জোয়াদের হাতে চলে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

কমিউনিস্ট আন্দোলন তথা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রগতিশীল ব্যক্তি ও সংস্থার আন্দোলনের সামনে কতকগুলি সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল ত্রিশের দশকের শেষ ভাগ থেকেই। সেগুলি রাশিয়ার মত একটি পশ্চাৎপদ দেশে সমাজতন্ত্রের সমস্যা, শ্রমিক শ্রেণীর পরিবর্তে পার্টি-একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দরুন সমস্যা, সমাজতন্ত্রে পার্টির সাথে জনগণের এবং রাষ্ট্রের সাথে জনগণের দ্বন্দ্বগুলির মীমাংসার সমস্যা। এইগুলি সব একটি মতাদর্শের বিতর্কের আকারে উপস্থাপিত হওয়ার আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই প্রশ্নকে নেপথ্যে ঠেলে দিল। স্তালিন লেনিনের উত্তরাধিকারী হিসাবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা হলেন এবং একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিকাশে তাঁর নেতৃত্ব দানে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী কালে একজন কূটনৈতিক হিসাবে তাঁর দক্ষতা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয় স্তালিন লেনিন ছিলেন না এবং তাঁকে প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব বলপ্রয়োগের দ্বারাই দখল করে নিতে হওয়ায় যে ঐতিহাসিক ও পারিপার্শ্বিক বাধ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন নি। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে তিনি একটি ছকে বেঁধে দিয়েছিলেন, সোভিয়েত পদ্ধতিকে একটি বাধ্যতামূলক মডেলে পরিণত করেছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে উত্তরাধিকার প্রথা প্রবর্তন ও অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ করে ফেলেছিলেন। এতে মার্ক্সবাদের প্রয়োগকৌশল ও সমাজতন্ত্রের বাস্তব সমস্যাবলী আলোচনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হল বললেও বোধ হয় কম বলা হবে। স্তালিন হয়ে দাঁড়ালেন মার্ক্সবাদের প্রতীক, সুতরাং কোন প্রশ্ন তোলাই কমিউনিস্টদের কাছে স্তালিনকে না মানার ব্যাখ্যায় দাঁড়ালো এবং 'প্রতিবিপ্লবী', 'দলত্যাগী', 'প্রতিক্রিয়াশীল' শব্দগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু হয়ে গেল। অর্থপক্ষ মার্ক্সবাদীদের কাছে "স্তালিনবাদ" যান্ত্রিক প্রয়োগের ব্যাপার হল—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 'জনযুদ্ধ'-এর অত্যন্ত সঠিক তত্ত্বের মারাত্মক ভুল প্রয়োগে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা বলে বোঝাবার নয়।

বিকাশশীল সমাজ বিজ্ঞান হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে মার্ক্সবাদ এক রক্ষণশীল অনড় মতবাদে পর্যবসিত হয়ে এলো সেই ত্রিশের দশক থেকেই। বিংশ এবং দ্বাবিংশ পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা

স্তালিনের 'ব্যক্তিপূজার' অবসানের নামে মার্ক্সবাদের সৃষ্টিশীল ও স্তালিনের গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক নেতৃত্বের দিকগুলিকেই নাকচ করে স্তালিনের রক্ষণশীলতার নেতিবাচক দিককেই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে ছড়িয়ে দিলেন। 'স্তালিনবাদের' এই রক্ষণশীলতার দিকটি দিয়েই বিচার করতে গিয়ে এই সোভিয়েত নেতারা বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিবর্তনটি ধরতে পারলেন না, আবার যান্ত্রিক ভাবে মার্ক্সবাদকে বিচার করার ফলে চীন, ভিয়েতনাম, কিউবার বিপ্লবে একটি দেশের বিশেষ ক্ষেত্রের মার্ক্সবাদের প্রয়োগকে সার্বজনীনতা দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিল। মার্ক্সবাদকে অনড়, অচল আপ্ত বাক্য এবং বিশিষ্ট মার্ক্সবাদীদের নির্ভুল (infallible) বলে 'অবতার'-এ পরিণত করার বিপরীত গতি হিসাবে নয়া বামপন্থীদের (neo-left) এক অংশের বক্তব্যই হচ্ছে মার্ক্সবাদের 'উপযোগিতা ফুরিয়ে গিয়েছে'।

যে কথা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছিল সে কথায় ফিরে এসে বলতে হয়, ইতিহাসের এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে বিপ্লবী পরিস্থিতির বা বিপ্লবী শক্তির অভাব বিপ্লবের সমস্যা নয়, তা বরং প্রচুর মাত্রায় বিপুল ভাবে বর্তমান। বিপ্লবের সমস্যা এক বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, বিপ্লবের দিক নির্দেশের অভাব যা মার্ক্সবাদ বা মার্ক্সবাদীদের ছক বাঁধা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে হবে না, মার্ক্সবাদেরই বিপ্লবী সূত্রগুলির পুণঃপ্রতিষ্ঠা দিয়েই কেবল তা হতে পারে।

আজকের পরিস্থিতির বিশালতা পুরনো ধরনের সংগঠনের গণ্ডি ভেঙে দিচ্ছে, পুরনো ধরণের পার্টি-নিয়ন্ত্রণের তা বাইরে চলে গিয়েছে, তা সে শ্রমিক আন্দোলনই হোক, কৃষক বা ছাত্র আন্দোলনই হোক। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থাগুলি (যত সীমিতই হোক) জনগণের নতুন নতুন অংশকে শ্রমিকশ্রেণীর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উচ্চতর অংশও আজ ধর্মঘট মিছিলের সংগঠক হচ্ছে। পুরনো সংগঠন কি এদের স্থান দিতে পারবে? আজ যে আদর্শগত সমস্যা উপস্থিত তা-কি অ-সর্বহারা শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, পেটি বুর্জোয়াদের সর্বহারার দলে ভীড় করার ফল নয়? খুব একটা নতুন ঘটনা ইতিহাসের কাছে এ নয়। এমনই সমস্যা কি উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দেখা দেয়নি? তখনকার মতই তো কাউটস্কিদের মত তাবড় তাবড় মার্ক্সবাদীদের রক্ষণশীলতার সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সুযোগ করে দিয়েছিল ঠিক আজকের মতই "নৈরাজ্যবাদ" (anarchism), "যুক্তিবাদী উদারনৈতিক

মানবতাবাদ"-এর—যে মতবাদগুলি শেষ বিচারে বুর্জোয়া ব্যবস্থারই গুণগান করে, কারণ তার ভিত্তিই অ-শ্রেণী বাচক (non-class)।

নতুন প্রজন্মের তরুণ সম্প্রদায় আজ এই নৈরাজ্যবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও যুক্তিবাদের তাৎক্ষণিক বিপ্লবে গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে।—তাদের বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী দিক নির্দেশ দিয়ে যেমন বিপ্লবের ঝটিকা বাহিনীতে পরিণত করা যায়, তেমনই তাদের স্বতস্ফূর্ততার পিছনে ছুটতে দিলে তারা সহজেই নয়া ফ্যাসিবাদের শিকারে পরিণত হতে পারে।

বিপ্লবের সমস্যা আজ নেতৃত্বের সমস্যা—একথা স্বীকার করতেই হবে যে বুর্জোয়াদের পক্ষেও এবং জনগণের পক্ষেও এক আদর্শগত সঙ্কট চলছে। যুগ সন্ধিক্ষণে এই সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী ঠিকই, কিন্তু সঙ্কট সমাধানের পথ বের না করলে সমাজ নিজেরই অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে মনুষ্যত্ব বোধকেই ধুলায় লুটিয়ে দেবে। আদর্শগত সঙ্কট যখন আসে তখন স্বভাবতই নেতৃত্বের সঙ্কটে (crisis of hegemony) মানুষ প্রচলিত ব্যবস্থা, প্রচলিত রাজনৈতিক দল এমন কি নিজের উপরও আস্থা হারিয়ে ফেলে—অতি সহজেই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়ে পড়ে।

মার্কসবাদের রক্ষণশীলতা দিয়ে 'সব কিছুই ঠিক আছে', 'সোভিয়েত সমাজতন্ত্র চমৎকার চলছে' বলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পুঁজিবাদী মূল্যবোধের বিকাশকে ঢেকে রাখা, আফগানিস্থানে সোভিয়েতের আগ্রাসনকে 'বিপ্লবে সাহায্য' বলা, ভিয়েতনামের কাম্পুচিয়া দখল, চীনের ভিয়েতনামে আক্রমণ, সোভিয়েতের চীন সীমান্তে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ, পোলাণ্ডে সামরিক একনায়কত্ব প্রভৃতি সমর্থন করাতে আদর্শগত সঙ্কটের মৌলিক প্রশ্নগুলি যেমন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, এবং পুরনো কমিউনিস্ট ও বামপন্থী পার্টিগুলি 'সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি'তে' পরিণত হচ্ছে, তেমনই "সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ", "সংশোধনবাদী চীন নিপাত যাক" প্রভৃতি বলে 'নয়া-বিপ্লবীরা' পুরনো সব কিছুকেই নাকচ করতে গিয়ে সোভিয়েত, চীন প্রভৃতি বিপ্লবে জনগণের বিপ্লবী ভূমিকার ইতিহাসকেই নাকচ করে দিচ্ছেন। বাস্তব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে স্বপ্ন-বিলাসী সমাজতন্ত্রের কথা এনে ফেলছেন এবং পরিস্থিতির জটিলতার সহজ সমাধান বের করছেন।

আন্তর্জাতিকতাবাদ-এর সামনে আদর্শগত প্রশ্নে যেমন সমাজতন্ত্রের সাথে পুঁজিবাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা বলতে গেলে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের

বর্তমান অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে, এড়িয়ে যেমন যাওয়া চলবে না এই দুই শিবিরের সমাজ ব্যবস্থার পার্থক্য, তেমনই সমাজতান্ত্রিক দেশে পুঁজিবাদী মূল্যবোধ, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং সে দেশের পার্টিগুলিতে সংশোধনবাদী বিচ্যুতির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তায়ও জোর দিতে হবে; পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যুদ্ধবিরোধী পারমাণবিক অস্ত্র সংবরণ-এর শান্তি আন্দোলনকে সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেণী-সমন্বয়ের ধারা থেকে বের করে সেইসব দেশের জনগণের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সাথে যুক্ত করতে হবে—এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতেও শান্তি আন্দোলনে সেইসব দেশের সরকারেরও সমরসজ্জা-বিরোধী আওয়াজ রাখতে হবে।

জাতীয় ক্ষেত্রে আজ সর্বত্রই নতুন সামাজিক সমস্যা উপরে উঠে আসছে শোষিত শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের স্বপ্রতিষ্ঠার (identity) তাগিদে। দেশীয় ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের সীমিত বিকাশ ও সাম্রাজ্যবাদের কৃষিক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের ফলে পুরনো সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থা এইসব দেশে তছনছ হয়ে যাচ্ছে, অথচ কৃষিতে সার্বিক ধনতান্ত্রিক বিকাশও হচ্ছে না। এই অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের বিভিন্ন অংশের স্বপ্রতিষ্ঠার দাবী ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণবিভাগ, সাদা-কালোর বিক্ষোভ, আদিবাসী সমস্যায় প্রকাশিত হয়ে শ্রেণী সংগ্রামকে ব্যাহত করছে—অথচ এগুলি সমাজের মধ্য থেকেই উঠে আসা ন্যায়সঙ্গত দাবী (sub-altern questions)। সর্বহারার নেতৃত্বকে এই নতুন সামাজিক সমস্যায় নেতৃত্ব দিতে হবে, আবার একে যুক্ত করতে হবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সামগ্রিক সংগ্রামের সাথে।

পার্লামেন্টীয় রাজনীতিতে এখানে বৈশিষ্ট্য আসছে যে আদর্শগতভাবে পার্লামেন্টের সংগ্রামকে শ্রেণী সংগ্রামের পরিপূরক করা ছাড়াও আজ এইসব নতুন সামাজিক সমস্যায় বিকল্প পথের দিশা পার্লামেন্টে উপস্থিত করে, মার্কসবাদী ও অন্যান্য বামপন্থী সংসদ সদস্যদের তথাকথিত বুর্জোয়া-বিরোধী দলের থেকে নিজেদের পার্থক্য এইখানেই দেখাতে হবে।

মার্কসবাদীদের ঐক্যের প্রশ্ন আজকের মত এত জরুরী আর কখনও হয়নি। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা খুবই কঠিন, মার্কসবাদীদের মধ্যে সমস্যার ব্যাখ্যায় প্রচণ্ড প্রভেদের জন্য। তবু ঐক্যের আগ্রহই শাশ্বত, বিভেদ আপেক্ষিক বলে শেষ পর্যন্ত ঐক্যই জয়যুক্ত হবে।

রথীন চক্রবর্তী

ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম

আলোচনা শুরুর আগে কয়েকটি বিষয় আমাদের মেনে নিতে হয়। প্রথমত, তিরিশের দশকের ফ্যাসিবাদের সামগ্রিক চরিত্রের সঙ্গে আজকের ফ্যাসিবাদের চারিত্রিক এবং নীতিগত কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। এবং দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন সাম্রাজ্যবাদ কিছুটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদের লাইন অব অ্যাকশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখলেও আজকের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের একটি মূলগত পার্থক্য রয়ে গেছে। এটা মানতেই হবে, বিপ্লবী তত্ত্বের পাশাপাশি প্রতি-বিপ্লবী চিন্তার মহড়াও একই ভাবে এগিয়ে চলেছে এবং এমনি ভাবেই পুঁজিবাদী বিকাশ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের নানা উত্থান-পতন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদ যেমন পরিণত হয় নয়া-সাম্রাজ্যবাদে তেমনি ফ্যাসিবাদও অনেক বেশি সূক্ষ্ম তীব্র এবং ব্যাপক হয়ে পড়ে নয়া-ফ্যাসিবাদের উত্তরণের মধ্য দিয়ে। দিমিত্রভ যখন বলেন, 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটির ত্রয়োদশ প্লেনাম সঠিক ভাবেই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ফ্যাসিবাদকে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচেয়ে জাতি-দাম্ভিক এবং লগ্নী পুঁজির সবচেয়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিভূ প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব বলে বর্ণনা করেছিল' তখন পঞ্চাশ বছরের দূরত্বে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রশ্ন করতেই হয়, কোন্ লগ্নী পুঁজি এবং কি ধরণের সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব। ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে পেশ করা এই রিপোর্টে দিমিত্রভ একথাও বলেছিলেন, 'ফ্যাসিবাদের ক্ষমতালাভ এক বুর্জোয়া সরকার থেকে অপর এক সরকারে মামুলি উত্তরণ নয়, এ হলো বুর্জোয়াদের শ্রেণী-কর্তৃত্বের একটি রাষ্ট্রীয় রূপ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জায়গায় অন্য এক রাষ্ট্রীয়

রূপের প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা।' দিমিত্রভের মতো আমরাও স্বীকার করি যে, 'এই পার্থক্যটি উপেক্ষা করা গুরুতর ভুল হবে।' কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, বুর্জোয়া গণতন্ত্র নিজেই চল্লিশের দশক থেকে সরে গিয়ে আশির দশকে এসে এক নতুন পার্থক্য রচনা করেছে এবং প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্ব বলতে আজ আমরা যা বোঝাতে চাই তা একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চিহ্নে প্রবাহিত।

কারণ, অক্টোবর বিপ্লবের পর জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিস্তার লাভের ফলে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে যে অদল-বদল দেখা দেয় এবং অপেক্ষাকৃত আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিদেশী পুঁজির লগ্নী এবং দেশীয় পুঁজির বিকাশের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্বের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর অবস্থানে এবং তাদের প্রকাশ বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের চেহারায় যে রদবদল ঘটে গেছে তা আজ একটি রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। গত চার দশকের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি সহজেই। যেমন, সাম্রাজ্যবাদ এখন তুলনামূলক ভাবে প্রত্যক্ষ অনুপ্রবেশের হার অনেক কমিয়ে দিয়েছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে একদিকে যেমন অনেক সহজ হয়ে গেছে সমগ্র স্পাই-নেটওয়ার্ক তেমনি তথ্য সংগ্রহ বা ডাটা-প্রসেসিংও এখন অনেক বেশি আয়াসসাধ্য। ফিজিক্যাল ইনভলভ্‌মেণ্ট বা প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না ঘটিয়েও সাম্রাজ্যবাদ তার অর্থনৈতিক উপনিবেশ ও রাজনৈতিক আধিপত্যকে অনেক বেশি জোরালো করে তুলতে পেরেছে। প্রত্যক্ষ আক্রমণ বা অনুপ্রবেশ সেখানে রেখচিত্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু মাত্র। এই পরিস্থিতিতে বহুজাতিক ও একচেটিয়া পুঁজির লগ্নী আগের তুলনায় অনেক বেশি দৃঢ় হয়েছে এবং তার প্রকাশ 'সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্র'-এর বিস্ফোরণের সময়-চিহ্ন অনেক দূরে সরে গেছে। ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সরল হতে পেরেছে এই কারণেই যে দেশীয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিটা আগের তুলনায় অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক। যদিও আমরা অস্বীকার করতে পারি না, এই পরিস্থিতিতেও দেশীয় পুঁজির সঙ্গে বহুজাতিক এবং একচেটিয়া পুঁজির নিরন্তর লড়াই চলেছে এবং সময়ে-অসময়ে দেশীয় পুঁজিপতিরাও সাম্রাজ্যবাদ ও অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন করে থাকে। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে এটা একটা মস্তো সমস্যা।

তাছাড়া, বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের কাঠামো আজ আপাতভাবে অনেক প্রগতিশীল

প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি হলো আসলে সোস্যাল ফ্যাসিজম—স্তালিনের এই তত্ত্ব যে পুরোপুরি সঠিক নয় তা আজ কিছুটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। এবং জর্মন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা থেলম্যান স্বীকার করেছেন ফ্যাসিবাদ এবং সোস্যাল ফ্যাসিজম—এই দুটি জিনিসও এক নয়। সে-ক্ষেত্রে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি বুর্জোয়া-গণতন্ত্রীদের কাছে আবরণ হিসেবে একটি অত্যন্ত মূল্যবান পরি-কাঠামো, ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনকে প্রতিহত করারও একটি ভালো পথ। যদিও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, 'সকল রাজনৈতিক ধারার শ্রমিকদের আন্দোলনের ঐক্য ফ্যাসিবিরোধী সাধারণ দাবির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে (লা করেসপঁদেস এঁতারনাশিওনেল ১৯৩৪, নং ৩৪-৩৫) এবং সেখানে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিতে বিশ্বাসী সোস্যালিস্ট পার্টির কাছেও প্রস্তাব রেখেছিল। এছাড়া ১৯৩৪ সালে অস্ট্রিয়াতে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ যখন প্রায় চূড়ান্ত পর্বে, ১২ ফেব্রুয়ারি ফ্যাসিস্টরা যখন সোস্যালিস্ট পার্টির অফিস আক্রমণ করে তখন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এবং এর পরে প্রায় তেরো হাজার সোস্যাল ডেমোক্র্যাট কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ১৯৩৪, নং ৩১)। ১৯৩৩ সালে স্পেনে ফ্যাসিবেরোধী আন্দোলনে সোস্যালিস্ট, রিপাবলিকান এবং নৈরাজ্যবাদীরাও যোগ দিয়েছিল। এই ঘটনা থেকে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের চরিত্র যেমন কিছুটা বোঝা যায় তেমনি ফ্যাসিবিরোধী ফ্রন্টের চেহারাও মোটামুটি চিনে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, স্পেনে ফ্রাঙ্কো বা জর্মনীতে হিটলারের ফিরে আসা আজ ঠিক যতখানি অসম্ভব ব্যাপার তেমনি হিটলার বা ফ্রাঙ্কোর থেকেও ভয়ঙ্করতম কোনো চরিত্রের পুনরাবির্ভাব ততখানিই সম্ভাবনাময় কেন? আজ এই আশির দশকে ইতালিতে মুসোলিনির পুনর্মূল্যায়ণ বা জর্মনীতে নয়া নাৎজীপন্থীদের শপথ অথবা বিভিন্ন ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ-পুষ্ট নিত্যনতুন একনায়কতন্ত্রীদের আবির্ভাব ফ্যাসিবাদকে ঠিক কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক কি চেহারায় তাকে দাঁড় করাচ্ছে এটাই আজ বিশ্লেষণের প্রধান বিষয়। কারণ, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্র ধরে সাম্রাজ্যবাদ

বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মারফৎ বিপ্লবী মুক্তি আন্দোলনের উত্তরণের যাবতীয় কর্মসূচী নির্ধারণই এই বিশ্লেষণের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সন্দেহ নেই, ফ্যাসিবাদ হলো পুঁজিবাদী সংকটের এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে ক্ষমতাসীন শ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী উত্থান। কিন্তু এই ক্ষমতাসীন শ্রেণী যেহেতু জানে, ইতিহাসের আলোতেই যেহেতু তারা দেখেছে, যে এই বিশেষ প্রকাশ সঠিকভাবে সঙ্কটের কোন নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে না। তাই তারা চেষ্টা করে এই নির্দিষ্ট মুহূর্তটিকে অর্থনীতিগতভাবেই ক্রমশঃ পিছিয়ে দেবার। স্বাভাবিকভাবেই সেই অর্থনীতি তখন ধারণ করে নানা জনকল্যাণমুখী পরিকল্পনার ছদ্মবেশ। বিপ্লবী আন্দোলন তখন পরিণত হয় অর্থনীতি-ভিত্তিক বামপন্থী আন্দোলনে এবং সেই আন্দোলন আবার রূপান্তরিত হয় সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে। ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং স্বদেশী বুর্জোয়া-শাসিত দেশে বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রাম এই ভাবেই ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ে এবং ফ্যাসিবাদকে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়।

ইদানীংকালে 'উন্নয়নশীল' নামে চিহ্নিত দেশগুলিতে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া গণতন্ত্র যেভাবে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের কর্মসূচী নিয়েছে, সামগ্রিক ভাবে তা মিশ্র-অর্থনীতির আড়ালে ব্যক্তি পুঁজির বিকাশেরই আরেকটি পদ্ধতি। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনকে রুখতে তা যথেষ্টই ক্ষমতা রাখে। সুতরাং এইসব তথাকথিত স্বাধীন দেশে লড়াইটা যেখানে হাই-টেক বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাসির সঙ্গে বিপ্লবী মুক্তি আন্দোলনের, তেমনি ঔপনিবেশ ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে নয়া সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের। কিন্তু একটা সময়ের পরে দেখা যাবে মূল লড়াই এসে দাঁড়িয়েছে নয়া ফ্যাসিবাদের সঙ্গে বিপ্লবী মুক্তি আন্দোলন বা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের। সুতরাং এখন প্রশ্ন হলো, এই নয়া-ফ্যাসিবাদের স্বরূপ কি এবং তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে কখন।

দিমিত্রভ একটা মূল্যবান কথা বলেছিলেন। ৩৫ সালেই দিমিত্রভ লিখেছিলেন, 'এক একটি নির্দিষ্ট দেশের ঐসিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী

এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও আন্তর্জাতিক অবস্থান অনুযায়ী ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের বিকাশ বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। কোনো কোনো দেশে বিশেষ করে যেখানে ফ্যাসিবাদের কোনো ব্যাপক গণভিত্তি নেই এবং যেখানে ফ্যাসিবাদী বুর্জোয়াদের নিজেদের শিবিরে নানা উপদলের মধ্যে সংঘর্ষ খুব তীব্র, সেখানে ফ্যাসিবাদ সরাসরিভাবে সংসদকে অবলোপ করার সাহস রাখে না। আর তাই অন্যান্য বুর্জোয়া দল এবং এমন কি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকেও কিছু পরিমাণ বৈধতা রাখবার অনুমতি দেয়। অন্য সকল দেশে, যেখানে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী এক আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কা সম্বন্ধে শঙ্কিত, সেখানে তারা হয় তৎক্ষণাৎ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও উপদলের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও সন্ত্রাসের শাসনকে তীব্রতর করে সীমাহীন একচেটিয়া রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

আলোচনার সুবিধার জন্য উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত—বিশ্বের এই তিন শ্রেণীর দেশগুলির প্রতিনিধি মডেল হিসেবে যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ এবং লাতিন আমেরিকার চিলি, হাইতি বা বলিভিয়াকে বেছে নেওয়া যেতে পারে।

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্স বা বৃটেন অথবা কানাডার মতো উন্নত দেশগুলিতে পুঁজিবাদ অনেক আগেই নিজস্ব সঙ্কটকে এড়াতে সাম্রাজ্যবাদী চেহারা নিয়েছে। দেশীয় অর্থনীতিকে সচ্ছল রাখতে অন্য দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করার তত্ত্ব আজ সরকারী ভাবেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির কথা যথেষ্ট গুরুত্ব পেলেও এইসব দেশের শ্রমজীবীরা ও বুদ্ধিজীবী মানুষ উন্নয়শীল ও অনুন্নত দেশগুলির বিক্ষুব্ধ মানুষের থেকে শ্রেণীগত ভাবেই অনেক দূরে অবস্থান করছে। যেহেতু এই সব দেশের ক্ষমতাসীন শ্রেণী অর্থনৈতিক কৌশলকে সম্প্রসারিত করার জন্য প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে একদিকে যেমন মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয় বাড়িয়ে চলেছে তেমনি অন্যদিকে সংখ্যাগতভাবে বাড়িয়ে চলেছে মাথাপিছু আয়। প্রতিদিনের এই টানাপোড়েনের ফলে পুঁজিবাদী সমস্যা এমন কোনো রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারছে না যা, সমাজতত্ত্বের ভাষায় ক্রাউড বা জনমণ্ডলীকে পরিণত করতে পারে পাবলিক বা জনতায়। এমন কোনো রাজনৈতিক ইস্যু তৈরী করার সুযোগ দিচ্ছে না যা হতে পারে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ভিত্তি। এই পরি-প্রেক্ষিতে এইসব দেশে নয়া-ফ্যাসিবাদের আত্মপ্রকাশের সময় চিহ্ন অনেক দূরেই

অবস্থিত এবং তার স্বরূপ অনেক বেশি অর্থনৈতিক। এবং নয়া-ফ্যাসিবাদের সঙ্গে পুঁজিবাদী সঙ্কট যতটা না জড়িত তার থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সাম্রাজ্যবাদী সঙ্কট।

২. ভারতবর্ষের মতো দেশে এখন পর্যন্ত একটা জিনিসই প্রকট হয়েছে যে এখানে একদিকে যেমন একচেটিয়া পুঁজি শক্ত সমর্থ চেহারা নিয়েছে, দেশীয় পুঁজির মধ্যে নিজস্ব বিরোধ আছে, তেমনি বিদেশী বহুজাতিক পুঁজির সঙ্গেও সংঘর্ষ খুব কাছাকাছি। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন শ্রেণী পুঁজিবাদের নিজস্ব সঙ্কট এড়াতে পুরোপুরি ব্যর্থ। ক্ষমতাসীন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল বা দলগুলি এমন কোনো সিন্থেসিস সৃষ্টি করতে পারছে না যা বিদেশী শর্তকে উপেক্ষা করে নিজস্ব রাজনৈতিক মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করতে পারে। এইসব দেশে প্রচ্ছন্ন ভাবে একটি ব্যাপক গণআন্দোলনের স্তর সবসময়েই বিরাজ করছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উগ্র-বামপন্থীরানা সঠিক রাজনৈতিক তত্ত্বকে ধরতে না পেরে সন্ত্রাসবাদী চেহারা নিচ্ছে, যা ফ্যাসিবাদের স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের পক্ষে এক মস্তো সুযোগ। অন্যদিকে, ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিপ্লবী মুক্তি আন্দোলনে রূপান্তরিত করার সুযোগ এবং সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বামপন্থী দলগুলি সে সম্পর্কে কিছু ভাবছে না, বা ভাবতে পারছে না। কারণ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোতেই ইস্যু-ভিত্তিক আন্দোলন বা অন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে বিরোধী দলগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমত নয়। সার্বিক বাম ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে, বাম-গণতান্ত্রিক ঐক্যের ডাকেও দেশের সর্বত্র সমান সাড়া মিলছে না। কোথাও কোথাও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন মাথা চাড়া দিচ্ছে বটে, কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে জনগণের সম্পর্কে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য প্রবাহিত হচ্ছেই। পরিস্থিতি যথেষ্ট অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও একই অবস্থা দেখা দিয়েছে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে। সাম্রাজ্যবাদ যেখানে এক ধাপ এগিয়ে এসে সরাসরি সামরিক একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছে, স্বদেশী পুঁজির তুলনায় বিদেশী পুঁজি সেখানে অনেক বেশি সক্রিয়। বার্মা বা ফিলিপিনস বা ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা কিছু ভিন্নতর নয়, ভুল রাজনৈতিক তত্ত্ব বিপ্লবী আন্দোলনকে কিভাবে বিপথে নিয়ে যেতে পারে এবং পুঁজিবাদী শাসক গোষ্ঠী কিভাবে নয়া-ফ্যাসিবাদী শাসনদণ্ড হাতে তুলে নিতে পারে এই সব দেশের ঘটনাই তার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। তৃতীয় বিশ্ব তাই এক দিকে যেমন প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই

সংঘটনায় পরিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামের অনুকূলতায় ভরপুর, তেমনি ক্ষমতাসীনদের ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা তেমনই তীব্র। এইসব দেশের ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ কখনই আর পুরনো পদ্ধতিতে চলতে রাজী নয়, তার স্বরূপ এখন অনেক বেশি রাজনৈতিক (শুধুই সন্ত্রাসবাদী নয়) এবং তার বিস্ফোরণের সময়চিহ্ন প্রকৃত অর্থেই নির্ভর করছে প্রতিবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামে পরিণত হবার নানা কৌশল, পদ্ধতি ও কর্মসূচীর ভুলভ্রান্তির ওপর।

৩. অনুন্নত হিসেবে চিহ্নিত আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি এখনও যথেষ্ট পাকাপোক্ত এবং সেখানে হামেশাই ঘটছে শাসক-জোটের উত্থান-পতন। ফ্যাসিজম প্রকৃত অর্থেই এখানে ভিন্নতর চেহারায় প্রতিষ্ঠিত এবং তার ভিত্তির সঙ্গে কেতাবী তত্ত্বের হিসেবে কোনো মিল নেই। কারণ বিদেশী পুঁজির ব্যাপক লগ্নী, অর্থনৈতিক আধিপত্যের পেছনে সরাসরি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রথম থেকেই এমন চেহারা নিয়ে বসে আছে যে সংসদ ইত্যাদিকে অবহেলা করে 'সন্ত্রাসবাদী চরিত্র, গ্রহণের কোনো অবশ্যম্ভাবী পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ারও সুযোগ দেয়নি নয়া-ফ্যাসিবাদ। এইসব দেশে যে-কোনো গণ-আন্দোলনেরই মূল লক্ষ্য হলো জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং সূচনা থেকেই তা অনেক বেশি অস্ত্রনির্ভর। বস্তুতপক্ষে এই বিশ্বের এই ব্যাপক ও বিস্তৃত অঞ্চলই নয়া-ফ্যাসিবাদের যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান, নয়া-সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রতিরোধ সৃষ্টির গবেষণাগার। ফ্যাসিবাদের স্বরূপ এখানে পুরোপুরিই সন্ত্রাসবাদী এবং তার বহুমুখী প্রকাশ প্রতিমুহূর্তেই নির্ভর করছে মুক্তি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির ওপর।

॥ ৩ ॥

এই বিশ্লেষণ থেকে সম্ভবত আমরা এইরকম জায়গায় পৌছোতে পারি যে, (১) চলতি রাজনীতিতে মোটামুটিভাবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই, বিশেষ করে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা যথেষ্ট তীব্র বা ফ্যাসিবাদ অত্যন্ত সক্রিয়, (২) উপনিবেশবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং বিপ্লবী মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে অন্যতম শত্রু হলো ফ্যাসিবাদী বা নয়া-ফ্যাসিবাদী আক্রমণ, (৩) বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোয় ফ্যাসিবাদ আজ অনেক বেশি চতুর ও পরিচ্ছন্ন, (৪) যে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষেই সম্ভাব্য প্রাথমিক বিরুদ্ধতা হলো ফ্যাসিবাদী প্রচার ও আক্রমণ।

এইসব কারণেই আজ এবং আগামীকালের যে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এবং বৃহত্তর বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামের রূপরেখা বা কর্মসূচী তৈরী হওয়া উচিত এমন এক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনাকে মনে রেখে যা চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক পরি-কাঠামোর ছদ্মবেশে আবৃত চূড়ান্ত ফ্যাসিবাদী আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে। এই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের কাছে আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে পারেন মাও ৎসে-তুং, তিরিশের দশকের চীনের ওপর জাপানের আক্রমণ সম্পর্কে যখন তিনি সাংগঠনিক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এইভাবে যে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধে রত হওয়ার পাশাপাশি ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধেও লড়াই চালানো দরকার, যে লড়াইয়ের সৈনিক হবেন ব্যাপক জনগণ। মূলতঃ জনগণের কাছে এই সমগ্র সংগ্রামই হয়ে উঠবে দেশপ্রেমের যুদ্ধ বা প্যাট্রিয়টিক ওয়ার। এই লড়াইয়ের 'রণকৌশলগত সমস্যা'নিয়ে মাও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন,স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেছেন এবং আমাদের মোটামুটি এই উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতে পেরেছেন যে, এই ধরণের লড়াইয়ের মূল শক্তি হলো দেশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক জনগণ এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা হলো ব্যাপকতর প্রতিরোধ। কার্ল মার্ক্স তাঁর 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' সংক্রান্ত আলোচনায় প্রচ্ছন্নভাবে যে ত্রুটিগুলির কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেও আছে গণ-প্রতিরোধের কথা, অবশ্যই বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ১৯৩৯-এর ২৮ মার্চ জেনারেল ফ্রাঙ্কো রাজধানী মাদ্রিদ দখল করতে পেরেছিল এই কারণেই যে, স্পেনের মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাদের সমগ্র প্রতিরোধ আন্দোলন সুসংহত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হতে পারে নি।

সত্তরের দশকে চিলিতে সমাজতন্ত্রী আলেন্দে সরকারকে রাতারাতি ক্ষমতাচ্যুত করে এক সামরিক অভ্যুত্থান মারফৎ প্রশাসন দখল করে পিনোচেত। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে চিলির জনগণের আন্দোলন এখনো চলছে, কিন্তু তা যথেষ্ট বিক্ষিপ্ত, এক দশক অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও এখনো তা জোরালো জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পরিণত হতে পারেনি এবং তার একমাত্র কারণ 'প্রকৃত জনগণের মধ্যে প্রকৃত সংগঠন' গড়ে তোলার অভাবই। হাইতি, ডমিনিকান রিপাবলিক, ব্রাজিল বা অন্যান্য দেশগুলিতেও নয়া ফ্যাসিবাদ এইভাবে খণ্ড-খণ্ড রূপে মোকাবিলা করছে সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে নানা ইস্যুভিত্তিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যা তার পক্ষে আদৌ বিপজ্জনক কিছু নয়। অস্ত্রভিত্তিক

ফ্যাসিবাদী শাসন প্রায় এক লহমায় মুছে নিচ্ছে প্রতিবাদের সাংগঠনিক আশ্রয়স্থল। আফ্রিকার কয়েকটি দেশ বাদে অন্যান্য অধিকাংশ দেশে যা ঘটছে তা হচ্ছে এক ফ্যাসিস্ত সরকার থেকে আরেক ফ্যাসিস্ত সরকারে ক্ষমতার হস্তান্তর। এই পরিবর্তন ঘটছে অত্যন্ত দ্রুত ও আকস্মিক এবং তা নির্ভর করছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে পুঁজিবাদী সঙ্কট থেকে বাঁচাতে সেই সরকার কতটা সাহায্য করতে পারছে তার ওপর, এবং এক্ষেত্রে সেই সব দেশের জনগণের কাছে তাদের যাবতীয় রাজনৈতিক প্রকাশের আঙ্গিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে ফ্যাসিবাদ বনাম ফ্যাসিবাদ, তৃতীয় কোনো বিকল্পের অবস্থানে তারা পৌঁছতেই পারছেন না। ফিলিপিনসে নির্বাচন নিয়ে সম্প্রতি যা ঘটলো তা নয়া ফ্যাসিবাদেরই অনিবার্য আত্মপ্রকাশ এবং এই ঘটনা থেকে এটা সপ্রমাণিত যে (১) উপযুক্ত সুযোগ হাতের মুঠোর মধ্যে আসা সত্ত্বেও ফিলিপিনসের জনগণ এই নয়া-ফ্যাসিবাদের কাছে বিপর্যস্ত হয়েছেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তাঁরা বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামে পরিণত করতে পারেননি, (২) ফিলিপিনসের বামপন্থী দলগুলি নয়া-ফ্যাসিবাদের ক্ষমতা ও কৌশল সম্পর্কে এখনও অবহিত নয়, (৩) শ্রীমতী অ্যাকুইনো ও তাঁর সহযোগী অন্যান্য বিরোধী নেতারা যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করে চলেছেন তার একটা সীমাবদ্ধতা আছে, এই পদ্ধতিতে নয়া-ফ্যাসিবাদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

ফ্যাসিবাদ ও নয়া-ফ্যাসিবাদের বিপদ আসলে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের পক্ষ থেকে আসা আক্রমণেরই নামান্তর এবং তাঁকে প্রতিহত ও পরাজিত করা যেতে পারে দুটি জিনিস দিয়ে : (১) জনগণের মধ্যে সুষ্ঠু সামাজিক ও বিপ্লবী কর্মসূচী ও পদ্ধতিভিত্তিক সংগঠন এবং (২) জনগণের হাতে অস্ত্র। দুটি দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে সামনে রাখা উচিত। কিভাবে এই সামাজিক ও বিপ্লবী কর্মসূচী ও পদ্ধতিভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা যেতে পারে সে-সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে ভিয়েতনামের কাহিনী ও জেনারেল গিয়াপের পিপলস ওয়ার অ্যাণ্ড পিপলস আর্মি-কে এবং জনগণের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার মতো কিছুটা বিপজ্জনক ঘটনায় যেন কোনোরকম ভ্রান্তি থেকে না যায় তার জন্য হাতে তুলে নেওয়া যেতে পারে ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষাকে।

ইদানীং সংবাদপত্রে হামেশাই খবর প্রকাশিত হচ্ছে, পশ্চিম জর্মনীতে নাৎজীরা আবার সংগঠিত হচ্ছে। এই নব্য-নাৎজীদের অধিকাংশই হলো যুবক, নেতৃত্বে আছেন কিছু প্রবীন ব্যক্তি, বিশ্বযুদ্ধের সময় যাঁরা হিটলারের সেবা করতে

পেরেছিলেন। এই সদ্য সংগঠিত নাৎজীরা ইতিমধ্যে বাহিনী তৈরি করে ফেলেছেন। নতুন গঠনতন্ত্র রচনা করেছেন এবং স্বতন্ত্র নাৎজী-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। সামগ্রিকভাবে এদের সংখ্যা ও শক্তি কিছু কম নয়। অন্যদিকে ইতালিতে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নতুন করে মুসোলিনি-চর্চা শুরু হয়েছে। তাঁরা ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ যথেষ্টই সারগর্ভ, সমাজের পক্ষে উপযোগী এবং দেশের স্বার্থে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এই বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে এক বিরাট সংখ্যক যুবক-যুবতী ইতিমধ্যেই ফ্যাসিবাদী দল গঠন করেছেন, মুসোলিনির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং দেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা শুরু করেছেন। নয়া-সাম্রাজ্যবাদী প্রবাহে এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণেই যে এই নয়া-ফ্যাসিবাদী প্রবণতার সঙ্গে তার যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং এইভাবে ফ্যাসিবাদকে নিরন্তর নতুন পোষাকে সজ্জিত করা ছাড়া তাদের কাছে পুঁজিবাদী সঙ্কট এড়ানো এবং বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও বিপ্লবী মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করার অন্য কোনো পথ নেই। এর বীভৎসতা সম্পর্কে আমরা যথেষ্টই ওয়াকিবহাল, তবুও এখানে একটা কথা যোগ করে দেওয়া প্রয়োজন যে ইতিমধ্যে সামরিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দিক থেকে ঘটে গেছে ব্যাপক অগ্রগতি। নয়া-ফ্যাসিবাদ প্রতিমুহূর্তেই তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে তৎপর। তাছাড়া এটাও লক্ষ্যণীয়, জনগণের শ্রেণী-বিশ্লেষণে নয়া-ফ্যাসিবাদ আশ্চর্য নিপুণ ও স্থিতধী, সাধারণ জনগণের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিভাজন রেখা টেনে দেওয়ায় সে যথেষ্টই কুশলী এবং অনেকটাই সফল। জনগণ বনাম জনগণের এক নতুন ঝুঁকি এখন সব সময়েই খেলা করছে।

দিমিত্রভ বলছেন, ফ্যাসিবাদ হলো লগ্নী পুঁজিরই শক্তি। এ হলো শ্রমিক-শ্রেণী, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী প্রতিহিংসার সংগঠন। মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখছেন: Fasism is religious; therefore it declares rationalism to be a danger and liberalism unnatural. It is aganist philosophical materialism because that is the anti-thesis of the practice of vulgar materialism. It is a defender of religion because faith places premium on ignorance, which makes the masses of exploitation. এবং রজনী পাম দত্তের ভাষায়, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদই ফ্যাসিবাদকে জন্ম দেয়। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে যদি কোনো মোহ না থাকে এবং এ বিষয়ে যদি পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকে তাহলেই তাকে প্রতিরোধ ও পরাভূত করা যায়।

প্রাসঙ্গিক টীকা ইত্যাদি

মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ। যখনই বিশ্বমানবের কোনো অংশ নিপীড়ন বা আগ্রাসনের শিকার হয়েছে তখনই রবীন্দ্র লেখনী প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। ফ্যাসিবাদের আক্রমণ শুধু রাষ্ট্রক্ষমতায়ই সীমাবদ্ধ নয়, এই আক্রমণ সমগ্র মানব সমাজের বিরুদ্ধে এক পৈশাচিক অভিযান। যখনই ফ্যাসিবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়েছে তখনই রবীন্দ্রনাথ গর্জে উঠেছেন। প্রলয়ের সৃষ্টি প্রবন্ধটি কালান্তর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। রচনাকাল ৭ পৌষ ১৩৪৪। রবীন্দ্র রচনাবলীর জন্মশত-বার্ষিকী সংস্করণের ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রবন্ধটি পাওয়া যাবে।

রমঁ্যা রলাঁ, বিশিষ্ট ফরাসী বুদ্ধিজীবী। ফরাসী সাহিত্য জগতে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ১৯৩৬ সালের ১৮ জুলাই ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত অভ্যুত্থান স্পেনের বৈধ প্রজাতন্ত্রী সরকারকে বিপন্ন করে। ফ্রাঙ্কোর পৈশাচিকতাকে প্রতিরোধ করার জন্য রলাঁ ২০ নভেম্বর এক আবেদন জানান। সেই আবেদনটি বাংলায় প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৩৭ সালের ১৭ জানুআরি। নেপাল মজুমদার কর্তৃক সংগৃহীত সেই আবেদনটি অর্থাৎ 'তুমি আমি সকলেই আজ বিপন্ন' প্রবন্ধটি পরে প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে পরিচয় পত্রিকার ফ্যাসিবিরোধী সংখ্যায়। লেখাটি এই বইয়ে আবার প্রকাশিত হলো।

রাশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য জগতে একটি উল্লেখযোগ্য নাম ম্যাক্সিম গোর্কি। গোর্কির সাহিত্যের বিষয় হয়েছে অত্যাচারিত নিপীড়িত দরিদ্র মানুষ। ১৯১৭ সালে, রাশিয়ায় জারতন্ত্রের উচ্ছেদে তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে। বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত গোর্কির লেখা তিনটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে 'নানা লেখা'-য়। অনুবাদ সরোজ দত্ত। পরে ১৯৭৫ সালে লেখা তিনটি পুনর্মুদ্রিত হয় পরিচয় পত্রিকায়, ফ্যাসিবিরোধী সংখ্যায়।

ফরাসী বুদ্ধিজীবী আঁরি বারবুস। বারব্যুস ও রলাঁ একসঙ্গে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একসঙ্গে গঠন করেছিলেন, 'বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের সংযুক্ত ফ্রন্ট'। ১৯২৭ সালে বারবুস একটি মর্মস্পর্শী চিঠি সহ রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বাক্ষর চেয়ে 'মুক্ত মানবাত্মার নিকট আবেদন' পত্রটি পাঠান। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সেই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবুসকে একটি সুন্দর উত্তরও লেখেন। Anti-Fascist

Traditions of Bengal সংকলন থেকে বারবুসের সেই আবেদনপত্রটি অনুবাদ করে প্রথম ছাপা হয় পরিচয় পত্রিকায়। অনুবাদক অমিয় ধর। একই শিরানামে লেখাটি এখানে সংযোজিত হলো।

বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ নাট্যকার জর্জ বার্ণাড শ। বর্তমান রচনা 'ফ্যাসিস্ত নায়কের উত্থান-পতন'' বস্তুত কোনো প্রবন্ধ নয়। এটি তাঁরই রচিত একটি নাটকের ভূমিকার কিছু অংশ। সেই ভূমিকার দুটি পরিচ্ছেদের সংক্ষেপিত অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় পরিচয় পত্রিকায়। অনুবাদ করেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুলগেরীয় কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্ব-কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা জর্জি দিমিত্রভ। ১৯৩৩ সালের ৯ মার্চ জর্মনীতে নাৎসীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে রাইখস্টাক অগ্নিকাণ্ড ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়। ডিমিত্রভকে আদালতে তোলা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে 'রাইখস্টাক মামলা' নামে এক প্রহসন সৃষ্টি করে হিটলার। বের্লিন পতনের পর দিমিত্রভ অবশ্য পুরোপুরি মুক্তি পান এবং তিনি সোভিয়েত নাগরিকত্ব পান। কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের অন্যতম দায়িত্বপূর্ণ পদেও আসীন হন দিমিত্রভ। এই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে দিমিত্রভ যে রিপোর্ট পেশ ও আলোচনা করেন তা বাংলায় প্রকাশ করেছেন মনীষা। সেই আলোচনারই একটি পর্ব এই সংকলনে প্রকাশিত নিবন্ধটি। অনুবাদ দীপিকা বসু ও পত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও অভিনেতা চার্লস চ্যাপলিন সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে দূরে সরে থাকেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইওরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার দাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ যখন সোচ্চার, সেই সময়েই চ্যাপলিন নিজস্ব বক্তব্য রাখেন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে। ১৯৪২ সালের ২২ জুলাই নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে এক জনসভার চার্লির এই ভাষণটি রিলে করে শোনানো হয়। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণ ধর।

অস্তিত্ববাদ তত্ত্বের রূপকার জঁ পল সার্ত্র সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে কি ধরনের ভূমিকা নিয়েছিলেন তা যেমন প্রমাণিত বলিভিয়ার বন্দী সাংবাদিক রেজি দ্যব্রের মুক্তির জন্য আন্দোলনে, তেমনি সমান গুরুত্বপূর্ণ তাঁর ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায়। হোয়াট ইজ লিটারেচার বইতে সঙ্কলিত 'লেখা কী' প্রবন্ধের উপসংহারে সার্ত্র যে মন্তব্য করেছিলেন তা অমূল্য দলিল। এটি অনুবাদ করেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য। সম্ভবত প্রথম প্রকাশিত হয় পরিচয় পত্রিকায়।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' আসলে একটি পুস্তিকা। তিরিশের দশকে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করে হিটলারি তাণ্ডবের সময়। লেখাটি পরে বুদ্ধদেব বসু রচনা সমগ্রেও প্রকাশিত হয়।

বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম পুরোধা রজনী পাম দত্ত আমাদের কাছে অত্যন্ত বেশি পরিচিত তাঁর ইণ্ডিয়া টু-ডে বইটির জন্য। কিন্তু তার আগেই ১৯৩৪ সালে তিনি লেখেন ফ্যাসিজম অ্যাণ্ড সোশ্যাল রেভলিউশন এবং সেই বইতে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। বইটির ভূমিকাটি কিছুটা সংক্ষেপ করে অনুবাদ করেন অমিয় ধর। প্রকাশিত হয় পরিচয় পত্রিকায়।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট নাম। আনন্দবাজার, যুগান্তর এবং দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। পরে সত্যযুগ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত তাঁর লেখা বইটি সামগ্রিক ভাবেই এক অমূল্য সংযোজন। বিবেকানন্দবাবুর এই লেখাটি প্রকাশিত হয় ভারত গণতান্ত্রিক জার্মানী পত্রিকায়। পত্রিকার সম্পাদক ডঃ পঞ্চানন সাহা এই সংকলনের জন্য প্রবন্ধটি দিয়ে সাহায্য করেছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক নির্মল বসু বর্তমানে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপরে তাঁর একাধিক লেখা গুণীজনদের প্রশংসা পেয়েছে। এই লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় লোকমত পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। সেখান থেকেই এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত হলো।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও এদেশের বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে অন্যতম বিশেষজ্ঞ হিসেবে যিনি পরিচিত তিনি হলেন চিন্মোহন সেহানবীশ। বয়সে প্রবীণ হলেও কর্মতৎপরতায় মুখর এই নবীন গবেষক একই সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগঠন পর্যন্ত নানা বিষয়ে একের পর এক উন্মোচন করছেন নানা দিক। এই সঙ্কলনে গৃহীত তাঁর লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় আন্তর্জাতিক পত্রিকায়, ১৯৬৪ সালের জুন সংখ্যায়।

বিশিষ্ট মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু এখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। গোড়ার দিকে সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল যথেষ্টই গভীর। বিশেষ করে ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে ফ্যাসিবিরোধী

আন্দোলনে তিনিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর এই প্রবন্ধটি 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের চল্লিশতম বার্ষিকী' নামে প্রথম প্রকাশিত হয় গণশক্তি পত্রিকায়।

এদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে দীর্ঘদিন ধরে জড়িয়ে আছেন হীরেন মুখার্জী। এক সময় সি পি আই দলের সংসদ সদস্যও ছিলেন। যদিও মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর পরিচয় আরও ব্যাপক। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গেও ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন হীরেনবাবু। তাঁর এই প্রবন্ধটি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন তন্দ্রা চক্রবর্তী।

সংসদ সদস্য চিত্ত বসু সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্যকার। এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা তাঁর প্রবন্ধটি এর আগে লোকমত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি সেখান থেকেই গৃহীত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বুদ্ধিদীপ্ত গবেষক ছাড়াও আরও একটি পরিচয় আছে। তিনি আর এস পি দলে অন্যতম তাত্ত্বিক নেতা। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের একটি বিশেষ প্রশ্ন নিয়ে লেখা তাঁর এই প্রবন্ধটি লোকমত পত্রিকাতেই প্রকাশিতহয়েছিল।

এক সময় ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে সুধী প্রধান পরিচিত হন গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসেবে। ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রাম থেকে শুরু করে আজকের সাংস্কৃতিক আন্দোলন পর্যন্ত—এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চলেছেন তিনি। তাঁর প্রবন্ধটি শুধুমাত্র এই সঙ্কলনের জন্যই লেখা হয়েছে।

মোহিত সেন একজন প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা। সি পি আই দলের তাত্ত্বিক নেতাদের অন্যতম। ভারতবর্ষ ও বিপ্লব সম্পর্কিত একাধিক বইয়ের রচয়িতা মোহিতবাবুর এই লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় পরিচয় পত্রিকায়, ১৯৭৫ সালে।

সত্তর দশকে এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে নতুন কিছু চিন্তাভাবনা দেখা গেছে তার অন্যতম অগ্রণী হলেন সৌরেন বসু। সি পি আই (এম-এল)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যদিও এখন তাঁর অবস্থান কিছুটা স্বতন্ত্র। সৌরেনবাবুর এই লেখাটি শুধুমাত্র এই সঙ্কলনের জন্যই।

রথীন চক্রবর্তী, বর্তমান পত্রিকার সাংবাদিক।